আমরা
ও
ফেলুদা
E-পুজোসংখ্যা
১৪২০
FFC

e - পুজোসংখ্যা ১৪২০

"~FELUDA FAN CLUB~"

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

প্রা ক
ক থ ন

উজ্জ্বল দত্ত

ফেসবুকে যোগদান করার পর আমি যে প্রথম গ্রুপের সদস্য হই তা হল ‘ ফেলুদা ফ্যান ক্লাব ’। খুব সুন্দর ফেলুদায় নিবেদিত পরিচ্ছন্ন গ্রুপ।

যে সমস্ত ‘ প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ’ ও ‘ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ’ দল সবসময় আধুনিক যুগের ছেলে মেয়েদের দোষারূপ করেন যে তারা নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সব বিসর্জন দিয়ে বসেছে তাদের বিনিত অনুরোধ জানাই যে এই গ্রুপটাকে একবার দেখতে। এই গ্রুপটাকে দেখলেই তারা বুঝবেন যে তাদের ধারনা কত বিভ্রান্ত।

‘ ফেলুদা ফ্যান ক্লাব ’ এইবার পুজোতে তাদের প্রথম ‘ই-পত্রিকা’ প্রকাশ করতে চলেছে। আর এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব পেয়ে আমি যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত।

আচ্ছা, ফেলুদা আমাদের সবার কেন এত প্রিয় ? এর জবাব খুব জটিল ও এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। হয়ত পণ্ডিতরা ও সাহিত্যিকরা এর বিশ্লেষণাত্মক উত্তর দিতে পারবেন। তবে আমি নিজে মনে করি যে ফেলুদা হলেন, আমাদের সবার হৃদয়ে যে সদ্‌গুণগুলো আছে, তার প্রতিচ্ছবি। সাধারন জীবন যাপন, উচ্চ মনের চিন্তা-ভাবনা , তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিদ্যুৎ ঝলক , ন্যায় পরায়ণতা , অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম , নীতি বোধ , ইত্যাদি যেসব শাশ্বত গুণাবলীকে আমরা পছন্দ করি , শ্রদ্ধা করি ও হয়তো বা নিজেদের মধ্যে দেখতে চাই , ফেলুদা হলেন তারই প্রতিরূপ। তাই ফেলুদা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এত প্রিয় চরিত্র , ভালোবাসার চরিত্র।

অনেকটা সেই ইতিহাসের বা পুরাণের নায়কদের মতো হলেন ফেলুদা। অথচ ফেলুদা কিন্তু কখনও নিজেকে জাহির করেন না। কখনও বলেন না , যে আমি হলাম একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মানুষ। কিন্তু তাঁর সেই না বলা কথাই যেন পাঠক-পাঠিকাদের কানে কানে বলে যায় অনেক কিছু। ভরিয়ে তোলে হৃদয়কে। মন বলে উঠে , ‘ হ্যাঁ হ্যাঁ , এই তো সেই মানুষ যার বুদ্ধির উপর শতকরা একশো ভাগ আশা রাখা যায়। ’

আর ফেলুদার নীতি বোধ ? তাও যেন অতুলনীয়। Emil Gaborio - এর বইয়ের সেটটা পাবার আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও শুধুমাত্র খুনির হাত থেকে কোন জিনিস গ্রহন করবেন না বলে তিনি অম্লান বদনে ফিরিয়ে দেন নিজের পারিশ্রমিক , Emil Gaborio - এর অমূল্য বইগুলি।

ফেলুদার দুই যোগ্য সহচর হলেন তার ভাই তোপসে ও লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু। যদিও এই তিন জনের মধ্যমণি হলেন ফেলুদা , তবুও এই তিন জনকেই একসঙ্গে ত্রিরত্ন আখ্যা দেওয়া যায়। ত্রিরত্নের মধ্যে বয়েসে সব থেকে ছোট হল তোপসে। তোপসেকে বলা যেতে পারে ফেলুদার জীবনীকার। কম বয়েসি হওয়া সত্ত্বেও তোপসে যেন তার বয়েসের তুলনায় একটু বেশি গম্ভীর , একটু বেশি সংযত। এই বয়েসের কিশোর বা তরুণদের মতো স্বাভাবিক উচ্ছলতা বা উচ্ছ্বাস তার মধ্যে দেখা যায় না। অবশ্য তা হবেই বা না কেন ? সে তো ফেলুদারই ভাই যে।

আর লেখক জটায়ু হলেন ফেলুদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই ফেলুদা জটায়ুর লেখা ঠিক করে দেন। জটায়ুর সাথে ঠাট্টা তামাসা করেন। মাঝে মধ্যে নানা ভাবে জটায়ুর পিছনেও লাগেন। ওই ইংজেরিতে যাকে বলে ‘ লেগ-পুলিং ’। তবে এসবই ফেলুদা করেন আন্তরিক বন্ধুত্বের টানে। আবার ফেলুদা জটায়ুর গুণকে সন্মানও করেন ও নানা জায়গাতে তার প্রশংসাও করেন। যেমন ‘ বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ’ তে ফেলুদার পরামর্শ নিয়ে জটায়ু যে গল্প লিখেছিলেন তা সিনেমার জন্য নির্বাচিত হয়। জটায়ু তাঁর গল্পটির জন্য আশাতীত মূল্য পান।

তার বিবরণ দিতে গিয়ে জটায়ু বলেছিলেন যে , “ মোটামোটি আমি থুরি আমরা যা লিখেছিলাম......”, এই পর্যন্ত শুনে ফেলুদা বলেছিলেন যে , “... আপনি বহুবচনটা ব্যাবহার না করলেই খুশি হব...উপাদানে আমার কিছুটা কন্ট্রিবিউশন থাকলেও পাচক তো আপনি। আপনার মতো হাতের তার কি আমার আছে ?”

তবে আবার ওই যে বললাম মহৎ মানুষদেরও একটু আধটু দোষ ত্রুটি থাকবেই। স্বয়ং ভগবানও যখন মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন তখন তার মধ্যেও দোষ ত্রুটি খানিকটা ছিল। ফেলুদা যোগ-ব্যায়াম করেন কিন্তু আবার ঘন ঘন চারমিনার ধরিয়ে টান দেন। যোগ-ব্যায়ামের সাথে কিন্তু ধূমপানের ঘোর বিবাদ আছে। আর সেসময় চারমিনারে ফিল্টার থাকতো না। তার মানে নিকোটিনের সবটাই শরীরে ঢুকত। আর একটা অবাক করা ব্যাপার হল এই যে ত্রি-রত্নের জীবনে কোন নারী চরিত্র নেই। ফেলুদা ও জটায়ু দুজনেই অবিবাহিত। কিন্তু এঁদের মা , মাসি , পিসি , দিদি , বোন , কাকী , জ্যাঠি , মামী কেউই কি নেই ? অবশ্য এক জায়গাতে জটায়ুর এক দিদির উল্লেখ আছে এক লাইনের মধ্যে। এই ব্যাপারটা কিন্তু পাঠিকাদের না-পসন্দ হতেই পারে। এইসব স্বল্প কিছু দোষ ত্রুটিকে বাদ দিলে ও উপেক্ষা করলে , এই ত্রি-রত্ন হলেন এক সরস ও অনাবিল জীবনদর্শন। এঁদের চোখ দিয়ে ও এঁদের একজন হয়ে দেখলে এই গুরুগম্ভীর ও নানা ঘাত প্রতিঘাতে ভরা পৃথিবী যেন আরও সরস ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠে। আর এই সরসতা ছড়িয়ে পড়ে আমাদের মনে , আমাদের হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে। আমরা বলে উঠি , “ হে ত্রি-রত্ন , তোমাদের মোরা ভালোবাসি। তোমরা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থাকবে। জয়তু ত্রি-রত্ন ”। আর এখানেই কৃতিত্ব এঁদের স্রষ্টা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী সত্যজিৎ রায়ের।

ফেলুদা কোনো বিষয়ে কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না। নান রকম বিষয়ে তিনি পড়াশুনা করতেন , চর্চা করতেন ও বলতেন যে একজন সফল গোয়েন্দা হতে গেলে নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকা খুব প্রয়োজন। “ ফেলুদা ফ্যান ক্লাব ” ওটাই মনে করে। তাই এই পত্রিকাতে রয়েছে ফেলুদাকে নিয়ে নানা রকম লেখা ছাড়াও আরও নানা রকম বিষয় নিয়ে লেখা , গল্প , প্রবন্ধ , ধাঁধা , কবিতা ইত্যাদি। আন্তরিক অনুরোধ এই যে আপনারা একবার এই পত্রিকা পড়ে দেখুন। আমরা জানি “ ফেলুদা ফ্যান ক্লাব ”-এর এই প্রথম প্রচেষ্টা আপনাদের ভালোবাসায় অভিষিক্ত হয়ে ধন্য হবে।

পূজার দিনগুলি আপনাদের সবার ভালো কাটুক। জগৎ জননী মা দুর্গার আশীর্বাদ আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক। এই প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি।

বিনয়াবত

উজ্জ্বল দত্ত

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

মোরা ফেলু–ভক্তের দল,

ছাঁকনি চড়ে পেরোব...এই জীবন–সাগর জল...

ভয় করিনে অজানারে...

আস্তর মগজ–অস্ত্রের সাথে...

বুদ্ধি দিয়েই করব মোরা সবার রক্তজল!

-- আখর

e-পুজাসংখ্যা ১৪২০

মহালয়া, ৪ অক্টোবর ২০১৩

সু চি প ত্র

উ প ন্যা স

বড় গল্প

গল্প

প্রবন্ধ

ক বি তা

শব্দ জব্দ

পাজ়ল জোন

তুলির টানে

এই যুগের ডিজিটাল তুলি

আলোর চিত্র রেখা

অর্ণব দাস মোহান্ত, রিজু পাল, অঙ্গনা সেনগুপ্ত, অদিতি মুখার্জী চক্রবর্তী, শুভদীপ ভট্টাচার্য, সোমা মজুমদার, চিরঞ্জিত রক, শুক্লা সিংহ, ধীমান সাহা, সৌমী মল্লিক এবং বিশ্বজিত বিশ্বাস

লিমেরিক

আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গে সন্দিপ রায়

সন্দিপ রায়ের সাথে একদিন

প্রচ্ছদ

রৌনক ব্রাউন

সম্পাদক মণ্ডলী

উজ্জ্বল দত্ত, সোমা মজুমদার, শুভদীপ ভট্টাচার্য, সহেলী রায়, রৌনক ব্রাউন, অঙ্গনা সেনগুপ্ত, আখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা সিংহ, দেবায়ন ঘোষ, সৌমী মল্লিক, সায়নদীপ চট্টোপাধ্যায় এবং রক্তিম আচার্য্য

প্রকাশক

‘ফেলুদা ফ্যান ক্লাব’ কতৃক ফেসবুক থেকে ‘digital PDF format’ –এ প্রকাশিত এবং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুজাসংখ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন স্কেচ, ফটো এবং ড্রইং google থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই অরিজিনাল আপলোডার এবং আর্টিস্টদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

“ফেলুদা ফ্যান ক্লাব”

(“~FELUDA FAN CLUB~”)

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

EMAIL: feludafanclub.01@gmail.com

সম্পাদকদের মুখ থেকে

“ফেলুদার সাথে আমার পরিচয় ঠিক কত সালে, সেইসব হিসেব গুলিয়ে ফেলেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ফেলুদার সাথে পরিচয় হওয়ার অনেক আগেই আমি হোমস কে কাছে পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই ফেলুদার সাথে আমার আর যাই হোক , “**প্রেম**” করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাই বলে কোনদিন ফেলু মিত্তির কে অবজ্ঞাও করিনি। মুকুলকে নিয়ে যখন ফেলুদা রাজাস্থান যাচ্ছিল , আমিও ওদের সাথে ওই ট্রেনেই ছিলাম , যদিও পাশের কামরায় ! নয়নকে নিয়ে যখন তরফদার চেন্নাই গেল, আর বলল যে নয়ন হারিয়ে গেছে , তখন মিস স্বামীনাথানের বইয়ের দোকানে আমিও ছিলাম। ঘুরঘুটিয়ার সেই আধো অন্ধকার বাড়ীতে যেদিন ফেলুদা রাতে ত্রিনয়নের ধাঁধাটা তোপসেকে বুঝিয়ে বলছিল , কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আমিও “দেয়ারওয়াজ এ কোল্ড ডে/ দারওয়াজা খোল দে” আউড়ে যাচ্ছিলাম। এমন ঝুরি ঝুরি আরো কত ঘটনা , লিখে শেষ করতে পারবনা। মোদ্দা কথা , ফেলুদা যে সব জায়গায় গেছে , কাকতালীয় ভাবে , সেই সব জায়গায় আমিও তখন ছিলাম। তবে ওঁর প্রেমে না পড়লেও মাঝে মাঝে ভাবতাম , ফেলুদা কি কোন মেয়েকে পছন্দ করে ? কে সেই মেয়ে ? মেয়েটি কি ফেলুদার কাজ সম্পর্কে সব জানে ? সে কি মেনে নেবে ? ২০১৩ তে এসে ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের সদস্যা হওয়ার পর , সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেলাম৷ মেয়েটি আমি নিজেই। প্রেমিকা বা বান্ধবী যাই বলুন , ফেলু মিত্তিরের সঙ্গ পেলে আমি সব কিছু ভুলে বসে থাকি। এটা প্রেম নয় ? এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফেলু মিত্তিরের বইগুলো গিলছি , এক গল্প হাজার বার পড়েছি , এখনও পড়ছি , এটা কি প্রেম নয় ? আসলে এই প্রেমটা হয়তো চিরাচরিত প্রেমের পর্যায়ে পড়ে না , কিন্তু তাই বলে আমার অনুভূতিগুলো কি সত্যি নয় ? গুড নিউজ হল , এখন আমি ওঁকে প্রদোষ বলে ডাকি। “ ফেলুদা ” ডাকটা কি এখন আর আমার মুখে মানায় ? আপনারাই বলুন ?’’

- শুক্লা সিংহ

“ফেলুদা পড়তে কার না ভালো লাগে ? আমার সঙ্গে ফেলুদার আলাপ আজ থেকে প্রায় ৯ বছর আগে , তখন আমার ৩ বছর বয়স | সোনার কেল্লা আর জয় বাবা ফেলুনাথ সিডি এনে দেখাল বাবা | মা - বাবার সঙ্গে চুপ করে বসে দেখেছিলাম পুরো সিনেমা দুটি | নট নড়ন , নট চড়ন ! সেই থেকেই ফেলুদাকে নিজের আদর্শ ভেবে নিয়েছিলাম ! যেন ফেলুদা আমার শিক্ষক আর আমি তার স্কুলের ছাত্র। এমনকি থিম মিউসিক টা পর্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল , ডায়লগ নাহয় বাদই দিলাম | একে একে সবকটি সিনেমাই দেখে নিলাম , সত্যজিতের গপ্পের গুলোও | আর ফেলুদা প্রথম পড়লাম ৭ বছর বয়সে৷ আমাদের লাইব্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই পেয়ে গেসলুম ফেলুদা এন্ড কো. । .. এক্ নিঃশ্বাষে ৩ দিনেই পড়ে ফেলি | এরপর ৯ বছর বয়েস যখন , তখন হাতে পেয়ে যাই ফেলুদা সমগ্র ১-২। ব্যাস ! ৩ মাসের মধ্যে অল Galpos এন্ড Upanyashhes কমপ্লিট ! নাওয়া খাওয়া শিকেয় উঠেছিল , পড়তে বসলেও মন লাগাতে পারতুম না কিছুতেই | সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরত চট্টোরাজ, বনবিহারীবাবু , মগনলাল , গোরে , ভবানন্দ , মহাদেবদের জব্দ করবার ফন্দি , পড়তে পড়তে আমিই হয়ে উঠতাম তোপসে .... ! তবে লালমোহনবাবুকে ছাড়া মনে হত যেন ফেলুদা চিরকালই অসম্পূর্ণ | এর কয়েক বছর পরে ফেসবুকে আসি | ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের মেম্বার হই , তারপর একদিন ই-ম্যাগ বের করবার প্ল্যান ! একেই দিনটা মহালয়া , ভোরে উঠে মন ভরে রেডিয়োয় মহিষাশুরমর্দিনী শুনব , তারপর আবার আমার ভগবান এবং গুরু ফেলুদার পুজো সংখ্যা ! আর কোনো কথাই নেই মশাই !’’

- আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

“ ‘ ফেলুদা ! ’ ---- এই নামটাতে যে কি মধু আছে , তা বলে বোঝানো যায় না। ফেলুদাকে নিয়ে লিখতে হলে কোথা থেকে শুরু করব সেটাই ঠিক করে উঠতে পারি না। প্রথম পরিচয় ? ---- সেই কবেকার কথা , এখন পুরোপুরি মনেও নেই সবটা। খুব সম্ভব বাংলাদেশ টেলিভিশনে ফেলুদা ৩০-এ ফেলুদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা৷ শেয়াল দেবতা রহস্য , গোঁসাইপুর সরগরমের সেই আলো আঁধারির দৃশ্যগুলো মনে পড়লে এখনও রোমাঞ্চ লাগে । তারপর হাতে এলো ফেলুদার বই --- নেপোলিয়নের চিঠি পড়েই বোধহয় শুরু হয়েছিলো যাত্রাটা। তারপর ? তারপর আর কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না। ফেলুদার সঙ্গে আলাপের পর সম্পর্কটা এতো তাড়াতাড়ি এতো নিবিড় হয়ে গেল ! এক এক করে প্রত্যেকটা অভিযানে কতবার যে তোপসেদের সঙ্গে আমিও পাড়ি দিয়েছি এবং এখনও প্রতিনিয়ত পাড়ি দিচ্ছি --- সে হিসেব আমার নেই। রজনী সেন রোড , গড়পার , লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাসাডর --- সবেতেই আমার অবাধ বিচরণ। কত অজানা তথ্য জেনেছি ফেলুদার থেকে ! মাঝে মাঝে ভাবি আমার কি সৌভাগ্য যে ফেলুদার মতো একজন দাদা আমার আছে। এক কথায় ফেলুদা আমার এমন একজন দাদা যাকে নিয়ে সবার কাছে গর্ব করতে পারি। আর ‘ ফেলুদা ফ্যান ক্লাব ’ ! ---- ফেলুদার প্রতি ভালোবাসার টানেই একদিন ফেলুদা ফ্যান ক্লাব (FFC) জয়েন করেছিলাম। আর সেদিন থেকেই সাহিত্য চর্চার সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে আমার সামনে। প্রতিদিনের ছকবাঁধা জীবনে FFC আমার একটুকরো মুক্তির আকাশ। ছোটবড় সব বয়সের ফেলুদাভক্ত সাহিত্যপ্রেমীদের নিয়ে আমরা এখন FFC পরিবার। আমাদের এই virtual আড্ডাঘরে আপনাদের সবার নেমন্তন্ন রইল।’’

- সহেলী রায়

“অনেক ছোটবেলায় টিভিতে প্রথম সোনার কেল্লা দেখেছিলাম , কতটা বুঝেছিলাম সন্দেহ আছে , কিন্তু বাড়ির বড়দের সিনেমাটার প্রতি উৎসাহ দেখে বুঝেছিলাম নিশ্চয়ই ভাল সিনেমা। বড় হয়ে বোঝার পর সোনার কেল্লা আমার অন্যতম প্রিয় সিনেমা। ফেলুদা শুধুমাত্র গল্পের বই অথবা গোয়েন্দার গল্প বলে দেখতে আমি রাজি নই। ফেলুদার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে , সেটা সকালে উঠে যোগ ব্যায়ামই হোক অথবা , বিভিন্ন বিষয়ের গল্পের বই পড়াই হোক। আমার বড় হয়ে ওঠার অনেকখানি জায়গা নিয়ে আছে ফেলুদা , এখনও কোন ফেলুদার গল্প পড়লে এক আশ্চর্য মুগ্ধতা আসে , যেন আমি আমার খুব কাছের জনের সাথে গল্প করছি। আর হ্যাঁ ফেলুদা কিন্তু ৩ বন্ধুর গল্প নয়। আমার কাছে ফেলুদা ৪ বন্ধুর আড্ডা। ফেলুদা , তোপসে , লালমোহন বাবু ও আমি।”

-শুভদীপ ভট্টাচার্য

“ফেলুদা : এই নামটা শুনলেই মনে হয় খুব চেনা একজন কেউ। যে চোখের নিমেষে প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। প্রত্যেকটা ' দুষ্টু ' লোকের শাস্তি দিতে পারে। মগনলাল মেঘরাজদের সব চালাকি ফাঁস করে দিতে পারে। ফেলুদার সাথে আমার প্রথম পরিচয় বইয়ের মাধ্যমে না। খুব ছোট তখন আমি। সাদা কালো টিভিতে দেখলাম প্রথম ফেলুদা কে। ' সোনার কেল্লা '। একটা লোক মগজাস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করে দিচ্ছে সব চক্রান্ত। সাথে যেটা দেখলাম সেটা হলো নির্মল বন্ধুত্ব। তিন জন অসমবয়সী মানুষের মধ্যে এরকম সুন্দর একটা রসায়ন সচরাচর দেখা যায় না। তারপর একটু একটু করে পুরো ফেলুদা পরে শেষ করলাম। ততদিনে টিভি শোতে সন্দীপ রায় ফেলুদা করতে শুরু করেছেন। আমরা পেয়েছি সব্যসাচীকে নতুন ফেলুদা হিসেবে। তারপর আবার সিনেমাও হলো। আগের সৌমিত্রবাবু হোন , বা এখনকার সব্যসাচী। ফেলুদাকে আমার চেনা মূলত বই এর মাধ্যমে। ছুটির দুপুরগুলো ফেলুদার বই হাতে বসলেই হু হু করে কেটে যেত। টের পাওয়া যেত না। আমার নিজের কোনো দাদা নেই। বলা যায় ফেলুদাই আমার দাদা। ফ্রেন্ড , ফিলোসফার , গাইড বলতে যা বোঝায় তাই।”

- সৌমি মল্লিক

“ফেলুদা চরিত্রটি শুধুই একটা গোয়েন্দা চরিত্র নয়। ফেলুদা মানব মনের সব ভাল দিকগুলো নিয়ে তৈরি এক আদর্শ চরিত্র। তাইতো ফেলুদা আমাদের সবার এত প্রিয়। বিশেষত নবীন কিশোর কিশোরীদের সবুজ সুন্দর মনে ফেলুদার উজ্জ্বল ব্যাক্তিত্ব একটা চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। তাই তো ফেলুদা ছাড়া বাঙালি ছাত্রসমাজের জীবন অচল। ছাত্র জীবনে স্কুলের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ফেলুদার বই ছাত্র - ছাত্রীর চরিত্র গঠনের জন্য উৎকর্ষ মানের। তাই ফেলুদা পড়ে অন্তত পেশার দিক থেকে ‘গোয়েন্দা ফেলুদা ’ না হলেও , চরিত্রের দিক থেকে ‘ মানুষ ফেলুদা ’ আশা করি হয়ে ওঠা সবার পক্ষেই সম্ভব হবে ভবিষ্যতে।”

- সায়নদীপ চট্টোপাধ্যায়

“সব বাঙালীই প্রায় ভ্রমণ প্রিয়। পুজোর ছুটি আর গ্রামের ছুটিতে স্কুলের প্রায় সবাই ঘুরতে যেত নানা জায়গায়। আমার কোথাও ঘুরতে যাওয়া হতনা। তাই ছুটির দিনগুলোতে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল দূরদর্শনে প্রচারিত ছুটি ছুটি অনুষ্ঠানটি। ওখানেই প্রথম দেখি জয় বাবা ফেলুনাথ আর সোনার কেল্লা। সেই ফেলুদাকে চেনা , ফেলুদার সাথে পরিচয়। তবে আলাপ টা হয় আরও কয়েক বছর পরে। ক্লাসে একদিন রচনার বিষয় ছিল ' তোমার প্রিয় লেখক '। একজন লিখেছিল তার প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে। সেদিন জেনেছিলাম সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যিক হিসেবেও একটা আলাদা জগৎ আছে। তার আগে আমার কাছে উনি শুধুই একজন খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক ছিলেন। সেদিন জেনেছিলাম ওনার সৃষ্ট চরিত্র বিখ্যাত গোয়েন্দা ফেলুদার নাম। তার পর ফেলুদার বই কিনে , বা অন্যদের থেকে বই নিয়ে পড়তে পড়তে আসতে আসতে আলাপটা জমে উঠল ফেলুদার সাথে। আর তার সাথে বাড়তে থাকলো আমার জ্ঞানের ভান্ডার। ভ্রমনের নেশাটাও বোধ হয় আরও পেয়ে বসলো সেই থেকে। সিধু জ্যাঠার সেই খবরের কাগজ কেটে খবর সংগ্রহ করে খাতা বানানো আমাকে এত অনুপ্রেরিত করেছিল যে আমিও ওরকম ডায়েরি বানিয়ে ফেলেছিলাম। তখন তো আর এখানকার মত কম্পিউটারে বোতাম টিপলেই সব তথ্য ঘরের দোর গোড়ায় পৌঁছে যেতনা। সেই যে স্কুল জীবন থেকে শুরু , আজ এই বয়সে পৌঁছেও ফেলুদার সঙ্গ ছাড়তে পারিনি। তাই এখন আমার সব সময়ের সঙ্গী ফেলুদার চলচিত্রগুলো বা গল্পের বইগুলো। ফেলুদার প্রতি ভালবাসা থেকেই একদিন ফেসবুকে জয়েন করেছিলাম ফেলুদা ফ্যান ক্লাব। আজ প্রায় ১ বছর হয়ে গেল আমি এই ক্লাবের সদস্য। আজ আমরা ফেলুদার সকল ভাই বোনেরা এক পরিবারের সদস্য। ফেলুদার প্রতি উন্মাদনা আমাদের কোনো দিনও শেষ হবে না , তবে এই লেখাটা আমায় শেষ করতে হবে। তাই সকল কে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখা শেষ করলাম।”

- সোমা মজুমদার

"ফেলুদার সাথে আমার প্রথম আলাপ টিভি তে... তখন আমি ক্লাস ৩ র ছাত্র... একদিন সন্ধেতে বাবা ডেকে বলল এক্তা ভাল সিনেমা আজ তকে দেখাবো, বাবার সাথে বসে সিনেমা দেখা...? একটু কৌতুহল হল, দেখতে বসলাম সোনার কেল্লা..। যতক্ষণ চলেছিল একটা কথাও বলিনি... তার পরে অবশ্য প্রশ্ন করে বাবার মাথা খারাপ করে দিয়েছিলাম...বাবা জেরবার হয়েই বোধহয় উঠে গিয়ে কোথা থেকে জানি কয়েকটা বই এনে দিল... অপূর্ব সব প্রচ্ছদ র উপরে একটা নাম সব কটা বইতেই জ্বলজ্বল করছিল, 'সত্যজিৎ রায়' ... এই লোক টা আবার কে ? বাবা যে বলল ফেলুদার গল্প তপসে লেখে ? প্রচণ্ড রাগ হল লোকটার তার উপর... 'দুষ্টু লোক' সত্যি ভারী দুষ্টু তো মন্দার বোসের থেকেও বেশি কিনা ...জানবার জন্যই বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছিলাম... তারপর দেখলাম দুষ্টু লোকটাই কবে...অপু হয়ে কাশবনে দেয় এক ছুট, কখনও Mr. No one হয়ে বলে ওঠে 'magic'।''

- রউনক ব্রাউন

"ফেলুদা!! নামটা শুনলেই মনে পড়ে যায় সেই ছোট্ট বেলায় বাবা মায়ের সাথে বসে দেখা সেই সিনেমাটার কথা৷ নামটা বোধহয়ে বলে দিতে হবে না৷ ঠিকই ধরেছেন··· "সোনার কেল্লা"৷ সেই সোনার কেল্লা যা এখনো সমস্ত বঙ্গবাসীর মনে শিহরণ জোগায়৷ সেই রাজস্থানের উপর নির্মিত রোমাঞ্চকর কাহিনী৷ সেই প্রথম দেখা ... তারপর থেকে আজও আমি ফেলু প্রেমে পাগল৷ ফেলুদার সবকটা গল্প যে কতবার পরেছি তার ইয়ত্তা নেই৷ যদিও আগেও জানতাম যে আমার মত এ বঙ্গদেশে ফেলুপ্রেমী প্রচুর ছড়িয়ে রয়েছেন, তবে সেই বিশাল ভিড়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ আগে হয়নি৷ ফেলুপ্রেম বা ফেলুচর্চা স্কুলের বন্ধুমহলেই আবদ্ধ ছিল৷ ফেলুপ্রেমীদের প্রেম যে এই বঙ্গসমাজের কতটা গভীর পর্যন্ত রয়েছে সেটা টের পেলাম ফেসবুকের এই "ফেলুদা ফ্যান ক্লাব" নামক গ্রুপে এসে৷ এখানকার সদস্যদের সঙ্গে আলাপ না হলে ফেলুভক্তের এই বিশাল ব্যাপ্তি আমার কাছে অজানা অচেনাই থেকে যেতো৷ বলা যেতে পারে আট থেকে আশি সবাই এখানে এক৷ তাদের একটিই পরিচয়.. তারা ফেলুভক্ত৷ তো সেই ফেলুভক্তের দল মিলেই একদিন ঠিক করা হল যে একটি শারদীয়া ই-ম্যাগাজিন বের করা হবে৷ যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে সবাই কাজে লেগে পড়লাম৷ সত্যি বলতে আমি এই অদ্ভুত সুন্দর শারদীয়া সংখ্যাটির সম্পাদকমন্ডলীর মধ্যে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি৷ এতো উৎসাহ নিয়ে সব সদস্যরা এবং অন্য আরও অনেকে যেসব দুর্দান্ত এবং অনবদ্য লেখা পাঠিয়েছেন তা আমরা আমাদের এই ম্যাগাজিনে দিতে পেরে সত্যিই কৃতজ্ঞ৷ আশা করবো সমস্ত পাঠকদেরও সেসব ভালোই লাগবে৷ আমাদের যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তবে মার্জনা করবেন, সেইগুলি অবশ্যই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত৷ আর আমাদের এই প্রথম প্রচেষ্টা কেমন লাগলো নিশ্চই জানাবেন৷ ।।জয় বাবা ফেলুনাথের জয়।।''

- অঙ্গনা সেনগুপ্ত

"সন্ধ্যা শশী বন্ধু = P.C. Mitter। ফেলুদা মানেই আবেগ। কাশির গলি থেকে মুম্বাইএর ম্যারিন ড্রাইভ। পুরীর সমুদ্রতট থেকে লখনউএর ভুলভুলাইয়া। কখনও বা সুদুর লন্ডন, কখনও আবার নিজের শহর কলকাতায়। আজ থেকে বহু বছর আগে যখন সত্যজিৎ রায় প্রথম ফেলুদা কাহিনী " ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি" লিখেছিলেন তখন হয়তো এটা ভাবেননি যে আগামি বছরগুলো হয়ে উথবে কতটা ফেলুদাবর্ণ। অথচ আনন্দমেলা ও দেশ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক, নিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একথা জানিয়েছিলেন, যে উনি একবার সত্যজিৎ রায়কে বারংবার অনুরোধ করেছিলেন যে সেবার দেশে ফেলুদা কাহিনী একটা দিতেই। প্রয়োজনে প্রকাশনার দিন উনি পিছিয়ে দিতে রাজি। ফেলুদা নিয়ে যে মাতামাতি আজ কমে গেছে, এবং তা শুধুমাত্র রুপোলী পর্দাতেই সীমাবদ্ধ একথা আজ মনে হচ্ছে না। কারন এই ই-ম্যাগাজিন ! প্রকাশনার প্রকল্প মাথায় আসার পর যে উৎসাহ মানুষজন দেখিয়েছে, তা সত্যিই অভুতপূর্ণ। সম্পাদকীয় কাজে মননিবেশ করার পর, তা দেখে আমার যতটা আনন্দ হচ্ছিল, তার চেয়েও বেশি আবেগের স্যৃতিতারিত হয়েছিলাম। বলতে আপত্তি নেই, একটু ভয়ও লাগছিল। শেষ পর্যন্ত সফল হবে তো আমাদের প্রচেষ্টা ??? উত্তর আজ অবশ্যই ইতিসুচক। আর একটা প্রশ্নও আছে ? "আমরা ও ফেলুদা" পড়ার পর সেটা জানতে চাই আপনাদের থেকে। ... "ভালো লাগলো ?''

- দেবায়ন ঘোষ

কবিতা
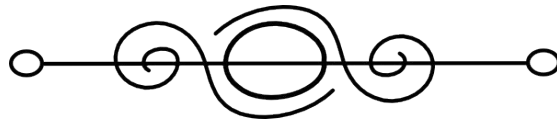
আগমনী

রক্তিম আচার্য

রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশে ,
শ্বেত শুভ্র মেঘ ভাসছে বাতাসে।
এলো শরৎ বছর ঘুরে ,
আগমনীর বার্তা নিয়ে ।।
শিউলি ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভে ,
লেগেছে দোলা মনের গভীরে।
কাশের বনে হুড়োহুড়ি ,
আসছেন মা শিগ্‌গিরী ।।
সপ্তমী , অষ্টমী আর নবমীতে ,
থাকবেন মা মোদের সাথে।
নাচ গান আর হৈ হুল্লোড়ে ,
মাতবে সবাই আনন্দেতে ।।
দশমীতে বিদায় বেলায় ,
অশ্রু জল নয়ন ভেজায়।
বিসর্জনের বাজনা বাজে ,
মা চলেছেন নিজের কাজে ।।

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

অন্ধকারের আড়ালে

দেবায়ন ঘোষ

-১-

বিকেলে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। আজ সারাদিন প্রচন্ড গরম। বেলা পড়ে আসতে ভাবলাম হেঁটে আসি। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই আকাশ এমন কালো করল যে অগত্যা বাড়িমুখো হলাম আবার। যখন ঘরে ঢুকছি তখন সাঙ্ঘাতিক হাওয়া দিচ্ছে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ। কালবৈশাখীর সময়। টিভি খুলে আইপিএলের খেলা ধরলাম। গেইল পুনে টিমকে একাই উড়িয়ে দিয়েছে। শেষ দিকটা দেখতে দেখতে এতই মশগুল হয়ে গেছিলাম যে লক্ষই করিনি কখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। যখন উঠলাম তখন বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পরছে।

জানলার কাঁচে দেখতে পাচ্ছিলাম বাইরে বিদ্যুৎের খেলা। ভাগ্যিস বের হইনি। ছাতা থাকলেও এ বৃষ্টি তে না ভিজে উপায় নেই। বাড়িতে কেউ নেই আজ। মা এখন জলপাইগুড়িতে। এই স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে কালো কফির জুড়ি নেই। কিন্তু এরকম বৃষ্টিতে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে খুব। স্কুলে থাকতে বৃষ্টি মানেই ছিল পুরদস্তুর ভেজা এবং ফুটবল। বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনি শুনতে হত এবং তার পর জম্পেশ খিচুরি এবং ইলিশ। খাওয়াটা এখনো হয় কিন্তু স্কুলের সেই মজা আর নেই।

কফি নিয়ে সবে ল্যাপটপটা খুলেছি এমন সময় ডোরবেল বাজল। সাড়ে ছটা। এই সময় কারও আসবার কথা নেই। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি এখনও পরছে। কাপটা রেখে উঠলাম। বৃষ্টি না হলে আরও ঘন্টাখানেক আলো থাকত। ড্রয়িং রুমের লাইট জ্বালিয়ে দরজা খুললাম। আর খুলেই প্রায় স্তম্ভিত।

যে মুখটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে সেই হাসি আমার খুবই পরিচিত। অন্তত বছর পাঁচেক আগেও ছিল। কিন্তু সেই পাঁচ বছর আগেই শেষ দেখা। তারপর একদমই কোনও খবর পাইনি ওর। এতদিন পর প্রণয় কে দেখে ভাললাগার সঙ্গে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। তার মধ্যে রাগ, কৌতুহল ছাড়াও যেটা বেশি ছিল তা হল একটা অবাক ভাব। এইরকম সময়ে আর যাই হোক আমি প্রত্যাশাই করিনি যে আমি ওকে দেখতে পাব। হতবাক বিস্ময়ে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম তা প্রায় আধ মিনিট হবে। কিন্তু এর মধ্যেই নানা কথা মনে আসছিল।

আমার বন্ধু তখন হাসছে। বিস্ময় বোধটা কাটিয়ে উঠে আমি বলে উঠলাম, " তুই ? হঠাৎ?"

"কেমন আছিস ? সেই ক্লাস টেন এর পর তো আর দেখাই হয়নি। একটু মোটা হয়েছিস।"

কথা বলতে বলতে দুজনেই ঘরে ঢুকলাম। ভাল করে ওর চেহারা দেখে অনুমান করছিলাম যে এই পাঁচ বছরে আমাদের বয়স ছাড়া আর কিছুই বদলায়নি।

চারপাশে একবার তাকিয়ে প্রণয় আমার দিকে ফিরে হাসল। " কফি খাচ্ছিলি তো ? খেতে খেতেই চল গল্প করি। "

একটু অবাক হলেও হাসলাম। বললাম ," তোর ফেলুদা দৃষ্টি কি শুধু এই টুকুই ধরতে পারল ? "

" হ্যাঁ। সেই সাথে তুই যে গতকাল নতুন জুতোটা কিনেছিস সেটা সম্ভবত কাল রাতে পড়ে বেরিয়েছিলি। বাড়িতে কেউ নেই দেখে নিশ্চয়ই অনেক রাতে ফিরেছিস। আর সেটা অবশ্যই তোর দেরিতে ঘুম ভাঙার কারণ। সম্ভবত কোনো পাথুরে জায়গায় গিয়েছিলি। বাঁ হাতের কনুই আর চেটো খানিকটা ছড়েছে। "

হাসি লুকোতে পারলাম না। নিজের হাতের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললাম , " তা হলে তোর চোখ এখনও একই আছে। "

" উঁহু। অনেক বদলেছে। তোর দৃষ্টিও অনেক বেটার হয়েছে।"

" তা তো বটেই। শুধুই কি তুই ফেলুদার ভক্ত ! কিন্তু হাতের ক্ষত দেখে তো বুঝলাম পাথুরে জায়গার কথা বললি। বাড়িতে কেউ নেই সেটাও বোঝা যায় নিস্তব্ধ দেখে। কিন্তু দেরিতে ঘুম ভেঙেছে সেটা কি করে বললি ? "

প্রণয় হাসিটাকে চওড়া করল। " তোর বারান্দায় আজকের খবরের কাগজটা এখনও পড়ে আছে। এতই দেরিতে উঠেছিস যে সেটার কথা মনেই ছিল না। তাছাড়া তুই আর্লি রাইজার। এত দেরিতে ওঠার একটাই কারণ, তুই প্রায় ভোরবেলা শুতে গিয়েছিলি। "

" হয়েছে হয়েছে। অনেক কথাই বললি। কফি খাবি কিনা সেটা তো বল। "

" উইথ প্লেসার। "

কফি নিয়ে এসে বসেই আমি বললাম, " কখন বের হব ? "

" একটু পরেই। বৃষ্টিটা ধরুক--- " বলতে গিয়েও থেমে গেল, " আমরা যে বের হব তুই কি করে জানলি ? "

এবার আমার হাসির পালা। কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম ," কেন , তুই যে কোনো গোপনীয় ব্যাপারে এসেছিস, তা কি আর জানি না ? আসবার সময় অভয়নগরে দাঁড়িয়েছিলি। এবং কাল রাতের থেকে তুই খুবই ব্যাস্ত। বেশি ঘুমও হয়নি।"

এবার ওর অবাক হওয়ার সময়। নেড়েচেড়ে বসে প্রণয় বলল , " কি ভাবে বুঝলি ভাই ?"

" ধুস , এতো কিছুই না। এতক্ষণ যে তুই পেছনে মাঠে রাখা গাড়িটাতে বসে ছিলি সেটা তো বললামই না।

ও হাসতে হাসতে বলল," ফাটিয়ে দিয়েছিস, ফেসবুকের ক্রিমিনাল কেস গেমটাতেও এত ভাল পর্যবেক্ষন হয় না।"

"তোর জুতোয় অজস্র কালো মাটির ছোপ যেগুলো এখন অভয়নগরেই রয়েছে রাস্তা চওড়া করার জন্য। তোর কব্জির কাছে কাদার দাগ যেগুলো অবশ্যই টাটকা নয় আর তুই মোটেও ভিজিসনি। অথচ অনেকক্ষণ ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল। আর আমি রান্নাঘর থেকে একটা কালো স্করপিওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি পেছনের মাঠে। সোজা হিসেব।"

প্রণয় কফির কাপটা টেবিলে রাখল। তারপর সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল , "তুই এই পাঁচ বছরে অনেকটাই উন্নতি করেছিস। আমি সেই জন্যই তোর কাছে এসেছি। একটা বেয়াড়া অনুরোধ আছে। আমি জানি তুই সেটা ফেলতে পারবি না।"

-২-

বাইরের বৃষ্টি অনেকক্ষণ হল থেমে গেছে। গুমোট ভাবটা আর নেই। বরং একটা মৃদু বাতাস বইছে বাইরে। এরকম সন্ধেবেলা মন খারাপ লাগে। একাকীত্বতা পুরোপুরি বোঝা যায় । মাঝে মাঝে দুঃখের কথা মনে পড়ে। কখনো বা মন পুরোন স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তখনই সব চিন্তা এক হয়ে মনের জানলা খুলে দেয়। স্মৃতির রহস্য এখানেই। যত রাত বাড়ে তত মনের কোনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এর ব্যাতিক্রম অবশ্যই আছে। যেমন আজ।

প্রণয় চুপ করে বসে ছিল। একমনে আমার টেবিলে রাখা মুর্তীটা দেখছিল। চোখ তুলে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দাঁত কামড়াল। ওর এই স্বভাব আমার খুব পরিচিত। তাই ডান পা টা বাঁ পায়ের ওপর তুলে বসলাম।

" প্রথম থেকে বল। "

ও অল্প হাসল। তারপর পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে একটু ঘেঁটে আমার দিকে দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে একটা মেসেজ রয়েছে,

"B2-IO-RN, -M4P_GNSDK,bc0d"

"স্ক্রল করে যা।"

পরের মেসেজটা একটা ছবি, যেটা আগরতলায় সবারই খুব পরিচিত। রাধানগর বাস স্ট্যান্ড। কয়েকমাস আগেই চালু হয়েছে। অত্যাধুনিক শব ব্যাবস্থাসম্পন্ন। ছবিটা দিনের বেলায় তোলা। বেশ কিছু গাড়ি ও মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

ছবিটাতে তেমন কিছু দেখলাম না। প্রণয় এবার মোবাইলটা নিয়ে বলল," লেখাটার কোনো মানে পেলি? "

পাইনি, তাও গম্ভির ভাবে বললাম ," M4 টা তো একরকম বন্দুক। তবে পুরোটা ঠিক বুঝলাম না। তুই এই ব্যাপারটা খোলসা করে বলার পর মাথা খেলবে। "

প্রণয় এবার একটু আরাম করে বসল , তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল ," তুই তো জানিস গোয়েন্দাগিরিতে আমার চিরকালই উৎসাহ। এমবিএ করতে করতে তাই টুকটাক কিছু কাজ করি।"

ভুরু কপালে তুলে বললাম, " তুই তাহলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লাইসেন্স আছে নাকি

? এই বয়সে ? "

" আরে না না। দাদা এখন আই.বি. তে আছে তাই মাঝে মধ্যে কিছু সাহায্য করি। লাইসেন্স নেই তাই বলে। "

" বাহ। সাবাস বস। এই তো চাই "

" পুর ব্যাপারটা শোন। আজ তো ২৩ এপ্রিল। গত ১৯শে এপ্রিল এক ভদ্রলোক আমার কাছে আসে। যেহেতু আমাদের চেনে তাই উনি দাদার কাছেই গিয়েছিলেন প্রথম। কিন্তু দাদা কেসটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। আমার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি তখন পুনেতে। তা আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম সামান্য ব্যাপার। কিন্তু এখন বেশ প্যাঁচালো হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা। "

প্রণয় একটু দম নিল। আমি একমনে ওর কথা শুনছি। বেশ একটা আগ্রহ জমছিল। তাছাড়া ও গুছিয়ে কথা বলে। তাই মনোযোগ দিয়ে শোনা যায়।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে , প্রণয় বলতে থাকল, " ভদ্রলোক বাঙালি। থাকেন নাগপুরে । কদিন ধরে উনি একটা সমস্যায় পড়েছেন। ওনার মোবাইলে একটা নম্বর থেকে খুব ফোন আসছিল। কোনো কথা নেই শুধু কিছু মেটালিক টিউন বাজছে। প্রথমে কোনো রসিকতা ভাবলেও গত সপ্তাহে ওই নম্বর থেকে একটা মেসেজ আসে। তাতে লেখা ছিল 'আপনার পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি আজ রাতে আপনার অ্যাপার্টমেন্টের ছাদে রেখে আসবেন। ' ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে ওই নম্বরে ফোন করেন। কিন্তু বলে যে সুইচ অফ। বাধ্য হয়ে উনি ছাদে একটা কাগজে লিখে রাখেন যে ' কিসের কথা বলছেন সেটা বললে আমি তাই দেব '। এরপর সারারাত উনি ঘুমননি। "

আমি ধৈর্য্য হারিয়ে বললাম, " তারপর ? পরের দিন কি লেখা ছিল ওখানে ?"

প্রণয় এবার গম্ভির হয়ে বলল," পরেরদিন সকালে হইচই বেধে গেল। ছাদে ওনার লেখাটার পাশে একটা ডেডবডি পরে ছিল। তার পাশেই সেই কাগজটা যেটা উনি লিখে রেখেছিলেন। "

সোফার মধ্যে সোজা হয়ে বসলাম। মুখে বললাম ," আশ্চর্য ব্যাপার তো। ডেডবডিটা কার ? ওনার চেনা কারও ?"

" না। সেটাই আশ্চর্য। ডেডবডি কেউ শনাক্ত করল না। পুলিশ এসে ছাদটা কর্ডন

করে গেছে। সেই কাগজটাও পেয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোককে এখনও কিছু বলেনি। "

" তারপর উনি তোর কাছে এলেন। বুঝলাম। কিন্তু এখনও এটাই বুঝতে পারছি না যে তুই এই কেস নিয়ে আমার কাছে এলি কেন ? এবং শুধু আমার কাছে না, তুই আগরতলা এসেছিস কাল। কি ব্যাপার বলতো যে তুই এতদিন পরে দেখা করতে এলি দুর্যোগের মধ্যে তাও পুনেতে ঘটা একটা খুনের কেস নিয়ে, যেরকম ঘটনা খবরের কাগজে হামেশাই দেখা যায়। "

প্রণয় এবার মৃদু হেসে, মোবাইলে ইন্টারনেটে একটা পেজ খুলে দিল। দেখলাম সেটা 'দ্যা হিন্দু ' কাগজের একটা লেখা। এবং লেখাটা আমাকে নিয়েই। মাস দুয়েক আগে গৌহাটিতে একটা মূর্তি চুরি কেস আমি সমাধান করি। ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে।

ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম," খবর ভালই পেয়েছিস। কিন্তু আমার হেল্প কেন দরকার হঠাৎ ? "

" বলছি। তার আগে বল, তোর শান দাওয়া মস্তিস্কে এখনও আশা করি জং ধরেনি ? "

ক্ষেপে গিয়ে পাল্টা আক্রমণ করার আগেই ও হেসে বলল," আমরা দুজনেই জানি যে তা হয়নি। আমি তোর কাছে এসেছি সাহায্যর জন্য। এই কেস এমন দিকে মোড় নিয়েছে যে আমরা দিশাহারা হয়ে গেছি। তাই তোর মত কাউকে দরকার। "

প্রণয় মোবাইলটা হাতে চেপে ধরল। তারপর বলল ," এই কেস সাধারণ নয়। তাই তোকে আগেভাগেই বলে রাখি এতে বহুত ঝামেলা আছে। তাই তুই যদি অরাজি হোস তাতে অসুবিধে নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি তোকেই চাইছি আমার পাশে। "

" কাউন্ট মি ইন। এবার বল পরের ব্যাপারটা। বডিটা তোরা শনাক্ত করলি কখন ?"

প্রণয় ভুরুটা একবার ওপরে তুলেই নামিয়ে নিল। " যাক। তুই ঠিক ধরতে পারলি। হ্যাঁ যেটা বলছিলাম। ভদ্রলোক এই ব্যাপার দেখে দাদার মারফৎ আমার কাছে এলেন। আমি সব শুনে তখনই দাদাকে ফোন করি। বলি যে লাশটা যেন দেখতে পাই। ঘন্টা তিনেক পরে আমি আর আই.বি. ল্যাবের একজন যাই মর্গে। সেখানে লাশের একটা ছবি তুলি গোপনে। সেটা দাদাকে পাঠাতেই ও আমায় বলে এ এক কুখ্যাত অপরাধী। নাম প্রশান্ত ধাওয়ান। নিবাস মুম্বাই। দাদা আমায় বলে যে এই কেস থেকে সরে যেতে। কিন্তু পরেরদিন সকালেই সব

গড়বড় হয়ে গেল। খবর পাই যে ব্যাঙ্গালোরের এক নাইট ক্লাব থেকে কর্ণাটক পুলিশ প্রশান্ত ধাওয়ানকে গত রাতে গ্রেফতার করে। পুলিশ রেকর্ডে যে আঙুলের ছাপ ছিল তাও ওর সাথে মিলে যায়। মৃতদেহর সঙ্গে কোনও মিল নেই চেহারায়। ওকে কড়া বন্দিতে রাখা হয়েছে। এদিকে সেই লাশটা এখনও আনক্লেইমড। আমরা তথ্যগুলো সব নিজেদের মধ্যেই রেখেছিলাম। দিল্লিতে হেডঅফিসেও খবর পাঠানো হয়নি। এরই মধ্যে আর একটা ব্যাপার হল "।

প্রণয় থামল। আমি রীতিমতো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টার , খুনখারাপি , লাশ, এসব শুধু খবরের কাগজ থেকে নিউস চ্যানেল অবধিই ছিল। আজ একেবারে মুখোমুখি বর্ণনা। শুনতে শুনতে সাঙ্ঘতিক উত্তেজনা হচ্ছিল।

-৩-
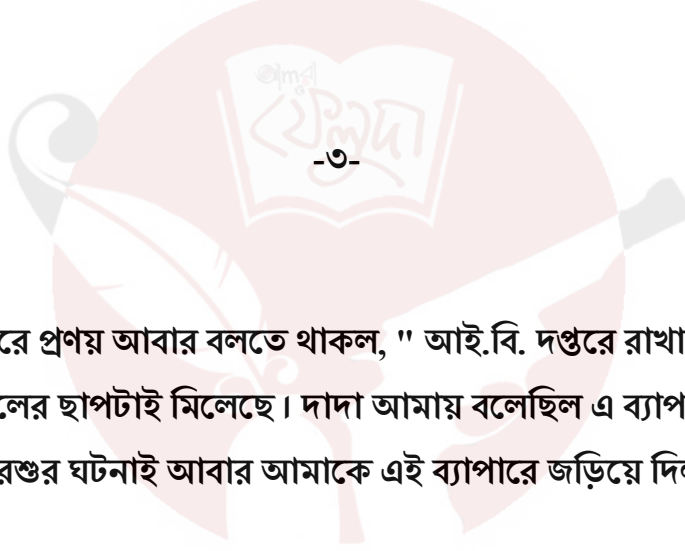
মিনিটখানেক চুপ করে প্রণয় আবার বলতে থাকল, " আই.বি. দপ্তরে রাখা ধাওয়ানের ছবি সব ভুল ছিল। শুধু আঙুলের ছাপটাই মিলেছে। দাদা আমায় বলেছিল এ ব্যাপারটায় বেশি জড়াতে না। কিন্তু পরশুর ঘটনাই আবার আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়ে দিল।"

" কিরকম ? "

" যে ভদ্রলোক কেস নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম ধিরেন্দ্রনাথ সহায়। পরশুদিন সন্ধেবেলা উনি ফোন করে আমায় বললেন উনি নাকি আমার সাথে কথা বলতে চান। বাড়িতে না , উনি আমায় বললেন বাইরে দেখা করতে। একটা ক্যাফের ঠিকানায় বললেন আমায় ঠিক সন্ধে ৬-৩০ দেখা করবেন। "

" তারপর ? "

" আমি একটু আগেই গেছিলাম। ক্যাফেটা রাস্তার ঠিক পাশে না। একটু ভেতরে একটা গলিতে। তেমন কিছু সন্দেহজনক না দেখে আমি বসে মিঃ সহায়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম।"

প্রণয় থেমে আবার দম নিল। তারপর কিছুক্ষন হাতে ধরা কাপটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, " সাড়ে ছটার একটু পরেই কি হল জানিস ? "

মাথা নাড়লাম। ও সেটা দেখে বলল," ক্যাফেতে আমি একলা না ,আর দু-তিন জন ছিল। তার মধ্যেই একটা টেবিলে দুটো লোক বসে ক্যাপুচিনো খাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন উঠে বাইরে চলে গেল। অন্যজন মিনিটখানেক টেবিলে বসে থেকে তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তারপর ধিরেসুস্থে আমার দিকে আসতে থাকল।

" এতক্ষণ আমি মিঃ সহায়ের চিন্তা করছিলাম তাই ওদের দিকে বেশি নজর দিয়নি। কিন্তু এবার লোকটাকে এদিকেই আসতে দেখে সতর্ক হলাম। লোকটা কিন্তু নীরবে আমার টেবিলে এসে বসে পড়ল।

" আমি কিছু বলার আগেই দেখতে পেলাম একটা সাইলেন্সার দেওয়া রিভলভার আমার দিকে তাগ করা। এবং সামনে বসা লোকটা সোজা তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই দেখলাম ওর চোখ একদম ঠান্ডা। সাইলেন্ট কিলার। "

এবার আমার থতমত খাওয়ার পালা। অবাক হয়ে বললাম, " বলিস কি ? "

"শোন না। আমি তখন হতভম্ভ। লোকটা কিন্তু গুলি চালায়নি। আর এমন ভাবে বন্দুকটা ধরে আছে যে অন্য কেউ দেখতেই পাবে না। আমার তখন মুখ শুকিয়ে গেছে। কিছু বলব বলে মুখ খুলতে গেছি এমন সময় বাইরে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। দুবার। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল বাইরে। আমি তখন বসে আছি। এর মধেই আর একবার গুলির আওয়াজ পেলাম। তারপরই একটা গাড়ির আওয়াজ।

"ক্যাফের ম্যানেজার ততক্ষণে পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে। আমি ছুটে বাইরে এসে দেখি সেই লোক দুটো বাইরে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে একজনের মুখ। অন্যজন যে প্রথমেই বাইরে গেল তার পেটে গুলি লেগেছিল। আমি তার কাছে যেতেই সে একহাতে ক্ষত চেপে উলটে পরে গেল। বুঝলাম প্রান হারাল।

" ততক্ষনে আরও লোক এসে গেছে বাইরে। আমি দাদাকে ফোন করে বিস্তারিত বলতেই ও উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলল ওখান থেকে চলে আসতে। রাতে পুরো ব্যাপারটা জেনে আরও অবাক হলাম। ওই লোক দুটো কর্নাটক পুলিশের লোক। ওরা নাকি খবর

পেয়েছিল যে ওই ক্যাফেতে আজ এক গ্যাংস্টার মিটিং হবে। কিন্তু কাউকেই না পেয়ে অবশেষে আমাকেই সন্দেহ করে গ্রেফতার করতে আসে। বোধহয় ভেবেছিল আমি ইনফরমার। কিন্তু তার আগেই কেউ বা কারা ওদের শেষ করে দেয়। এবং আশ্চর্য এই যে মিঃ সহায়ের এরপর থেকে কোন খোঁজ নেই। ওনার ফ্লাটেও তালা দেওয়া। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে পাশের ফ্ল্যাট এমনকি দারোয়ানও বলছে যে গত দুইদিন ধরে ওনার কোন পাত্তা নেই। উনি ফ্লাটেও আসেননি। তাহলে আমায় ফোন করল কে ?"

একটানা অনেকটা বলে প্রণয় একটু জল খেল। আমি কিছু বলতে গিয়েও বললাম না। ও আবার বলতে শুরু করল ," আমি সন্দেহ করলাম, সহায়ের কাছে এমন কিছু আছে যা কোন একটা দলের দরকার। কোনোভাবে তার বিপরীত দলের লোকেরা সেই খবর পেয়ে যায় এবং সেটা দখল করতে আসে। একজন খুন হয় বাকিরা পালায়। সহায় বাধ্য হয়ে দাদার কাছে যায় এবং আমার কছে আসে। দলের কেউ সেটা দেখে ওকে গুম করে। সম্ভবত ওরা ইচ্ছে করেই কাগজটা লাশের পাশে ফেলে যায় এবং ওর ফোন থেকে গলা ভাঁড়িয়ে আমায় ফোন করে এবং আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে। "

একটু থেমে প্রণয় বলতে থাকল, " কাল আমরা সহায়ের অ্যাপার্টমেন্টের ক্লোজ-সার্কিট কামেরার ফুটেজ দেখলাম। তেমন কিছুই নেই। তখনই খবর এল সেই দুই পুলিশের একজনের কাছে একটা মোবাইল পাওয়া গেছে যাতে এই সাঙ্কেতিক লেখা আর এই ছবিটা ছিল। দাদা খুব ব্যাস্ত তাই আমাকেই পাঠাল আগরতলায়।

" কাল আমি অনেক রাত অবধি চিন্তা করেছি। কিন্তু তারপরই আজ সকালে দুটো সাঙ্ঘাতিক খবর পেলাম। এক, দুই গ্যাঙই ধরা পরেছে। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ এই মেসেজের ব্যাপারে কিছু বলতে পারেনি। নানা ভাবে প্রশ্ন করেও কিছু পাওয়া যায়নি। আর ওই মোবাইলটার সিম কার্ডও এদের কারও নামে নয়। বরং পি এস সিদাঙ্গা বলে একজনের নামে আছে। সে মুম্বাইয়ের একটা শপিং মলের কর্মচারি ছিল। বছর পাঁচেক আগে মারা যায়। কোন ভাবে এই সিমটা এদের হাতে এসে পড়ে। সেটা দিয়ে অনেক দুস্কর্ম চালিয়েছে। তবে ওদের একজন কবুল করেছে যে ওদের মধ্যে কেউ খুনখারাপি করে না। স্মাগলিঙের ব্যাবসা। দুটো গ্যাঙই ছোট। তাই মনে হচ্ছে এর পেছনে অন্য কারও হাত রয়েছে। "

" আর দ্বিতীয় খবরটা ? "

"সেটাই সবচেয়ে গুরুতর। কর্ণাটক পুলিশ খবর পাঠিয়েছে যে ওরা যে দুজন পুলিশকে পুনেতে পাঠাবে বলেছিল তাদেরকে একটা বন্ধ কারখানায় মুখ-হাত বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। যে দুজন মারা গেছে তারা পুলিশ নয়। বরং সম্ভবত সেই অন্য দলের লোক। কিন্তু রাধানগর দেখেই আমি বুঝলাম এদের আগরতলায় কিছু গোলমালের মতলব আছে। "

" সর্বনাশ। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার তো। কিন্তু আমার সাহায্য কিভাবে চাই ? "

" দেখ। আমার মন বলছে ওই সঙ্কেতে কিছু না কিছু ব্যাপার লুকিয়ে রয়েছে। আগরতলা ছোট জায়গা। তাই এখানে পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে ঘেরাও করা যাবে। তাছাড়া ২০০৮ এ বোমা বিস্ফারণের পর এখানে কড়াকড়ি আরও বেড়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি এখানে কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এটা দাদা নিজেই বলল। "

" ঠিক আছে তো আমরা সঙ্কেতটা দিয়েই কি শুরু করব ? "

" হ্যাঁ। তার আগে তোকে বলে রাখি যে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ আনঅফিসিয়ালি এসেছি। সঙ্গে দুজন গার্ড ছাড়া কেও নেই। লোকাল কোন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না। আমার পুরো বিশ্বাস যে সহায়ের কেসটা ও এই ছবি ও লেখা একই সুত্রে জড়িত। "

প্রণয়ের থেকে মোবাইলটা নিয়ে লেখাটা ভাল করে দেখে নিলাম। আমার মোবাইলে সেটা লিখেও নিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম ," তোর সঙ্গে দুজন গার্ড আছে বললি। কোথায় ওরা ? গাড়িতে আছে না আমার বাড়ির বাইরে ? "

" তোর বুদ্ধি আছে। দুই জায়গাতেই একজন করে আছেন। "

ঘড়ির দিকে তাকালাম। নয়টা দশ। বললাম ," ডিনার করে বেরবি ? " ও বলল ," না চল, বাইরে খেয়ে নেব। "

দুএকটা জিনিস নিয়ে কালো শার্ট আর ডিপ ব্রাউন কার্গো পড়ে যখন বের হচ্ছি, ঘড়িতে ঠিক সাড়ে নটা বাজে।

-8-

গাড়িতে উঠে দুজনের সাথে পরিচয় হওয়ার পর ,একজন চালাতে শুরু করল। কালো স্করপিওটার সামনে একজন বসেছে, তার হাতে সাইলেন্সার লাগানো সাবমেশিন গান। অন্যজন গাড়ি চালাচ্ছে। প্রণয় ওর ল্যাপটপে একটা ডকুমেন্ট পড়ছিল। এবার আমার দিকে সেটা দিয়ে বলল," দ্যাখ "।

স্ক্রিনে একটা ছোট রিপোর্ট। ওপরে লেখা আছে
sent from secure server, RAW Database । COPY 1 of 1 copies । patch_IB_DEL_CCU_BOM

তার নিচে একটা ছবি। বেশ ফরসা এক ভারতীয় তরুণ। বয়স লেখা আছে ৩৪। সেই সঙ্গে এটাও লেখা যে এ এই মুহূর্তে উত্তর-পুর্ব ভারতে লুকিয়ে রয়েছে। বাকি আরও অনেক লেখা ছিল কিন্তু সেগুলো ঝাপসা করা। অর্থাৎ আমাদের শুধু চেহারা দিয়েই একে চিনতে হবে । ভাল করে ছবি দেখতে দেখতে একটা জিনিস লক্ষ করলাম। এর ডান কানটা বাঁ কানের তুলনায় বেশ ছোট। তাছাড়া আর খানিকটা ফরসা হলেই একে ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন অ্যালিস্টার কুকের মত দেখাবে। রুপবান চেহারা।

" লোকটা কে ? সেই তৃতীয় দলের কেউ ? " , স্ক্রিন থেকে চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলাম।

প্রণয় বলল, "সম্ভবত এই আমাদের তৃতীয় দলের চাঁই। এর আসল নাম জানা যায়নি, কিন্তু অজস্র নামে কাজকারবার চালায়। মিঃ ফক্স, ডেভিল এক্স, ডিডিডি এরকম আরও অনেক। কোথায় থাকত, কি করে কেউ জানে না। "

ল্যাপটপটা নিয়ে আরও একটু বসে থাকলাম। প্রণয় কেসের ব্যাপারে যা বলেছে তা জার্নাল করা আছে। দেখতে দেখতে একবার বাইরে তাকাতে দেখি আমরা বুদ্ধমন্দিরের সামনে চলে এসেছি। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দোকানপাটগুলো সবে বন্ধ হবে হবে করছে। এই সময় ড্রাইভার পেছনে ফিরে বলল ," তেল নিতে হবে। "

প্রণয় ওকে সামনের পাম্পে দাঁড়াতে বলল। ডানদিকে রাধানগর বাস স্ট্যান্ড। যেটার ছবি মোবাইলে ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে চিন্তা করছিলাম এই কেস কোনদিকে মোড় নিতে পারে, এমন সময় চোখে পড়ল পেট্রোল পাম্পের ঢোকার মুখের সাইনবোর্ডটা। তাতে লেখা " **50 YEARS OF INDIAN OIL** "

চমকে উঠে মোবাইলটা হাতে নিলাম। একটা নোটে সঙ্কেতটা স্টোর করাই ছিল। সেটার প্রথম লাইন পড়তেই সোজা হয়ে বসলাম। প্রণয় সেটা দেখে ঝুঁকে পড়ল। বললাম ," কিছুটা পাঠোদ্ধার হয়েছে মনে হয়। B2 কি ঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু IO-RN তো ইন্ডিয়ান অয়েল রাধানগর। "

প্রণয় চমকে উঠে বলল , " ঠিক বলেছিস। ছবিটার সঙ্গে একটা যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু B2 মানে --"

ওর কথার মাঝে আমি বলে উঠলাম ," রাধানগরে তো আরেকটা পাম্প রয়েছে। সামনেই। কিন্তু তার সাথে B2 কথাটার কি সম্পর্ক ? "

" কিন্তু RN মানে রাধানগর। এটাতে বাকি যে সব লেখা আছে সবই কি কোন জায়গার নাম ? "

" নাও হতে পারে। পরের লেখাটা খুবই বড়। এটা কোন ভাবেই জায়গার নাম হবে না। "

" হুম। কিন্তু রাধানগরে কি হবে ? এখানে কি ওদের কোন ঘাঁটি আছে ? থাকলেও কোথায় ? এখানে অজস্র বাড়ি, বস্তি , হোটেল, দোকান। কোথায় খুঁজবো ? "

কথা না বলে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। তেল ভরা হয়ে গেছিল। গাড়ি চালু করে একটু এগতেই প্রণয় বলল যে ওর খিদে পেয়েছে। আমারও পেয়েছিল তবে সংকেতটার চিন্তায় ওর কথার জবাব দিলাম না।

খাওয়ার সময় এতই চিন্তায় ছিলাম যে প্রণয়ও আমায় বেশি ঘাঁটাল না। উঠে এসে গাড়িতে বসার পর প্রণয় ড্রাইভারকে বলল মোটরস্ট্যান্ডে যেতে।

হরিগঙ্গা বসাক রোড দিয়ে যখন যাচ্ছি হঠাৎ দেখলাম সামনে কামান চৌমুহনীতে সামান্য ভিড়। রাত সোয়া এগারোটায় এখানে এত লোক অস্বাভাবিক। কাছে গিয়ে বোঝা গেল বাইক দুর্ঘটনা। দুটো কমবয়সী ছেলে সামনের একটা ওয়াগন-আরকে ধাক্কা দিয়ে বাইক শুদ্ধু উলটে পড়েছে। গাড়িটাতে করেই ওদের জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

বাইকটা একপাশে পড়ে আছে। অন্যদিন হলে অনেক কিছু বলে দিতে পারতাম বাইকের বায়োডাটা ইত্যাদি। কিন্তু আজ মাথা খেলছে না। অন্যমনস্ক ভাবে বাইকের

লাইসেন্স প্লেটে চোখ রেখে ফিরছিলাম গাড়িতে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আচমকা আবার বাইকের দিকে তাকালাম। তারপর রুদ্ধশ্বাসে গাড়িতে উঠে মোবাইলটা হাতে নিলাম। প্রণয় আমাকে এমন করতে দেখে নিজেও গাড়িতে উঠল। আমি প্রায় তখনই বললাম ," রাধানগর। জলদি। "

গাড়ি যখন প্রচণ্ড বেগে রাজবাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে , আমি প্রণয়ের দিকে ফিরলাম । ও আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছিল সাঙ্ঘাতিক গণ্ডগোল।

-৫-

" **bc0d** । এইটা ভাল করে লক্ষ্য করিসনি তখন। বাইকটার লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বুঝে গেলাম। প্লেটে লেখা ছিল **TR-01 S** , তারপরই নম্বর। তার ওপর কায়দার ফন্টে লেখা ছিল **speed 4 life** । সেইটা দেখেই মনে এল , অক্ষরগুলো এক একটা সংখ্যাও তো হতে পারে। মাঝেরটা এখনও হয়নি তবে এইটা বল তো। **b c d** হল যথাক্রমে ২,৩ ও 8 নম্বর অক্ষর বা অ্যালফাবেট। ভাল করে দ্যাখ এটা **'O'** নয় **'0'** । অর্থাৎ ---"

" ২৩০৪ ! কিন্তু এই নম্বরটা কি ? গাড়ির রেজিস্ট্রেশান ? "

" আজকের তারিখ ! ২৩শে এপ্রিল। "

"সর্বনাশ। এখন কি করা ? রাধানগরে কোথায় খুঁজব ? দাঁড়া। দাদাকে ফোন করি। "

কিন্তু প্রণয় ওর দাদাকে ফোন করার আগেই ফোনটা বেজে উঠল। প্রণয় অবাক হয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ফোনটা ধরল। বুঝলাম দাদাই কথা বলছে অপর প্রান্তে।

ততক্ষনে আমরা রাধানগর পৌঁছে গেছি। বাস স্ট্যান্ডের পাশের নির্জন গলিতে দাঁড়াতে বললাম। কিছুটা এগোলেই গলিটা দু ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকেরটা কৃষ্ণনগরে উঠছে। ডান হাতের রাস্তা চলে গেছে ভাটি অভয়নগর হয়ে দূর্গা চৌমুহনী। সেই রাস্তাতেই একটা কালো স্কডা গাড়ি রাখা আছে। এছাড়া রাস্তা একেবারে নির্জন। বাস স্ট্যান্ডে আলো জ্বলছে।

আশপাশটা ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। দূরে একটা গাড়ি আসছে। রাজবাড়ির উত্তর গেটের দিক থেকে। সামনে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। এই সময় প্রণয় ফোনটা রেখে বলল ," আমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না। সামনেই হোটেল জুপিটার রয়েছে। ওখানে যেতে হবে। "

ড্রাইভার , যার নাম বিক্রম , তক্ষুনি ইঞ্জিন চালু করে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল। একটু গিয়েই রাস্তার ডানপাশে জুপিটার হোটেল। পারকিং লটে গাড়িয়ে ঢুকিয়ে ,প্রণয় ওদের নির্দেশ দিল। তারপর গাড়ি থেকে একটা বড় লাগেজ ব্যাগ নিয়ে ল্যাপটপের ব্যাগটা আমার কাছে দিয়ে রিসেপশানএর দিকে পা বাড়াল। একটা ডাবল রুম পেতে অসুবিধা হল না। চারতলায় উঠে বেয়ারাকে বিদায় করেই দুজনে কাজে লেগে গেলাম।

আমি ল্যাপটপটা চার্জে বসিয়ে অন করতে করতে প্রণয় বাকি জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে বের করল। একটা আগরতলার বড় ম্যাপ নিয়ে টেবিলে রেখে নিচে ডার্ক লাইট জ্বালিয়ে দিল। এছাড়ও ব্যাগের থেকে একটা বড় টেলিস্কোপের মত জিনিস , স্ট্যান্ড , কিছু নাইলনের দড়ি ও একটা ইনফ্রারেড নাইটভিশান চশমা বেরল। তারপর যা বের করল ও তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ।

দুটো রিভলভার। অল্প হেসে একটা আমার দিকে দিয়ে বলল ," রেখে দে। ওই প্যাকেটে দ্যাখ গুলি আছে। "

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম ," প্রণয় , আমার লাইসেন্স নেই। ত্রিপুরায় এসব ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। তুই বরং--"

ও আমায় বাধা দিয়ে বলল ," আজকের কাজ খুবই সাঙ্ঘাতিক। আত্তরক্ষার জন্যই এটা রাখা ধরে নে। আর তোর টিপ তো সাঙ্ঘাতিক ছিল। সেই যে এয়ারগান দিয়ে ২৫ ফুট দূর থেকে একটিপে বোতল ফুটো করেছিলি মনে আছে স্কুল ফেস্টে ? "

"মনে নেই আবার ! "

প্রণয় এবার হেসে আমার দিকে একটা সরু নলজাতীয় জিনিস দিল। তার একদিকে প্যাঁচ কাটা আছে। বুঝলাম সেটা সাইলেন্সার। বন্দুকটা একটা .54 BALLER। গুলি ভরে সাইলেন্সারটা বন্দুকের মুখে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিলাম যে সাঙ্ঘাতিকেরও বেশি কোন অবস্থায় না এলে ওটা বেরই করব না।

প্রণয় ততক্ষণে টেলিস্কোপটা একটা জানলার সামনে বসিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষন খুটখাট করার পর আমার দিকে ফিরে বলল "দেখে যা।"

তক্ষুনি জবাব দিলাম না কারণ ল্যাপটপে তখন প্রণয়ের দাদার একটা মেল এসেছে। তাতে একটা লিঙ্ক এবং কিছু পাসকোড দেওয়া রয়েছে। সেটা খুলতেই স্ক্রীনে লেখা ফুটে উঠল, " এই ফুটেজটা মিঃ সহায়ের বাড়ির ঠিক বাইরের করিডোরটা। ১৮ই এপ্রিল। "

ক্লিক করতেই একটা ভিডিও চলতে শুরু করল। অ্যাপার্টমেন্টের এই তলায় মোট ৬ টা ফ্ল্যাট। লেখা আসছে ওপরে যে সামনের থেকে দু নম্বর ফ্ল্যাটটাই মিঃ সহায়ের। বিভিন্ন ধরনের লোক যাচ্ছে আসছে। ওই ফ্ল্যাটেও দুএকজন ঢুকল। আস্তে আস্তে লোকজন কমে এল। তখনই একজন লোককে দেখা গেল। লম্বা চেহারা। পরনে কালো টক্সিডো। হাতে একটা ব্রিফকেস। ঢুকল ফ্ল্যাটে। যেহেতু ফাস্টফরওয়ার্ড করা আছে তাই কয়েক সেকেন্ড পরেই বের হল। কিন্তু আসলে সে প্রায় মিনিট কুড়ি মত ভেতরে ছিল। বেরিয়ে চলে যাচ্ছে তখনই আমি পজ করলাম। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লোকটার হাতে কিছুই নেই। অর্থাৎ ব্রিফকেসটা ভেতরে রেখে এসেছে। লোকটার হাঁটার ধরনটা খুব চেনা মনে হচ্ছিল।

ওপরে আবার লেখা উঠল। এ হচ্ছে রামিরেজ। ভাড়াটে খুনি বা মর্সিনারী। এর বিশেষত্ব হল ওয়ান শুটার জব। মাঝে সাঝে একটা গুলিওলা পিস্তল নিয়ে বের হয়। তাতেই কাজ হয়ে যায়।

ল্যাপটপ থেকে এবার আমি প্রণয়ের দিকে তাকালাম। বললাম ," ব্যাপারটা মনে হচ্ছে কিছুটা ধরতে পেরেছি। মিঃ সহায় রামিরেজকে কোন কারণে ভাড়া করেন। কাজ হয়ে যাওয়ার পর ১৮ তারিখে সে কোন জিনিস ওই ব্রিফকেসে সহায়কে পৌঁছে দেয় ওঁর ফ্ল্যাটে। সেই জিনিসের খোঁজেই কেউ তাকে উড়ো চিঠি লেখে এবং একটা খুন হয় ছাদে। এই খুনটা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই উনি তোর দাদার শরনাপন্ন হন। কিন্তু দাদা তোকে কেসটা দিয়ে দেওয়ায় উনি ক্ষেপে যান। কারণ ওনার প্রোটেকশান দরকার ছিল।"

প্রণয় চিন্তিত গলায় বলল ," কিন্তু চিঠিটা তো কোনো গ্যাং থেকে লেখা হয়েছিল। তারা কি করে জানবে ? "

বাধা দিয়ে বললাম ," না রে প্রণয়। ব্যাপার সেটা নয়। দুটো গ্যাংই তো ধরা পড়েছে। ওরা তো বলতো যদি চিঠিটা ওরাই পাঠাতো। তাছাড়া তুই নিজেই তো বললি এই গ্যাং দুটো

খুনোখুনি করে না। তাহলে সেই নকল গোয়েন্দা দুজনকে মারল কে ? "

প্রণয় উত্তেজিত হয়ে বলল , " নিশ্চয়ই রামিরেজ। একমাত্র ওই ---"

"হ্যাঁ। একমাত্র ওই পারে একাজ করতে। কারণ সেই দুর্মূল্য জিনিস যে সহায়ের কাছে তা শুধু ওই জানত। কিন্তু ... সে তো অনায়াসেই ব্ল্যাকমেল করতে পারত। "

তখনই বাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রচন্ড আওয়াজ করতে করতে একটা মোটরবাইক সামনের রাস্তাটা চিরে সোজা আস্তাবলের দিকে চলে গেল। কি ভেবে প্রণয় টেলিস্কোপে চোখ রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। রাতের অন্ধকারে নিস্তব্ধতা ফুঁড়ে আমদের জানলার নিচ দিয়ে গিয়ে বাস স্ট্যান্ডের পাশের পেট্রোল পাম্পে গিয়ে দাঁড়াল। এটা দ্বিতীয় পাম্প। আমরা যেটায় গিয়েছিলাম সেটা উল্টো দিকে। তখনই প্রণয় বলল , " বাইনোকুলার ! "

ইনফ্রারেড চশমাটা চোখে লাগাতেই অন্ধকার চিরে পরিস্কার দেখতে পেলাম। সবুজ ছবি হলেও , বুঝতে পারছিলাম গাড়ির দরজা এখনো বন্ধ। মিনিটখানেক পরই একটা বাইক এসে থামল। এবার গাড়ির দুদিকের দরজা খুলে গেল। দুজন লোক নেমে বাইকের অরোহীর সঙ্গে কথা বলল। এবার একজন গাড়িতে উঠে সোজা আমাদের হোটেলের পাশ দিয়ে অভয়নগরের রাস্তায় প্রচন্ড বেগে চালিয়ে নিয়ে গেল।

পাম্পে লোক দুটো তখনও কথা বলছে। একটু জুম করতেই দেখতে পেলাম বাইক চালক যে একবারও বাইক থেকে নামেনি তার হাতে একটা চ্যাপ্টা মতন বাক্স। ইনফ্রারেডেও বোঝা যাচ্ছিল না তাতে কি থাকতে পারে। অন্য লোকটা এবার মোবাইল বের করে দেখে কিছু বলল। জবাব শুনে অন্য লোকটা বাইক নিয়ে চলে গেল। আর এই লোকটা হাঁটতে শুরু করল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল না ও কোথায় যাচ্ছে। একটা মোড় ঘুরতেই আর দেখতে পেলাম না। চোখ ফিরিয়ে প্রণয়ের দিকে তাকাতেই ও মাথা নাড়ল। বুঝলাম কথা থেকে এবার কাজে নামতে হবে।

দরজা বন্ধ করে আমরা যখন নিচে নামলাম তখন ঘড়ি বলছে রাত সাড়ে বারোটা বাজে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। হোটেলের ভেতর দিয়েই আমরা পার্কিং লটে ঢুকলাম। গার্ড দুজন গাড়ির মধ্যেই বসে আছে সতর্ক চোখে। আমাদের দেখে ইশারা করল। প্রণয় ওদের ওখানেই থাকতে বলে ধিরেসুস্থে বাইরে পা বাড়াল।

এতক্ষন গাড়ির মধ্যেই ছিলাম। দুজন জাঁদরেল বন্দুকধারীর সাথে। কিন্তু এখন একটা গা ছমছমে ভাব আসছিল। আড়চোখে প্রণয়ের দিকে তাকাতেই ও আমায় বলল সোজা যেতে। সামনে বড় রাস্তা। গাড়িঘোড়া নেই কিন্তু রাস্তার আলোয় দূর থেকে বোঝা যাবে যদি কেউ রাস্তা পার হতে যায়। তাই প্রণয় আর আমি কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে সন্তর্পনে রাস্তা পার হলাম। ওপারে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেই গলিটার মুখে দাঁড়ালাম। এই অবধি লোকটাকে শেষ দেখা গিয়েছিল।

সন্দেহের কোন কারণ নেই কিন্তু এছাড়া এগোনোর মত আর কিছু হাতেও নেই। তাছাড়া গোয়েন্দা কাহিনীতেই তো থাকে , ' যেখানে দেখিবে ছাই , উড়াইয়া দেখ তাই , পাইলেও পাইতে পারো অমুল্য রতন '... ইত্যাদি।

জায়গাটা একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখ সয়ে যেতেই দেখতে পেলাম ডানদিকে একটা দোতলা বাড়ি। বাকি রাস্তাটা সোজা চলে গিয়ে হাওড়া নদির পাড়ে গিয়ে থেমেছে। এছাড়া আর কোনো বাড়িঘর এদিকে নেই। ইনফ্রারেড ভিশনে বাড়িটা দেখতে দেখতে মনে হল , অন্যদিকে কিছু একটা হচ্ছে।

আমি আর প্রণয় তখন উলটোদিকে একটা গাছের ডালের স্তূপের পেছনে লুকিয়ে। চোখ থেকে ওটা নামিয়ে আমি দাঁতে দাঁত চিপে বললাম, " ঢুকবি ? "

ও আমায় অবাক করে বলল , " চল " ।

টানটান উত্তেজনা তখন আমায় পেয়ে বসেছে। বাইনকুলারটা কার্গোর পকেটে রেখে রিভলভারটা বের করে নিলাম। সেফটি ক্যাচটাতে একটা ছোট্ট চাকতি। ঘুরিয়ে হাতে নিতেই একটা জোর এল গায়ে।

প্রণয় আমায় জিজ্ঞেস করল গার্ডদের আনতে হবে কি না। আমি বললাম , "

আশেপাশে বাড়ি নেই। লোকটা এতেই ঢুকেছে। তাই এখানে দলবল থাকতে পারে। একা যাওয়টা রিস্কি হয়ে যাবে। "

প্রণয় সায় দিয়ে মোবাইলে ওদের ফোন করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করল। আমি প্রখর দৃষ্টিতে আশপাশ দেখে নিচ্ছিলাম। কিন্তু মিনিট দুয়েক পর ও অবাক হয়ে ফোন কেটে বলল, " আশ্চর্য ! দুজনেই ফোন বন্ধ করে রেখেছে। "

" ওয়াকি টকি নেই ? "

"না !"

চিন্তিত হয়ে গেলাম। এখান থেকে হোটেলের কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে প্রণয় বলল, " চল দেখি ওখানে কি আছে। "

ধিরেসুস্থে দুজনে বাড়িটার দিকে এগোলাম। হাতে রিভলভার শক্ত করে ধরা। প্রণয় আমার পেছনে আসছিল। বাড়িটার সামনেই একটা ছোট গেট। ভাঙ্গাচোরা হলেও এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষন ঠায় দাড়িঁয়ে থেকে আস্তে করে গেটের একটা পাল্লা ঠেললাম।

বাড়িটা অনেক পুরনো। এককালে কেউ শখে বানিয়েছিল। এখন হয় মর্টগেজ হয়ে আছে নাহলে মালিক হাল ছেড়ে দিয়েছে। সামনের দরজাটা খোলাই ছিল। ঢুকে একটা ছোট ঘর। বাঁ দিকের একটা ঘরের থেকে আবছা আলো আসছে। তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে এই ঘরে তেমন কিছু নেই। যত রাজ্যের আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ডানদিকেও একটা দরজা। তবে সেদিকে কোন আলো নেই।

আবর্জনা এড়িয়ে বাঁদিকের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। আলোটা সম্ভবত ফ্লুরোসেন্ট বাতির। কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। এমন সময় একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। আওয়াজটা আমার ডানদিক অর্থাৎ দরজাটার পাশ থেকে আসছে।

বিদ্যুৎবেগে পেছনে সরতেই একটা লোক দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে এল। ওখানে সম্ভবত আরেকটা দরজা আছে। সে বাঁ দিকের ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। তারপর বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে ওইদিকে যেতে শুরু করল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সামনে দিয়েই যাবে লোকটা। কিন্তু তার আগেই প্রণয় পায়ে কিছুর ঠোক্কর খেল। লোকটা হকচকিয়ে তাকাতেই আমি সময় নষ্ট না করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে ডান কনুই ঘাড়ে চালিয়ে

দিলাম। একই সাথে ওই হাতে ধরে থাকা রিভলভারের গুলিও ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ছাদে লাগল। সাইলেন্সার লাগানোয় শব্দটা একটা হাততালির মত শোনাল।

প্রণয় এর মধ্যেই ছুটে ওই ঘরে ঢুকে গেছে। লোকটাকে মাটিতে ফেলে আমিও ঢুকলাম। একটাই লোক ছিল। সে পিস্তল তুলতেই আমি ওর হাত লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। পিস্তলটা ছিটকে পড়ল ঘরের কোনে আর লোকটা কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে বসে পড়ল। এর মধ্যেও মনে সান্তনা এল যে আমার টিপ এখনও দুর্ধর্ষ রয়েছে।

তখনই বাইকের আওয়াজ কানে এল। চকিতে ডানদিকে তাকাতেই দেখলাম সেখানে একটা জানলা রয়েছে।

"প্রণয়। এদের ধরে রাখ। " , বলে জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তায় নামলাম। চতুর্দিক অন্ধকার। এর মধ্যে আওয়াজটা কোনদিক থেকে এল ঠাওরাতে পারছিলাম না। একটু এগতেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে উঠল। কানে একটা মৃদু আওয়াজ আসতেই কিছু না ভেবে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কয়েক সেকেন্ড পরেই পাশ দিয়ে হুস করে বাইকটা বেরিয়ে গেল।

অন্ধকারে শুয়েই আন্দাজে গুলি চালালাম। কিন্তু ততক্ষনে মোড় ঘুরে বাইক প্রচণ্ড বেগে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামান্য চোট লেগেছিল। তা ভুলে গিয়ে বাইকটা যেদিকে গেল সেদিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু কোথাও কিছুই নেই। অগত্যা ফের বাড়িটাতে ঢুকে সেই ঘরটায় গেলাম। প্রণয় তখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। অন্য লোকটা মাটিতে পড়ে আছে। সামান্য নাড়াচাড়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে এখনও জ্ঞান হারায়নি। ওকে এক বার দেখে নিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। এখানেও লোকটা মাটিতে পড়ে আছে তবে অজ্ঞান। ও যেই ঘর থেকে বেরিয়েছিল এবার সেদিকে গেলাম। দরজা ভেজানোই ছিল। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বেরিয়ে এসে প্রণয়কে বললাম , " ওই ঘরটা দেখতে হচ্ছে। ভেতরে মনে হচ্ছে কিছু রয়েছে। "

যে লোকটা হাতে গুলি খেয়েছিল সে ততক্ষনে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরই জামাটা ছিঁড়ে সেটা দিয়ে ওর হাত-পা বেঁধে লাইটটা তুলে নিয়ে আমরা দুজনে পাশের ঘরটায় ঢুকলাম। ভেতরের অন্ধকারটায় আলো ছড়িয়ে যেতেই দেখতে পেলাম একপাশে কেউ একজন পড়ে রয়েছে। প্রথমে মৃতদেহ মনে হলেও কাছে যেতেই দেখলাম হাত পেছনে বাঁধা রয়েছে।

প্রণয়ের হাতে লাইটটা ধরা। তাই আমিই গিয়ে বাঁধন খুলে দিলাম। তারপর মুখ এদিকে ফেরাতেই ও চেঁচিয়ে উঠল , " একি ,এ যে মিঃ সহায় !"

-৭-

ঝটকাটা সামলে আমি ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললাম , " সহায় ? ধিরেন্দ্রনাথ সহায় ? তোর মক্কেল ? "

প্রণয় ততক্ষনে হাঁটু গেড়ে বসে ভদ্রলোককে পরিক্ষা করছে। মুখ না তুলেই একটা সম্মতিসুচক মন্তব্য ছুঁড়ে দিল। আমিও পাশে বসে বললাম , " অজ্ঞান ? "

ও মাথা নাড়ল। হঠাৎ কি মনে হতেই ছুটে ঘরের বাইরে এলাম। না। লোকদুটো এখনও যেখানে পড়ে ছিল সেখানেই রয়েছে। এই ঘরে আবার উঁকি দিতেই ও আমায় বলল , " কি কান্ড দ্যাখ তো। এখন কি করি ? "

রিভলভারটা হাতে শক্ত করে ধরে বললাম," চল। আগে এঁকে এখান থেকে বের করে হোটেলে নিয়ে যাই। "

বলে আমি আবার বাইরে এলাম। একদম উলটো দিকে যে দরজাটা রয়েছে সেটা বন্ধ ছিল আগেই দেখেছিলাম। লাইটটা তুলে সেদিকে যেতেই বুঝলাম ও দিকটায় এদের পদধুলি পড়েনি। ফিরে এসে লোক দুটোকে বাঁধা অবস্থায় ঘরের এক কোনে রেখে বললাম, " থাকুক এভাবে পড়ে। এরা নিতান্তই চুনোপুঁটি। আর যা অবস্থা , এদের থেকে এখন কোন কথাই বার করা যাবে না। "

প্রণয় ততক্ষণে এ ঘরে এসে লোকদুটোকে তল্লাশি করতে লাগল। আমি ঘরের আশেপাশে সতর্ক চোখে খুঁজতে লাগলাম। প্রথমে কিছুই তেমন দেখতে পাইনি। তবে কিছুক্ষন পরে কয়েকটা জিনিস হাতে এল। একটা ছোট প্লাস্টিকের টুকরো , একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি , একটা তাস - হরতনের দুই , একটা মোমবাতির অর্ধেক আর একটা কাগজের টুকরো। উলটে দেখলাম যে সেটা একটা হোটেলের কার্ড। নেতাজি চৌমুহনীর প্রিন্স হোটেল।

প্রণয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল , " তেমন কিছুই নেই। কিছু টাকা পয়সা আর খৈনি, বিড়ি এইসব। একজনের কাছে অবশ্য এই ছুরিটা ছিল। "

আমি ওকে জিনিসগুলো দেখালাম। ও একটু দেখে নেড়েচড়ে বলল , " এগুলো তো জঞ্জাল। কি বুঝব ? "

গম্ভীর হয়ে বললাম , " অনেক কিছু বোঝার ছিল হে ওয়াটসন ! সব জিনিসই তোমার কাছে সাধারণ মনে হয়। আমি বিশ্লেষণ করতেই তা অসাধারণ হয় এবং তারপর ব্যাপারটা খুবই সোজা লাগে। "

ঘাবড়ে গিয়ে ও বলল , " কি ব্যাপার বল তো ? এই সময় শার্লক হোমস কেন ?

" ভাল করে দ্যাখ। এগুলোই আমাদের এই কেসে এগোতে সাহায্য করবে। "

কিছুক্ষন দেখে ও বলল , " প্লাস্টিকটা তো কোন সিম কার্ডের অংশ। দেশলাই কাঠি দিয়ে মোমবাতি ধরানো হয়েছিল। আর এই লোকটা একা একা বসে পেশেন্স খেলছিল। তখন একটা তাস আলাদা হয়ে যায়। আর হোটেলের কার্ডটা হয়তো এরাই কেউ এনেছিল। বাইরের লোক কেউ থেকেছিল হয়ত। "

" বাঃ। দারুন বললি তো। একটু দেখলেই অনেক কিছু বোঝা যায়।তবে..."

" তাহলে বল আমার অবসার্ভেশান একদম ফাটাফাটি ? "

" আমায় শেষ করতে দে। একটু দেখলে অনেক কিছুই বোঝা যায়। কিন্তু তারপর আরও ভাল করে দেখলে আসল ব্যাপারটা ফুটে ওঠে। তুই যা বললি তা কিছুই মেলেনি। "

বলে আমি হাতের জিনিসগুলো দেখালাম। তারপর বললাম , " এই যে প্লাস্টিকের টুকরোটা। এটা যে সিম কার্ডের তা বললি , কিন্তু এটা বললি না যে সিমটাকে কেও কাঁচি দিয়ে কেটেছিল। অর্থাৎ প্রমান নষ্ট করা। তাসটা দেখে লক্ষই করলি না যে এটা হরতনের দুই। অর্থাৎ 2 of hearts। কল ব্রে খেলায় যখন তিনজন থাকে তখন এই তাসটাই সাধারণত বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে তিনজন লোক ছিল। আর আলোর জন্য মোমবাতি জ্বালাবে কেন ? এই লাইটটাই তো ছিল। তার মানে এই যে মোমবাতি দিয়ে এরা কিছু পুড়িয়েছিল। সম্ভবত কোন কাগজ। হ্যাঁ , লোকটা যে পেশেন্স খেলছিল না তার প্রমাণ আছে। তাসের ডেকটা কোথায় ? একজন খেলছিল তাস আর একজন নিয়ে গেল সেটা ? অর্থাৎ যে অন্য লোকটা

ছিল তার তাসের নেশা , এবং এত রাতে অন্য কোথাও তাস পাবে না দেখে ওটাই নিয়ে গেল। যে লোকটাকে আমরা আসতে দেখলাম , সে আসায় খেলায় বাধা পড়ে আর ওরা দুজন বাইকে চম্পট দেয়। "

একটানা অনেকটা বলে একটু থামলাম। প্রণয় একমনে শুনছিল। এবার আমার পিঠ চাপড়ে বলল , "সাবাস বস। দারুন "

" আরও আছে। যে কাগজটা পুড়িয়েছে সেটার ছাইগুলো কই ? নিশ্চয়ই সেটাও লোপাট করে দিয়েছে প্রমাণ নষ্ট করতে। আর এই কার্ডটা ... কেন জানি মনে হচ্ছে এটায় আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ... ।"

প্রণয় অবাক হয়ে বলল, " এরা কারা ? কি মতলব ? আর ২৩ তারিখ তো শেষ হয়ে গেছে। কিছু তো তেমন হল না। "

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম , " কিছু তো হবেই। না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। "

" যাকগে। চল মিঃ সহায়কে হোটেলে নিয়ে যাই। ভদ্রলোককে এতক্ষন এখানে রাখা ঠিক হচ্ছে না। "

মিঃ সহায়কে কাঁধে তুলে প্রণয় বহু কষ্টে হাঁটছিল। আমি রিভলভার হাতে একহাতে সন্তর্পনে এগচ্ছিলাম। লোকদুটোকে ওখানেই রেখে লাইটটা বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলাম। যে ছুরিটা পাওয়া গেছিল সেটা আর হোটেলের কার্ডটা সঙ্গে রেখেছিলাম। রাস্তাটা ফাঁকা দেখে আমরা ধিরে সুস্থে অন্য প্রান্তে গেলাম। হোটেলে আলো জ্বলছে ভালই। প্রণয়কে ইশারা করতেই ও মিঃ সহায়কে নিয়ে পার্কিং লটের মধ্যে ঢুকল। আমি চতুর্দিক ভাল করে দেখে নিয়ে ভেতরে পা বাড়াতেই চমকে গেলাম। আমাদের গাড়িটা যেখানে রাখা ছিল সেখানটা ফাঁকা।

প্রণয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দৌড়ে আবার বাইরে গেলাম। কোথাও কেউ নেই। এই সময় প্রণয় আমায় ডাকল। ভেতরে আসতেই দেখি যে আর একটা গাড়ির পেছনে আমাদের একজন গার্ড পড়ে আছে।

ভাল করে কাছে যাওয়ার আগেই প্রচন্ড আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে বাঁ দিকে ঝাঁপ দেওয়ায় ধাক্কা খেলাম না। রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে গেল। ওটা তুলতে না

তুলতেই দেখলাম আমাদের স্করপিওটা প্রচণ্ড বেগে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবং এত দূর থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তাতে বসে ছিল ড্রাইভার বিক্রম।

-৮-

কিছুক্ষন আগে যেখানটায় চোট পেয়েছিলাম সেখানেই আবার ব্যাথা পেলাম। একহাতে রিভলভার নিয়ে অন্য হাত দিয়ে সেখানটা চেপে ধরে অবাক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ঘটনাগুলো এতই তালগোল পাকিয়ে গেছে যে কিছুই বোধ্যগম্য হচ্ছিল না। প্রণয় ততক্ষণে মিঃ সহায়কে মাটিতে শুইয়ে অন্য গার্ড যার নাম মহিম তাকে দেখছিল।

কাছে এসে বললাম , " শ্বাস পরছে ? "

" হ্যাঁ। মাথার পেছনে ব্লান্ট কোন অস্ত্র দিয়ে মেরেছে। স্কালে লাগেনি। ঘাড়ের পাশে। অজ্ঞান। ঘন্টা কয়েকের আগে উঠবে না। "

হাতের চোটটা যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তাকিয়ে দেখলাম খানিকটা ছড়ে গেছে। আর তাই অল্প রক্তও বেরচ্ছে। একপাশটা ফুলে গেছে। সেখানটায় চাপ দিতেই শরীরটা ঝিনঝিন করে উঠল। ভয় পেলেও তারপর মনে হল হাত তো ভাঁজ করতে পারছি। তাহলে ভাঙ্গেনি।

" কিন্তু বিক্রম গাড়ি নিয়ে পালাল কেন ? " , প্রণয় জিজ্ঞেস করল।

" বুঝতে পারছি না। অবশ্যই ওই দলের কেউ হবে। ওকে কোথা থেকে পেলি ? "

" এখানেই। দাদা আগের থেকে খবর পাঠিয়েছিল এখানকার দফতরে। "

" কিন্তু... " কথাটা শেষ করলাম না।

প্রণয় আমার এই স্বভাব ভাল করেই জানে। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে বলল,"কি ? "

" ব্যাপার হচ্ছে একজন যদি নকল হত , তাহলে অন্যজন কি ওকে চিনতে পারত না ? উঁহু। হয় দুজনই এক দলের অথবা ... ", কথাটা শেষ করলাম না। রিভলভারটা পকেটে গুঁজে

বললাম , " চল। পুলিশে খবর দিই। "

" কিন্তু তাতে আমাদের কেসের গড়বড় হয়ে যাবে। "

" তাহলে লোকদুটো এমনি পড়ে থাকবে ? ওপরে চল। আমার কাছে অন্য বুদ্ধি আছে। "

কষ্টেসৃষ্টে দুজনকে ওপরে নিয়ে গেলাম। দুটো খাটে দুজনকে শুইয়ে দাওয়া হল। দেখলাম ঘন্টা পাঁচেকের আগে কারও জ্ঞান ফিরবে না। প্রণয় ঝটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। ওর দাদাকে ফোন করে ব্যাপারটা সংক্ষেপে গুছিয়ে বলে দিল। দাদা এখানের পুলিশকে বলে দেবে এই হোটেলে আসতে।

ইনফ্রারেড বাইনোকুলার দিয়ে আগের জানলা দিয়েই বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। মনের মধ্যে একটা জিনিস খচখচ করছিল। ভাবতে ভাবতে দেখলাম পাশের রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক আসছে। সেই পাম্পটায় দাঁড়াল যেটায় আমরা সন্ধেবেলা গেছিলাম। ট্রাকের ড্রাইভার নেমে গিয়ে চাকার হাওয়া পরিক্ষা করছিল। এমন সময় পাম্পের একজন কর্মচারি এসে তার হাতে একটা ব্যাগ দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ব্যাপারটা খেলে গেল।

প্রণয় ল্যাপটপ বাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। দৌড়ে গিয়ে সেটাকে বের করে চালু করলাম। হঠাৎ এই কীর্তি দেখে ও কিছু বলতে যাচ্ছিল , কিন্তু আমি হাত তুলে বাধা দিলাম। চালু হতেই সেই ভিডিওটা খুললাম যাতে দেখা যাচ্ছে যে রামিরেজ নামক লোকটা সহায়ের ফ্ল্যাটে একটা ব্রিফকেস রেখে বের হচ্ছে। ওই জায়গাটা আসতেই আমি ভিডিওটা স্লো করে দিলাম। ওর হাঁটার কায়দা প্রথমবারেই খুব চেনা চেনা লাগছিল। এবার বুঝতে পারলাম।

কিন্তু প্রণয়কে কিছু বলার আগেই বাইরে পুলিশের গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সাইরেন বাজিয়ে একটা কোয়ালিস এসে হোটেলের নিচে থামল। আগেই ল্যাপটপটা ভাঁজ করে নিয়েছিলাম। দ্রুতগতিতে দুজনে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দরজায় তালা মারার ঝামেলা নিলাম না। কারণ এমনিতেই ওরা দরজা ভাঙবে। তাছাড়া আঙুলের ছাপও পড়ে যাবে। ঘরের চতুর্দিকে ছাপ ওঠানোর জন্য একটা সলিউশান ছিটিয়ে এসেছিলাম।

সামনের সিঁড়ি দিয়েই আসবে , তাই আমরা পেছনের দিকে ছুটতে লাগলাম। ডানদিকেই একটা বড় দরজা। সেটা খুলতেই দেখলাম আমরা খাওয়ার হলে এসে পড়েছি। উলটোদিকের দরজা একটা খোলা। সেখান দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। সেদিকে যেতেই পেছনে

পায়ের আওয়াজ পেলাম৷ অর্থাৎ কেউ এদিকেই আসছে। দরজাটা পার হতেই ওদিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

এইসময় আমার হাত থেকে ল্যাপটপটা ছিটকে পড়ল। তুলতে যতক্ষণ লাগবে তার মধ্যে ওদিকের লোকটা এসে পরবে। দরজাটা খুলতেই আমি প্রচন্ড দম নিয়ে সিঁড়ির কোনে ঝাঁপ দিলাম। ওপর থেকে ক্রমাগত গুলি আসছে। সম্ভবত LMG। হঠাৎই মনে হল আমার পকেটের রিভলভারটার কথা। ওপরের লোকটা নিচে নামতে নামতেই একসাথে দুটো কাজ করে ফেললাম। পা দিয়ে ল্যাপটপটা জোরে নিচের দিকে ঠেলে দিতে দিতে ওপরের দিকে দুটো গুলি চালালাম। ওপরের লোকটা একটু থমকাল বোধহয়। সেই সুযোগেই প্রায় শোয়া অবস্থাতেও গড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলাম। বাঁকটা তে ল্যাপটপটা পড়ে ছিল। তুলে নিয়ে দুড়দাড় করে নিচে নেমে গেলাম। পেছনে আবার গুলির শব্দ হচ্ছিল। প্রণয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমি ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই নিচে নামালাম। আর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখলাম সামনের দরজাটা বন্ধ। পেছনের পায়ের শব্দ তখন কাছে চলে এসেছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রণয়কে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর হাঁটু গেড়ে বসতেই বুঝতে পারলাম লোকটা সিঁড়ির বাঁকে এসে গেছে। আমাদের পায়ের শব্দ না পেলে এদিকে আসবে না। মরিয়া হয়ে ওই অবস্থাতেই পেছনের পা দিয়ে জোরে ধাক্কা দিলাম দরজাটায়। সেই আওয়াজ পেয়ে লোকটা দ্রুতগতিতে নেমে আসতেই রিভলভার চালালাম। ঠিক একই সময় প্রণয়ও গুলি চালিয়ে দিল। ওরও খেয়ালে এসেছিল যে এ পুলিশ নয়। পুলিশরা অকারনে LMG নিয়ে ঘোরে না। বিনা বাক্যবায়ে গুলিও চালায় না।

লোকটার হাতের অস্ত্রটা ছিটকে পড়েছে। একটাই গুলি ওর কাঁধে লেগেছিল। চিৎকার করার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে ওর চোয়ালে একটা লাথি কষালাম। মুখের থেকে রক্ত পরছে। লোকটা কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর বন্দুকটা নিয়ে দূরে ঠেলে দিলাম। তারপর দরজার তালা লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। দুটো গুলিতেই তালাটা ভেঙ্গে গেল। বেরিয়ে এসে দেখলাম আমরা পেছনের বারান্দায় এসে গেছি। রেলিং টপকে দুজনে বাঁদিক দিয়ে হোটেলের সামনে এসে পরলাম। সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটা পুলিশের জিপ এসে থামল। ভেতর থেকে দুজন পুলিশ নেমে খুব অবাক চোখে কোয়ালিসটাকে দেখে ভেতরে চলে গেল। প্রণয়ের দিকের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে আমরা দুজনে বাঁদিকে হাঁটতে থাকালাম। ক্রমশ আমরা পেট্রোল পাম্পের কাছে এসে পরলাম। হাতের যন্ত্রণা তখন একদম

তুঙ্গে। ডান হাতে কোন মতে রিভলভারটা ধরে দাঁতে দাঁত চিপে হাঁটছিলাম। একটা ইন্ডিকা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে পাম্পে ঢুকল তেল নিতে।

প্রণয় মোবাইলে কিছু দেখছিল। বলল , " এক্ষনই বাধারঘাটের কাছে যেতে হবে। দাদা লিখেছে ওখানে আমাদের একজন হেল্প করবে। "

ঘড়ি বলছে এখন রাত সোয়া দুটো। বাধারঘাট এখান থেকে বহু দূর। ভাবতে না ভাবতেই দেখলাম ইন্ডিকাটা এদিকেই আসছে। কোথা থেকে বুদ্ধি এল কে জানে, ল্যাপটপটা প্রণয়ের হাতে দিয়ে রিভলভারটা উঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম। পাম্প থেকে বড় রাস্তায় উঠতেই আমি সামনে এসে দাঁড়ালাম। এতই নাটকীয় যে মনে মনে হাসি পাচ্ছিল। ড্রাইভার বুঝতে পারছিল না কি করবে। ওর দরজায় আওয়াজ করতেই কাঁচ নামাল। টেনে টেনে বললাম , " আউট অফ দ্য কার। নাউ ! "

কমবয়েসি ছেলে। ভয় পেয়ে বেরল। রিভলভার তাগ করে বললাম , " নাউ রান। অ্যাস ফাস্ট অ্যাস ইউ ক্যান। "

ছেলেটা দৌড়তেই আমি আর প্রণয় গাড়িতে উঠে পড়লাম। স্টার্ট দিয়েই ও প্রচন্ড বেগে চালাতে শুরু করল। ফাঁকা রাস্তা। পাশে বসে আমি হাঁপাচ্ছিলাম। একটা জলের বোতল ছিল গাড়িতে। জল খেয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। তখনই প্রণয় বলল , " মনে হচ্ছে অনেক কিছুই ধরে ফেলেছিস " ।

-৯-

আস্তাবলের ব্রিজে ওঠার পর দূরে রাজবাড়ির চুড়োটা দেখা যাচ্ছিল। প্রণয় সোজা রাস্তা ধরে উত্তর গেটের ভেতর দিয়ে টাউন হলের রাস্তা নিল। সোজা গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ন বাড়ি রোড হয়ে কামান চৌমুহনীতে উঠবে। তারপর সেন্ট্রাল রোড ধরবে।

আগরতলার রাস্তা এত ফাঁকা কোনদিন দেখিনি। টাউন হলে আজ বোধহয় কোন

অনুষ্ঠান ছিল। অজস্র পোস্টার। সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম এমন সময় প্রণয় আবার জিজ্ঞেস করল , " বললি না কি বুঝতে পারছিস ? "

ল্যাপটপটা খুললাম। এতক্ষন এর ওপর যা অত্যাচার হয়েছে সে তুলনায় বাইরের ঢাকনার ওপর খানকতক ঘষা বাদে আর কিছুই চোখে পড়ল না। রামিরেজের ভিডিওটা চালালাম। তারপর বললাম , " এর হাঁটাটা দেখে আমার খুব চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু বুঝলাম তখন যখন আমরা পার্কিং লটে ছিলাম। বিক্রম অর্থাৎ যে গাড়িটা চুরি করল সেই হচ্ছে রামিরেজ। একই রকম হাঁটার পদ্ধতি দুজনের। "

প্রণয় চমকে গিয়ে বলল , " ওই রামিরেজ ? কিন্তু কিন্তু ... "

" কিন্তু আমরা যখন ওদের ঠেকে গেলাম , ও বিপদের আঁচ পেয়ে ওখানে আগেই ফোন করে দেয়। তারপর মহিমকে অজ্ঞান করে গাড়ি নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু যেহেতু সহায়কে ওরা নিয়ে যেতে পারেনি তাই রামিরেজ আমাদের ওখানেই মারেনি। সেইজন্য পরে একজন বা দুজনকে পাঠায় আমাদের শেষ করতে। প্ল্যান ছিল যে পুলিশ সেজে আমাদের ঘরে এসে সমস্ত প্রমাণ লোপাট করতে। "

" কিন্তু রামিরেজের চেহারা তো অন্য। ও বিক্রম নামক লোকটার চেহারা নিয়ে কি করে ..."

" একদম। ও বিক্রম নামের গার্ডকে গুমখুন করে ওর চেহারার মুখোশ লাগিয়ে এসেছিল। নাহলে মহিম ওকে দেখলেই বলতে পারত যে ও বিক্রম না। "

বলে অন্যমনস্ক ভাবে কীবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বললাম , " তোর রাইট শিফট বোতামটা একটু চটে গেছে। যদিও তেমন ..." বলতে বলতে চমকে উঠলাম। মোবাইলটা বের করে সেই মেসেজটা খুললাম। একটু পরেই উত্তেজিত।

প্রণয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম , " GNSDK। এক ঘর করে ডানদিকে সরালেই অর্থাৎ রাইট শিফট করলেই সেটা হয়ে যাচ্ছে ..."

" HOTEL। " প্রায় চেচিয়ে উঠল ও। " আর সামনে তো একটা P ছিল। অর্থাৎ..."

" PRINCE HOTEL। সেই কার্ডটা পেলাম যে মনে আছে ? "

" অবশ্যই। কিন্তু সেটা তো নেতাজি চৌমুহনীতে। "

গাড়ি তখন মেলারমাঠের রাস্তায়। প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে প্রণয় ইন্ডিকাটাকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে ফেলল। তারপর চলতে শুরু করল নেতাজি চৌমুহনির দিকে। এই সময় আমার মিঃ সহায় ও গার্ড মহিমের কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছিল। কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে দেখলাম লোডারটা পেছনে চলে এসেছে। গুলি শেষ। প্রণয়ের ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করলাম। একটা একটা করে বুলেট ভরতে ভরতে ভাবছিলাম এত সাঙ্ঘাতিক কখনো সাহিত্যের বাইরে দেখেছি কিনা ?

অনেক ভেবেও মনে পড়ল না।

-১০-

নেতাজি চৌমুহনীতে যখন পৌঁছিলাম তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামল। প্রণয় একপাশে গাড়ি থামিয়ে বলল , " হোটেলটা কোনদিকে ? "

আমি এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছিলাম। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ছিল না। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছিল। একপাশে কিছু কুকুর শুয়ে। দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ। একদিকে দুএকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে।

আমি ল্যাপটপে ম্যাপ দেখছিলাম। গুগ্‌ল্ আর্থে তেমন ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। প্রিন্স হোটেল খুঁজে পেলাম না। কি মনে হতে প্রণয় গাড়ি পিছিয়ে নিল। সামনে একটা ফাঁকা মাঠ। তার পাশের গলিতে গাড়ি রেখে বেরলাম। বৃষ্টি ভালই নেমেছিল। ল্যাপটপ আর ব্যাগ গাড়িতেই রেখে প্রণয় তালা দিয়ে দিল। কিছুক্ষন অন্ধকারে চোখ সইতেই দুজনে এগতে থাকলাম।

সোজা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শেষ মাথায় পৌঁছেও সন্ধান পেলাম না। অগত্যা আবার ফিরতে লাগলাম। যখন RCC মাঠের কাছে পৌঁছেছি হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকাল। আর তখনই বাঁ

দিকের গলিতে চোখ পরতেই , থমকে গেলাম। প্রণয় এগিয়ে গেছিল। দৌড়ে গিয়ে ওকে থামালাম।

" কি হল ? "

" গলিটায় চল ! ", বলেই প্রায় ওকে টেনে নিয়ে এলাম।

গলিটা বেশি বড় না। তবে বেশ চওড়া। একদিকে কয়েকটা একতলা বাড়ি। অন্যপাশে একটা চারতলা বাড়ি। কয়েকটা ঘরে আলো জ্বলছে।

উত্তেজিত হয়ে বললাম , " সম্ভবত এটাই প্রিন্স হোটেল। নিচে যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে , সেটাকেই আমি পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাছাড়া আমরা যখন হোটেলে ঢুকব তখন এটা ভাটি অভয়নগরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। কালো স্কোডা অক্টেভিয়া। "

প্রণয় আমার কথা শুনে একবার বাড়িটার দিকে তাকাল। তারপর চারতলার একটা ঘরের দিকে ইশারা করল। দেখলাম দুজন লোকের অয়বব বোঝা যাচ্ছিল। আমি ওর দিকে মাথা নাড়তেই দুজনে সদর দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগোলাম।

ওপরের সাইনবোর্ডটা নজরে এল। লেখা **HOTEL PRINCE !** সদর দরজা বন্ধ। সেটা অবশ্য আশা করেছিলাম। প্রণয়কে চতুর্দিকে নজর রাখতে বলে পকেট থেকে সুইস নাইফটা বের করলাম। বাড়ি থেকে বের হবার আগে এটা পকেটে রেখেছিলাম। এখন কাজে লেগে গেল। একটু চেষ্টা করতেই তালাটা খুলে গেল। দরজাটা আলতো করে খুলে দেখলাম কেও নেই।

দুজনে ঢুকলাম। প্রণয় দরজাটা আস্তে করে ভেজিয়ে দিল। রিসেপশান ফাঁকা। একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। বাঁ দিকে কিছু ঘর। ছোট্ট দু-তিনটে আলো জ্বলছে। ডান দিকে তাকাতেই দেখলাম , সেখানে চাবির বোর্ড ঝোলানো রয়েছে। প্রত্যেক তলার এক একটা সারীতে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মত মাথায় একটা জিনিস খেলে গেল।

" ওপরে চল। চারতলায় ! " , বলে সিঁড়িতে উঠতে শুরু করলাম। প্রণয় ভাব্যাচ্যাকা খেলেও তারপর আমার পিছু পিছু উঠতে উঠতে বলল, " কি করে বুঝলি। সব তলাতেই তো কোন না কোন বোর্ডার রয়েছে। চাবি দেখে তো তাই মনে হল। "

তখন দোতলা থেকে তিনতলায় যাচ্ছি , তারই মধ্যে বললাম , " সঙ্কেতটা ... **P** তার

আগে 4 ছিল। "

" কিন্তু কোন রুমে ? " ও জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দেওয়ার আগেই গুলির আওয়াজ ভেসে এল। তারপরই একটা আর্তনাদ। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল যে ওপরের থেকেই আওয়াজটা এসেছে।

আমার মনে যে কথাটা এল , সেটাই প্রণয় বলে উঠল , " তাহলে -M হচ্ছে **MURDER!"**

-১১-

গুলির আওয়াজ নিস্তব্ধতা ভেঙে ছড়িয়ে গেল। তারপরই একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতেই দেখতে পেলাম , সামনের একটা দরজা খোলা । অপরদিকের একটা দরজা দিয়ে কেউ একজন দ্রুত বেরিয়ে গেল।

প্রণয়কে দাঁড়াতে বলে আমি দ্রুতবেগে ছুটে গেলাম দরজাটার দিকে। খুলতেই বুঝলাম সেটা ফায়ার এস্কেপ। আশ্চর্যের ব্যাপার যে যাকে বের হতে দেখলাম , সে কোথাও নেই। লোহার খাপ কাটা সিঁড়ি। নিচ অবধি ভালই দেখা যাচ্ছিল। একটু এগিয়ে দেখতে যেতেই হঠাৎ সামান্য নড়াচড়ার শব্দ পেলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিঠে আঘাত লাগল। ঘাড়েই লাগত যদি না শেষ সময়ে না ঘুরে দাঁড়াতাম। সশব্দে ছিটকে পড়লেও , হাত থেকে রিভলভার ছাড়িনি।

কিন্তু যে আমায় আঘাত করেছে , সে তখনও দাঁড়িয়ে। যদিও হাত খালি। ওর বন্দুকটা ছিটকে পড়েছে। পলকের মধ্যে আমি গুলি চালালাম। লাগল না। কিন্তু লোকটা বেপরোয়া। নিজের বন্দুকটা না নিয়ে আমার দিকে পা বাড়াল।

আমি তখনও শুয়ে। মনে মনে হাসলাম। এই লোহার সিঁড়িতে আমি শুয়ে আছি। ও বন্দুক না নিয়েই আমার দিকে আসছে। কিন্তু তারপরই পায়ের ওপর কিছু একটার চাপ পেলাম

। লোকটা আমার ডান পায়ে প্রচণ্ড জোরে চাপ দিচ্ছে। মুহুর্তেই বুঝলাম হাত শিথিল হয়ে গেছে। শেষ চেষ্টা হিসেবে ডান পা টা একটা ঝাঁকুনি দিলাম। ও টাল সামলাতে পারল না। পড়ে যেতে যেতে যা সময় নিল , তার মধ্যেই গায়ের জোর ফিরিয়ে এনে রিভলভারটা ওর দিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার চেপে দিলাম। এছাড়া আর উপায় ছিল না।

কিন্তু তার আগেই লোকটা আমার হাত সরিয়ে দিল। গুলিটা গিয়ে একটা জানলার কাঁচে লাগল আর তক্ষুনি ওর সাথে আমার চোখাচোখি হল।

রামিরেজ। ওরফে আমাদের নকল গার্ড বিক্রম !

রামিরেজ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ও পাশের দরজা খুলে প্রণয় বেরিয়ে এল। হাতে উদ্যত রিভলভার। কিন্তু রামিরেজ ভাড়াটে খুনি। এসব তার বাঁ হাতের খেলা। নিমেষে সামারসল্ট ডাইভ দিয়ে ওপাশের একটা ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে নেমে গেল। আমি আধশোয়া অবস্থাতেই গুলি চালাচ্ছি , কিন্তু ও দোতলার কাছাকাছি পৌঁছেই পোস্ট থেকে সোজা ঝাঁপ দিল রাস্তায়। দু পায়ে নামলেও একটু গড়িয়ে গেল , আর সেই সময় আমার গুলি ওর পায়ে গিয়ে লাগল।

প্রণয় উত্তেজিত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় লাফিয়েই নামছিল , আমি উঠে দাঁড়াতে গিয়েই টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। পায়ে প্রচন্ড ব্যাথা। হাতের ব্যাথাটাও যেন আবার চাগাড় দিচ্ছিল। তাও কোনো মতে ওর দিকে রিভলভার তাগ করতেই বাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রচণ্ড জোরে একটা বাইক এসে থামল। পায়ের জখম শুদ্ধুই রামিরেজ উঠে গেল তাতে। প্রণয় যতক্ষনে রাস্তায় নামল , তার মধ্যে বাইক পগার পাড়।

এরই মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে গেছিল। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে পা টাকে ভাঁজ করলাম। দু-একজন দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একজনের বেয়ারার পোশাক দেখে বললাম , " ম্যানেজার কো বুলাও। পোলিস্। "

আমার হাতে বন্দুক দেখে ছেলেটা আর কথা না বাড়িয়ে ছুটে গেল। প্রণয় দৌড়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিল। আমি তখন আবার হুমড়ি খেয়ে পড়েছি। পায়ে সাঙ্ঘাতিক যন্ত্রনা হচ্ছিল। প্রণয় আমায় কোনমতে ধরে ধরে ভেতরে আনল। যে কজন লোক ছিল , তারা সরে গেল সামনে থেকে।

রিভলভারটা গুঁজতেই ম্যানেজার এসে হাজির হল। প্রণয় তাকে কিছু বলতেই সে সব

লোকজন সরিয়ে দুদিকের দরজাই বন্ধ করে দিল। যে ছেলেটাকে বলেছিলাম একটু আগে ম্যানেজারকে ডাকতে সে ইতিমধ্যে কিছু বরফ নিয়ে এসেছে। রুমালে বেঁধে কিছুক্ষন জায়গাটায় চেপে রাখায় কিছুটা ব্যাথা কমল।

মিনিট খানেক চুপ করে বসে তারপর ম্যানেজারকে বললাম , " আমরা বলব কখন পুলিশ কে ফোন করতে। তার আগে আপনি হোটেলের রেজিস্টারটা আনুন তো। "

ম্যানেজার ঘাড় বেঁকিয়ে নিচে চলে গেল। আমিও উঠে যে ঘরে খুনটা হয়েছে সেখানে গেলাম। একটু খোঁড়ালেও ততক্ষণে অনেকটা জোর এসেছে পায়ে। দরজার একটু পাশেই ডেডবডিটা পড়ে আছে। পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। চেহারা অপরিচিত। পরনে নীল সাদা ডোরাকাটা জামা আর কালো জিনস্। পকেটে একটা কলম শুধু। বুকের বাঁ দিকে কলমটার ঠিক ওপরে গুলিটা লেগেছিল। হাতে একটা চিরকুট। টানাটানি করতে হাতে এল। লোকটা স্পটডেড্। চেহারা দেখে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হয়। তবে বাঙালি নয় এটা বোঝা যাচ্ছিল। ডান হাতে একটা আংটি। তাতে হনুমানের ছবি।

" রামভক্ত হনুমান ", বলে প্রণয় একবার ঘরের চারপাশটা দেখতে লাগল। পায়ের জন্য আমি আবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। চিরকুটটা পরার সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ের কথাটা মাথায় চাগাড় দিতেই বাঁই করে মাথাটা ঘুরে গেল।

এক নিমেশের মধ্যে সমস্ত চক্রান্তটা আমার মাথায় খেলে গেল।

প্রণয় আমায় বসতে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল , " কি রে এক্স রে করতে হবে নাকি ? "

আমি উত্তর দিলাম না। প্রণয় এগিয়ে এসে বলল , " তোর চশমার ভেতরে চোখ দুটো চকচক্ করছে। মনে হচ্ছে এই ..."

" হাঁ। এই কেসের সমাধান হয়ে গেছে। "

" কিন্তু জুপিটার হোটেলে আমাদের ওপর আক্রমন হল কেন ? "

" যাতে সহায়কে ওখান থেকে সরানো যায়। আর আমাদের মামলা থেকে হঠিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্যই সহায়ের কোন সাকরেদের কাজ। "

" সহায় ! ... " , প্রণয়ের মুখের হাঁ বন্ধ হচ্ছিল না।

" ইয়েস। কারণ সহায়ই হচ্ছে মিঃ ফক্স আর এই চক্রান্তের নাটের গুরু ! আর এটা জানতে পারলাম থাঙ্কস টু এই চিরকুট যেটা ওই লাশের হাতে ছিল। "

প্রণয়কে দেখালাম কাগজটা। তাতে লেখা ' **BOSS with Targets** '।

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললাম , " এখন সমস্ত ঘটনাগুলো আমার কাছে জলের মত পরিস্কার। পুনের কথাই ভেবে দ্যাখ। সহায় কোন একটা মুল্যবান জিনিস আনিয়েছিল রামিরেজকে দিয়ে যে সম্ভবত কাউকে খুন করে সেটা নিয়ে আসে। কোন চালাক লোক সেটা জানতে পারে আর সহায়কে মেসেজ পাঠায়। রাতে ওই ছাদে এসে সে রামিরেজের হাতে খুন হয়।

"পরেরদিন মিঃ সহায় ভালমানুষ সেজে তোর দাদার কাছে যায়। অর্থাৎ সেফ সাইডে থাকে। কিন্তু যেহেতু তুই লাশের ছবি তুলে নিস তাই সহায় ক্ষেপে গিয়ে তোকে ওই ক্যাফেতে ডাকে। সেই সময় দুজন রাইভাল গ্যাঙের লোক তোকে দেখে ভাবে তুই ওই দলের। রামিরেজকে পাঠায় তোকে মারার জন্য। কিন্তু ওই দুজন লোক থাকায় তুই বেঁচে যাস।

" এখানে এসে কাল রামিরেজ বিক্রম সেজে তোর গার্ড হয়ে যায়। রাধানগরে লোকাল কোনো গুন্ডাদের ঠেকে ওরা ওদের মালপত্র রাখে এবং এই হোটেলে আস্তানা গাড়ে। বাইক চালিয়ে একটা লোক কোনো একটা প্যাকেট ওদের একজন কে দেয়। তোকে বলেছিলাম যে , তিনজন লোক ওখানে বসে কল ব্রে খেলছিল। অথচ ওই দুজন ছাড়া আর লোক কোথায় ? তাহলে ধরতে হয় যেই লোকটাকে আমরা ঢুকতে দেখলাম সে যদি আমায় বাইকের ধাক্কা দেয় তাহলে সেই তৃতীয় ব্যাক্তি কে ?

" তখন আমি লক্ষ্য করিনি কিন্তু পড়ে মনে হল যে আমরা সহায়ের ঘরে কোন খাওয়ার প্লেট বা ওই ধরনের কিছু দেখিনি। তখনই আমার মনে হয় যে আমায় যে ধাক্কা দিয়েছিল সে যদি সেই তৃতীয় ব্যাক্তি হয়ে থাকে তাহলে আমরা যাকে ঢুকতে দেখেছি সে আর কেউ না। মিঃ সহায় নিজেই। পোশাকটাও একই।

" আর এই লোকটা কে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। সম্ভবত এই চিরকুটটা ও এখনই লিখেছিল। সেই সময় রামিরেজ আসায় ও ঘাবড়ে যায়। এদের কায়দাই হল প্রমাণ লোপাট করা। সেই মত ওকেও খুন করে " , একটানা বলে একটু নিঃশ্বাস নিলাম।

প্রণয় অবাক হয়ে শুনছিল। এবার বলল , " তার মানে তো ... "

আমি উঠে দাঁড়ালাম , " তার মানে একটু পরেই সাঙঘাতিক গন্ডোগোল হবে। এটাও থাঙ্কস টু ইউ , আমি বুঝে গেছি কোথায়। "

" মানে ? আমি কি করলাম। "

" লোকটার আংটি দেখে তুই যেটা বললি তাতেই আমি বুঝে গেলাম। আমরা **RN** দেখে রাধানগর ভেবেছিলাম। অথচ এত সহজ সমাধানটাই দেখছিলাম না। রাধা নয় রাম। রামনগর। আর **B2** হচ্ছে ..."

" **BOMB** ২ নং রামনগর রোড। "

এই সময় বাইরে পুলিশের গাড়ি এসে থামল। একটু পরেই একজন অফিসার উঠে এলেন ওপরে। আমাদের দিকে সোজা এসে বললেন , " আশা করি আপনারা এতক্ষনে অনেকটাই বুঝে গেছেন। বাকিটা চলুন ম্যানেজারের ঘরে বসে বলব। "

-১২-

যখন আমরা ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরলাম তখন ঘড়ি বলছে পৌনে চারটে। আমার ডান পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা। সেই অফিসার , নাম রক্তিম দত্ত তখন পুলিশদের নির্দেশ দিচ্ছেন। এর মধ্যে একজন গিয়ে সেই গাড়িটার থেকে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক নিজে আমাদের কথা শুনলেন , তারপর এই গ্যাঙের কুকীর্তি শোনালেন। মিঃ ফক্স ওরফে মিঃ ধিরেন্দ্রনাথ সহায় যে এর পেছনে আছে শুনেই উনি উত্তেজিত। সিসি টিভির ফুটেজ দেখলেন।

ঠিক চারটা পাঁচে তিনটে গাড়ি রওনা দিল। সামনের সিটে একজন রাইফেল ধারী **AK-47** নিয়ে বসে আছে। পেছনে মিঃ দত্তর সাথে আমি আর প্রণয় বসে ছিলাম। রামনগরের ২ নম্বর রাস্তাটা বেশ লম্বা। কিন্তু **IO** মানে কি সেটা তখনও জানা যায়নি।

এখন রাস্তার দুপাশে তাকিয়ে মনে হল এই শেষ রাতে কোনদিন শহরটা দেখিনি। এত নির্জন রাস্তায় এই তিনটে গাড়িই যেন বেমানান। বাতিগুলো জ্বলছিল। এই সময় হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল হল। IO না হয়ে ওটা তো 10 ও হতে পারে।

কথাটা মনে আসতেই আমি ঝট করে সোজা হয়ে বসলাম। মিঃ দত্ত আর প্রণয় আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতেই আমি সন্দেহের কথাটা বললাম।

প্রণয় মাথা নাড়লেও মিঃ দত্ত বললেন , "২ নম্বর রোডে অনেক বাড়িঘর। তার... "

" ১০ নম্বর বাড়ি ! অবশ্যই ! " , প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রণয়।

কিন্তু এবার আমিই মাথা নেড়ে বললাম , " তাহলে ২ আর রামনগর এর মাঝে কেন থাকবে ১০ ? না ... এর অন্য মানে আছে। "

মিঃ দত্ত হঠাৎ বললেন ," রামনগর কিন্তু অনেক বড় জায়গা। ঠিক পজিশান না পেলে আমরা ওদের আটকাতে পারব না। এতগুলো রাস্তা , ১ থেকে ১০..."

" ইয়েস। ১০ নম্বর। ২ না। আমরা প্রথমেই ২ ভেবে নিয়েছি। অথচ এটা হবে ১০ নম্বর রামনগর রোডে ২ নম্বর বাড়ি ! " , এবার আমিই প্রায় চেঁচিয়ে বসলাম।

" সর্বনাশ ! " ,বলে মিঃ দত্ত তার ওয়াকি টকিতে নির্দেশ দিতে লাগলেন। গাড়ি ততক্ষণে কের চৌমুহনী পৌঁছে গেছে। ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে নিমেষের মধ্যেই শঙ্কর চৌমুহনী পার করে গেল। দুর্গা চৌমুহনীতে এসে আমরা নেমে পড়লাম। মিঃ দত্ত , একজন প্লেন ড্রেসের ডিটেক্টিভ , প্রণয় এবং আমি ৯ নম্বরের রাস্তা দিয়ে ঢুকলাম। প্রথম ক্রসিং অর্থাৎ যে গলিটা ১০ এবং ৯ নম্বরের রাস্তার সঙ্গে জুড়েছে তার সামনে একটা বাইক রাখা। ঘড়িতে তখন সোয়া চার ।

বাইকটা দেখে আমরা থমকালাম। ইতিমধ্যে ওয়াকি-টকি তে খবর এল যে বম্ব স্কোয়াডের দুজন লোক এসে পড়েছে। মিঃ দত্ত ওদের গাড়িতেই থাকার নির্দেশ দিলেন। বাইকটা সন্দেহজনক। কিন্তু এটাই যে সেই বাইকটা যেটা ওরা ব্যাবহার করছে সেটা বোঝা গেল না। পাম্পে অত দূর থেকে নম্বর দেখা যায়নি। বেশ দূরত্ব রেখেই আমরা দৌড়ে রাস্তাটা পেরিয়ে এলাম। কিছুই হল না।

১০ নম্বর রোডে এসে একটা পুরনো গ্যারেজের পাশে আমরা দাঁড়ালাম। ইনফ্রারেডটা

চোখে লাগিয়ে মিঃ দত্ত দেখছিলেন। তারপর নামিয়ে বললেন , " ওই যে হলদে রঙের বাড়িটা , ওটাই দু নম্বর বাড়ি।

ডিটেক্টিভ ভদ্রলোক এবার ওয়াকিটকিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর মিঃ দত্তর দিকে তাকাতেই উনি মাথা নাড়লেন। ঠিক হল সাঁড়াশি অভিযান হবে। দু দিক থেকে ঘেরাও করে তারপর সব দরজাগুলো আটকে দেওয়া হবে। আমাকে আর প্রণয়কে যদিও ঝুঁকি না নিতে দিয়ে বললেন ওখানেই থাকতে। যদি কেউ পালায় তাকে ঘায়েল করা যাবে।

দুজনে বেরিয়ে যেতেই আমি প্রণয়ের দিকে ফিরলাম। সারারাত যা হল তারপর আমরা এখানে অপেক্ষা করব তা হয় না। নাহলে এত দূর আসার দরকার হত না। হাতের ব্যাথাটা চাগাড় দিচ্ছিল। ভুলে গিয়ে রিভলভারটা বের করে চেক্ করলাম। তারপর প্রণয়ের দিকে ফিরতেও দেখি ওর হাতেও রিভলভার এসে গেছে। সামনের রাস্তাটা নেড়া। পেছনে একটা বাড়ি। পাঁচিল টপকে ফুলগাছ মাড়িয়ে সোজা চলে গেলাম ওই বাড়িটার উল্টোদিকে।

এখানে একটা নতুন কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম দোতলায়। সামনের বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল ভাল। সেটাও দোতলা। একটা দেওয়ালের পাশে বসে উঁকি দিতেই দেখলাম বাড়িটার এদিকের জানলাটা খোলা। তার ভেতর কিছু বাক্স আর একজন লোককে দেখা যাচ্ছে। নাইট ভিশন দিয়ে দেখে বুঝলাম এ আমাদের মিঃ ফক্স।

প্রণয়ের দিকে ফিরতেই ও মাথা নাড়ল। বাড়িটার বাঁ দিকে দেখলাম অল্প নড়াচড়া হচ্ছে। অর্থাৎ মিঃ দত্ত তার ফোর্স সমেত ঢুকছেন। প্রণয় এবার ফিস্‌ফিস্ করে বলল , " আমি ডানদিক দিয়ে যাচ্ছি। "

মাথা নাড়তেই ও গেল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে এদিকে চোখ ফেরাতেই লাল একটা আলো যেন চোখে পড়ল। মাথা ঝাড়তেই দেখলাম আমার কালো শার্টের বুকের বাঁ দিকে একটা লাল আলো পড়েছে।

প্রায় তক্ষুনি ডানদিকে একটা ঝাঁপ দিতেই প্রচন্ড শব্দ করে একটা গুলি এসে লাগল পেছনের দেওয়ালে। হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়েছে। তাও ডান দিকে গড়িয়ে গিয়ে অনেকটা দুরের একটা জানলায় আসতেই দেখলাম ওই বাড়ির ছাদে একটা কালো মুখোশ পরা লোক। হাতে স্নাইপার। আমি থমকালেও পরমুহূর্তেই আবার গড়িয়ে গেলাম। কিন্তু এবার বাঁ দিকে। রিভলভারটার দিকে যেতে যেতে ও আর কয়েকটা গুলি চালিয়ে দিল। একটা প্রায়

আমার কানের পাশে। ইট বালি ছিটকে এসে চোখে মুখে ঢুকল।

রিভলভারটার দিকে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিলাম আর ঠিক সেই মুহুর্তে ওখানে একটা গুলি লাগল। স্নাইপার রাইফেল। তাই গুলিটা রিভলভারটাকে ছিটকে দিয়েও প্রায় মেঝেতে গর্ত করে দিল।

সেই সময় হঠাৎ লোকটা একটা শব্দ করে উঠল। আধশোয়া অবস্থাতেই দেখলাম সে ডান কাঁধে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। নিচে তাকাতেই বুঝলাম প্রণয় গুলিটা চালিয়েছে।

এর মধ্যেই পুলিশের দুজন লোক ছাদে উঠেছে। লোকটার দিকে বন্দুক তাগ করতেই সে স্নাইপার ঘুরিয়ে দুজনকেই শুইয়ে দিল। কিন্তু যতক্ষনে এদিকে ফিরল তার মধ্যে আমি হাতে রিভলভার নিয়ে নিয়েছি। এদিকে ফিরতেই ওর ডান কাঁধ লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলাম। অন্ধকার রাত। তাই গুলি কাঁধে না লাগলেও হাতে লাগল। স্নাইপারটা পড়ে গেল। ঝট করে ইনফ্রারেডটা নিয়ে চোখে লাগাতেই দেখলাম ও কাতরাতে কাতরাতে মুখোশ খুলে ফেলল।

রামিরেজ ! কুখ্যাত খুনি।

ঠিক তখনই সেই ডিটেকটিভ আর দুজন সেপাই ছাদে উঠে এল। রামিরেজ কোমর থেকে পিস্তল বের করতেই ডিটেকটিভ ভদ্রলোক গুলি করলেন। টলে পড়ল দেহ। বুঝলাম ভাবলীলা সাঙ্গ হল।

হাত থেকে ইনফ্রারেডটা নামিয়ে রিভলভারটা কোমরে গুঁজতে যাব, ঠিক তখনই কানের পাশে একটা ঠাণ্ডা জিনিসের স্পর্শ পেলাম।

ততধিক ঠাণ্ডা একটা গলা বলল , "ড্রপ ইওর গান ! "

-১৪-

কিছুই করার ছিল না। হাত থেকে রিভলভারটা ফেলতে ফেলতেই যে কাজটা করলাম

সেটাকে দুঃসাহসী বলা যায়। রিভলভারটা হাত থেকে ফেলতেই একটু নিচু হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে ডান হাত দিয়ে ওর তলপেটে ঘুসি চালিয়ে দিয়েছি। পুরোপুরি ঘুরে গিয়ে বাঁ পাটা ওর দুপায়ের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিলাম। মুখ থুবড়ে পরলেও লোকটা রিভলভারটা ছাড়েনি। তাই ওর হাতে লাথি মারলাম। রিভলভারটা সরে গেল কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে আমিও পড়লাম। হাতের চোটটা প্রচন্ড ভাবে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠতেই অন্য হাত থেকে ইনফ্রারেডটাও পড়ে গেল।

লোকটা ততক্ষনে উঠে পড়েছে। আমি উঠতে গেলেও সে আমার বুকে প্রচন্ড জোরে লাথি কষাল। তাতে ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে লাগতেই গালের একপাশে কেটে গিয়ে রক্ত পরতে লাগল।

লোকটা রিভলভারটা নিতে যত সময় নেবে তার মধ্যে আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়েই বুঝলাম হবে না। পায়ের ব্যাথাটা তখন একদম অবশ করে ফেলেছে। কিছু না ভেবেই সামনে পড়ে থাকা ইনফ্রারেড নাইট ভিশানটা ছুঁড়ে দিলাম ওর পিঠ লক্ষ্য করে। লাগল মাথায়। একটু থমকে তারপর এদিকে তাকাল। তখনই চিনতে পারলাম। এই লোকটাই বাইক নিয়ে পাম্পে গেছিল ও হোটেল প্রিন্স থেকে রামিরেজকে উদ্ধার করেছিল।

বিচলিত না হয়ে ও রিভলভারটা তুলে এদিকে তাগ করল। কিন্তু ট্রিগার দাবানোর আগেই একটা হাততালির মত শব্দ হল। লোকটা দু সেকেন্ড প্রায় পাথরের মুর্তি হয়ে গেছিল। তখনই আর কয়েকটা আওয়াজ হল গুলির। তারপরই ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

দেখলাম পেছনে হাতে উদ্যত রিভলভার হাতে প্রণয় দাঁড়িয়ে। পাশেই মিঃ দত্ত। তার হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র।

ঠিক সেই সময় বাইরে পরপর দুটো গুলির আওয়াজ এল। কোনমতে উঠেই দেখতে পেলাম মিঃ ফক্স গুলি চালাতে চালাতে সেই বাইকটার কাছে যাচ্ছে। প্রায় নিমেষে পৌঁছে গেল আর উঠেই বাইক চালিয়ে দিল।

জানলাটা থেকে দেখা যাচ্ছিল নিচে। বিপদের মুহুর্তে আমার স্নায়ু খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। পাশেই দাঁড়ানো মিঃ দত্তর হাত থেকে ওর রিভলভারটা নিয়ে চালালাম। অবিশ্বাস্য ভাবে গুলিটা গিয়ে ঠিক পিঠের নিচে লাগল। বাইকশুদ্ধু উলটে পড়ল।

প্রণয় জোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। মিঃ দত্ত ততক্ষনে নিচে চলে গেছে ফক্সকে ধরতে। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন। আমি আবার মাটিতে বসে পড়েছি তখন। পায়ের ব্যাথাতে কাতরাচ্ছিলাম।

বম্ব স্কোয়াডের লোকেরা আসলেও দেখা গেল বোমা কোনটাই ব্যাবহার হয়নি। যা আগ্নেয়াস্ত্র ছিল ওই বাড়িতে তা দেখে মিঃ দত্তর চোখ কপালে। আমার পায়ের অবস্থা দেখে একজন প্যারামেডিক বলল যে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে রাখলেই সেরে যাবে।

ভোরবেলা চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। মহিমকে ওই বাড়ির নিচতলায় বন্দী অবস্থায় পাওয়া গেছে। মিঃ ফক্সকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য RAW এজেন্টরা আসবে। মিঃ দত্ত , আমি , প্রণয় , সেই ডিটেকটিভ এবং প্রণয়ের দাদা , যে ভোরবেলাতেই খবর পেয়ে বিশেষ প্লেনে চলে এসেছিল , সবাই বসে ছিলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে মিঃ দত্ত বলল আমাদের , " আগের তোমাদের ব্যাপারটা শোনা যাক।"

আমি আর প্রণয় সবিস্তার বললাম।

দাদা বলল , " আমি খবর পেয়েছিলাম যে ওরা নর্থইস্ট দিয়েই কাজ শুরু করতে চায়। কিন্তু তাই বলে এত যে ব্যাপার তা বুঝি নি। RAW এবং IB তে হইচই পড়ে গেছে। "

মিঃ দত্ত বললেন , " আমি চিন্তাই করতে পারছি না যে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে এত বিশাল কান্ডকারখানা চলছিল। যা আর্মস রয়েছে এদের স্টকে তা দিয়ে পুরো শহরটাই দখল করতে পারতো ওরা। "

চা খেয়ে আমরা উঠলাম। প্রণয় আমায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারটা ও আগেই উঠিয়ে নিয়েছিল। ইনফ্রারেডটা আমাকেই দিয়ে দিল। বলল যে আমার নাকি কাজে লাগবে।

দরজা জানলা খুলতেই ঘরে হাওয়া বাতাস ঢুকল।কাল বেরনোর আগে ল্যাপটপ বন্ধ করিনি। ব্যাটারি শেষ। চার্জে বসিয়ে কাগজটা খুললাম। কাগজে প্রথম পাতায় ক্রিস গেইলের ছবি। ১৭৫* এর অনবদ্য ইনিংস খেলেছে কালকে। ২০-২০ তে এটাই কোন একজন প্লেয়ারের সর্বাধিক স্কোর। রিপোর্টটা পড়েতে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সারারাত জাগা। তার ওপর এত কিছু। ঘুম যখন ভাঙল তখন শেষ দুপুর। মোবাইলে দেখি ২৩ টা মিসড কল্ ! মেজমামা একাই তার মধ্যে ১১ বার ফোন করেছে।

- ১৫-

বিকেলে এয়ারপোর্টে গেছিলাম মাকে নিয়ে আসতে। ঠিক সময়ই ফ্লাইট এল। লাগেজ নিয়ে বেরতে বেরতে প্রায় পাঁচটা। আসার পথে টুকটাক কথার মধ্যে মা বলল, " পরপর দু রাত ঘুমোসনি মনে হচ্ছে। "

হাসতে হাসতে বললাম, " মাত্র এই। মিস্ মার্প্‌ল অনেক কিছুই বলতে পারত আরো। "

মা তারপর যা খুঁটিনাটি তথ্য বলল তাতে আমি থ।

বাইরে তখন সুয্যিদেব অস্ত যাচ্ছেন। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম, " একদিন আগে হলেও এই বিশ্লেষণ অন্য রকম মানে তুলে ধরত। "

মুখ ফিরিয়ে মাকে বললাম, " আজ বাইরে ডিনার ? একটা নতুন হোটেল খুলেছে নেতাজি চৌমুহনীতে। বেশ ভাল। "

" যেটার কার্ড তোর ম্যানিব্যাগে দেখতে পেলাম ? কাল গিয়েছিলি মনে হচ্ছে ! " , বলেই মা হাসল॥

সমাপ্ত

আমার মা

শু ভ ব্র ত সা ন্যা ল

পৃথিবীর বুকে এনেছ তুমি স্তন্য করেছ দান,
তোমার কোলেতে রেখেছি মাথা, দেহতে দিয়েছ প্রাণ...।
পৃথিবীর বুকে সেরা আশ্রয় তুমি যে আমার মা,
নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ মূর্তি, তুমিই আমার মা...।
স্নেহ মমতায় আঁকড়ে রেখেছ তোমার মাতৃক্রোড়ে,
সয়েছ অনেক যাতনা জীবনে মানুষ গড়বে বলে।
মানটা দিয়েছ, হুঁশটা দিয়েছ, দিয়েছ মহান দীক্ষা,
সদ্য ফোঁটা কুঁড়িকে দিয়েছ মানুষ হওয়ার শিক্ষা।
নিজের পায়ে হাঁটতে শিখেছি ধরে তোমার হাত,
মাতৃত্বের দৃঢ় বাঁধনে বেঁধেছ দিনরাত।
মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছি তোমারি সাহচর্যে,
প্রার্থনা করি তোমার জীবন ভরুক মহৈশ্বর্যে ······।

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবঃ কিছু কথা

- রক্তিম আচার্য্য

সুনীল আকাশে শ্বেত-পুঞ্জ মেঘের আনাগোনা। ভোরের হাওয়ায় শিউলির মন উতল করা সুবাস, কাশফুলের হিন্দোল বয়ে আনে আগমনী বার্তা। মা আসছেন। বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের শ্রেষ্ঠ পার্বণ শারদীয়া দুর্গোৎসব। বছর ভরের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মা মর্তে আসেন। বাঙালী উৎসবপ্রিয়, এই উৎসবকে ঘিরে বাঙালীর উন্মাদনার অন্ত নেই। তাছাড়া শরৎকালের মধ্যে এমন একটি প্রসন্ন আনন্দের ঢেউ আছে যা প্রানমনকে মাতিয়ে তোলে। বাঙালীর শিল্পপ্রতিভা এই দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত হয়। এই পূজার সাথে সাহিত্যচর্চার যোগ থাকে। পূজার সাথে পুজাসংখ্যার থাকে বিশেষ এক আকর্ষণ।

ফেসবুকের মতো একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, যেখানে সবাই ফ্রেন্ডসদের সাথে চ্যাটিং করে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে, একটি কমিউনিটি পুজাসংখ্যা প্রকাশ করছে, ভাবতেই অবাক লাগে ! অবশ্য কিছুটা অবাক হবারই কথা; ভিডিও গেমস, টিভি, সিনেমা কিংবা চ্যাটিং, এতো কিছু লোভনীয় বিনোদনের আড়ালে সাহিত্য যেখানে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে, সেখানে খোদ্ ফেসবুক থেকে বেরিয়ে এলো একখানা পুজাসংখ্যা ! এর ব্যাখ্যা খুব জটিল নয়। এই আধুনিক যুগের মতো করে আধুনিক স্টাইলে নতুন প্রজন্মের কাছে সেই চিরাচরিত সাহিত্যকে তুলে ধরার এবং জনপ্রিয় করে রাখার জন্য একদল সাহিত্যপ্রেমীদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের গোড়াপত্তনের পেছনেও রয়েছে এই একই কারন। বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক ও লেখক সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত সৃষ্টি গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তির ওরফে আমাদের সবার প্রিয় ফেলুদা। একজন পারফেক্ট বাঙালীর যেসব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন প্রায় সবগুলিই ফেলুদার মধ্যে বিদ্যমান। তাই ফেলুদা আট থেকে আশি সব বাঙালীদের কাছেই অতি পরিচিত এবং অতি আপনজন। এইসব সাহিত্যপ্রেমী ও ফেলুদা ফ্যানদের একত্রিত করে একটি কমিউনিটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে আজ থেকে ঠিক আড়াই বছর পূর্বে ফেসবুকে যাত্রা শুরু হয় ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের। শুরুতে শুধুমাত্র ফেলুদাকে নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল এই কমিউনিটি; ধীরে ধীরে সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের আগমনের সাথে সাথে ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের সীমা ছড়িয়ে পড়ে সাহিত্যের সকল শাখায়। আর এখন ? ফেলুদা ফ্যান ক্লাব এখন আর শুধু একটি কমিউনিটি নয়, সাহিত্যপ্রেমী মানুষের এক বৃহৎ পরিবার, যাদের একত্রিত করেছে ফেসবুকের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। বলাবাহুল্য যে, সকল প্রকার অপসংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে ফেলুদা ফ্যান ক্লাব সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। এই কৃতিত্ব সকল সদস্যদের। এখানে নিয়মিত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, সকলের মত বিনিময়ের পাশাপাশি চলে তর্ক-বিতর্ক এবং সমালোচনা। তাছাড়া সাহিত্যের নিত্যনতুন বিষয় এবং

পরিবর্তনের বিষয়ে সবাইকে অবগত করানো হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে সত্যজিৎ পুত্র শ্রী সন্দীপ রায়ের সাথে প্রীতি সাক্ষাতে মিলিত হয়ে ফেলুদার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আমাদের এই কমিউনিটি সম্বন্ধে অবগত করানো হয়েছে। ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা শুধু বাঙলার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে; আর এখানেই ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের সার্থকতা।

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে প্রথম বারের মতো এই "e–ম্যাগাজিন" প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; যার নাম "আমরা ও ফেলুদা", আর সেটা শারদীয়া পুজাসংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করার চেয়ে ভালো আর কি হয়ে পারে। অনেকেই হয়তো এই "e–ম্যাগাজিন" কথাটি শুনে নাক সিটকবেন। বলবেন, ' এতো সেই আধুনিক যুগের টেকনোলজির ব্যাপার।' কথাটা ষোলোআনা খাঁটি। ম্যাগাজিন এবং "e–ম্যাগাজিন" এর মধ্যে অনেক তফাৎ। কিন্তু ম্যাগাজিন প্রকাশের ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিবন্ধিকতা সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা "e–ম্যাগাজিন" এর ক্ষেত্রে নেই। তাছাড়া পাঠককেও পয়সা খরচ করে কিনতে হবে না। কিন্তু তাই বলে "e–ম্যাগাজিন" কোনদিনও কাগজে বাধানো ম্যাগাজিনের বিকল্প হতে পারবে না। তাই আমরা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা "e–ম্যাগাজিন" হিসেবেই শুরু করতে চেয়েছি, কিন্তু ভবিষ্যতে সত্যিকারের ম্যাগাজিন প্রকাশ করার ইচ্ছে রয়েছে; আপনাদের সমর্থন পেলে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। যারা আমাদের এই "e–ম্যাগাজিন" পড়তে ইচ্ছুক কিন্তু তাদের কাছে laptop, computer কিংবা ebook reader নেই, তাদের উদ্দ্যেশে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমরা সত্যি দুঃখিত।

আমাদের ফেলুদা ফ্যান ক্লাব কমিউনিটিতে এমন অনেকেই আছেন যারা সাহিত্যচর্চা করে থাকেন, মূলত তাঁদেরই অনুপ্রেরনায় ও কিছু সাহিত্যপাগল মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হল আমাদের প্রথম "e–ম্যাগাজিন", "আমরা ও ফেলুদা"। যারা এতে লিখেছেন তাদের কেউই পেশাদার লেখক নয়, অনেকেই শখের লেখক, তাই তাদের লেখায় ভুলভ্রান্তি থাকবে সেটা বলা বাহুল্য। সব লেখা হয়তো আপনাদের ভালো নাও লাগতে পারে। তাছাড়া এটা প্রথম ম্যাগাজিন হওয়ায় এডিটররাও সবাই আনাড়ি। তাই বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি গুলোর জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই পুজোর শুরুতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা "আমরা ও ফেলুদা" যদি আপনাদের কিছুটাও আনন্দ দিতে পারে, তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে। "আমরা ও ফেলুদা" সম্পর্কে যেকোনো রকমের মতামত এবং সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে। কেমন লাগলো আমাদের এই প্রথম ক্ষুদ্র প্রয়াস, অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের মতামতের উপরই এই ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। আর যারা আমাদের ফেলুদা ফ্যান ক্লাব পরিবারের সদস্য হতে ইচ্ছুক, সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। সবাইকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। দুর্গাপূজার দিনগুলো সবার ভালো কাটুক। শারদোৎসব হয়ে উঠুক আনন্দময়।

বিনয়াবত

রক্তিম আচার্য্য

(Founder & Admin, FFC™)

আলোর চিত্র রেখা ১

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
-অর্নব দাস মহান্ত
স্নিগ্ধতা
-রিজু পল
আকাশটা আজ বড়ই নীল
-অর্নব দাস মহান্ত

ক বি তা

নোবেল চুরি

স হে লী রা য়

ফেলুদাদা , কোথায় তুমি ? খুঁজছি তোমায় কত !
জটায়ু আর তোপ্‌সেকেও খুঁজছি অবিরত।
সিধু জ্যাঠার কাছে জানি পাব তোমার খোঁজ ,
কিন্তু তাঁরও নেই ঠিকানা --- খুঁজছি আমি রোজ।
জানো দাদা ! কি দুর্দশা আজকে তোমার দেশে ---
রবি কবির নোবেল খানাই চুরি গেল শেষে !
কেউ জানে না কখন কেবা দুষ্ট পাচারকারী ---
এত সাধের গর্বে ভরা নোবেল করল চুরি।
তুমিই পারো এ রহস্য করতে উদ্‌ঘাটন।
তুমি এলেই ফিরবে নোবেল --- বলছে আমার মন।
মগজাস্ত্রের জোরে তুমি করবে বাজিমাত ,
তাই তো তোমায় খুঁজছি এখন , সকাল থেকে রাত।

সমাজটা আজ বড্ড কালো , করতে হবে সাদা---
দুষ্ট দমন করবে তুমি --- ফিরে এসো দাদা ।।

ভূতের খপ্পরে অবনিদা

- চিরঞ্জিত রক

ডোরবেলের আওয়াজ কানে যেতেই চোখটা দেয়াল ঘড়ির দিকে চলে গেল। কাঁটায় কাঁটায় আটটা , আর আটটা মানেই আড্ডার সময় । নিচ থেকে নিধিদা চেঁচিয়ে বলল " ছোড়দা , সুনীলবাবু আইছেন। " " ঠিক আছে , বসতে বল আসছি " বলে উঠে দাঁড়ালাম । হ্যাঁ , সন্ধ্যা ছটার সময় শ্যামবাজারের অফিসের কাজ শেষ করে এই শ্রীনাথ দাস লেনের বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাতটা বাজে । আর ঠিক আটটায় বসে আমাদের আড্ডা। আগে ওই ঘরে দাদামশাই থাকতেন। ওনার মৃত্যুর পর ওটা আমাদের আড্ডার জায়গা হয়ে গেছে। বাবা মা থাকেন উপরের ঘরে। এই সুনীল আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকে। সুনীল সিংহ উত্তর প্রদেশের ছেলে। কিন্তু বাংলা বলতে ও বুঝতে বেশ ভালই পারে। বয়স আমারই মত সাতাশ আঠাশ হবে । আর আসে সামনের বাড়ির অনুপ , অনুপ কুমার দাস। সেও আমারই বয়সী। আরেক জন যিনি আসেন তিনি আমাদের স্পেশাল মেম্বার । স্পেশাল মেম্বার বললাম এই কারণে যে উনি ছাড়া আমাদের আড্ডা জমে না । বয়সে উনি আমাদের ডাবল , আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে। যদিও ওনার

আদেশ অনুযায়ী আমরা ওনাকে দাদা বলেই ডাকি। অবনীদা , নাম অবনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার গোছের লোক । আমি আর সুনীল ছিলাম , আর অনুপও এসে গেল । তাস সবে বার করে সোফার মাঝে টেবিলে রাখলাম । ওদিকে দরজার সামনে অবনীদা এলেন । ভুস ...কারেন্ট হাওয়া।

- " দুরর .. অবনীদা এলে , কারেন্টের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে এলে " হাসতে হাসতে বলল অনুপ।

অবনীদা এসে সোফায় বসে বলল " যা তন্ময় , নিধীকে চা আনতে বল । " একটু থেমে আবার বলল " এই দেখ , গরম গরম পেঁয়াজি এনেছি । অবাহাওয়াখানা জব্বর বুঝলি । বাইরে বৃষ্টি । ভিতরে কারেন্ট নেই , মোমবাতির আলো । আহা , বেশ ভূতের গল্প জমে যাবে। " এই বলে থামল। তন্ময় চট্টোপাধ্যায় আমার নাম।

- " ভূত !! " অবাক হয়ে বললাম আমি।

- " হ্যাঁরে ভূত , এই ভূতের খপ্পরে যে কতবার পড়েছি তাতো জানিসনা , আজ শোনাবো। "

- " কই এতদিনতো বলোনি এসব কথা ! " বললো সুনীল , " গল্প বানিয়ে নিয়ে এলে নাকি ? " হেসে বললো সে।

- " নিধীদা চা। " চেঁচিয়ে বললাম আমি।

- " তুই চুপ করে শোন দেখি , কি জানিস তুই ? যেটা বলছি সেটা চুপ করে শোন। " বেশ রেগে দাঁত খিঁচিয়ে বললো অবনীদা । এদিকে আমার আর অনুপের কিন্তু বেশ ভালই লাগছে। আমরা বেশ পছন্দই করি এরকম আড্ডা। ইতি মধ্যে চা এল , চার গ্লাস লিকার চা। আর সঙ্গে তো অবানীদার পেঁয়াজি আছেই । বাইরে সত্যি দারুন বৃষ্টি , ঘরে শুধু মোমবাতির আলো আর অবনীদা চায়ের গ্লাস হাতে ভূতের গল্প বলছে। আর আমরা তিনজন চুপ করে শুনছি।

- " শোন তাহলে " , চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অবনীদা শুরু করলো , " তিরিশ , বত্রিশ বছর আগের কথা , তোদেরই মতো বয়স তখন । সবে ছয়মাস হয়েছে এক অ্যাক্সিডেন্টে বাবা ও মার মৃত্যু হয়। আমি একা ওই যদুনাথ লেনের বাড়িতে। চোদ্দমাস একনাগাড়ে বৈঠকখানার এক প্রেস কোম্পানির ম্যানেজারি আর করতে ইচ্ছা করছেনা । তবুও বেকার হওয়ার ভয়ে করে যাচ্ছি। বিয়ে থাও করিনি তখন। একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম চাকরির জন্য। রায় এস্টেট , হাড়মোড়া গ্রাম। বর্ধমান দিয়ে আরও ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা। বিশাল জমি , বাড়ি , সম্পত্তি আছে। এইসব দেখাশোনার জন্য একজন শিক্ষিত নায়েব গোছের লোক চায়।

থাকা খাওয়া ছাড়াও বেশ ভালই মাইনা । ব্যাস আমারও ভালো লাগলো। মেট্রোগলির এক ষ্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলে দিলাম চিঠির সাথে পাঠিয়ে। আর দশদিনের মাথায় চিঠির জবাব এলো , সঙ্গে যাতায়াতের খরচ বাবদ কিছু টাকা ও কিভাবে যেতে হবে তা লেখা , এবং বড় করে লেখা যেন সূর্যের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাই। আমিও দেরী না করে চিঠি পাঠিয়ে যাওয়ার দিন জানিয়ে দিলাম।

সেইদিনও বাড়ি থেকে যখন বেরোচ্ছি ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। আমি বাড়ি তালাবন্ধ করে একটি বড় তিনের স্যুটকেস এবং একটা বড় ব্যাগ নিয়ে ট্যাক্সি করে হাওড়া রওনা দিলাম। সকাল আটটার ট্রেন , বর্ধমান লোকাল। সেখান থেকে আবার ট্রেন পাল্টাবো।ট্রেন কিছুটা দূর যাওয়ার পরেই বিকল হলো । আষাড় মাসের শুরু , বৃষ্টি জাঁকিয়ে হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়াররা এসে ট্রেন সারাতে সারাতে সেই বিকেল হয়ে গেল । ভাগ্যিস সঙ্গে শুকনো খাবার ছিল , নয়তো ক্ষেতের

মাঝে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ট্রেন যখন ঠিক হয়ে বর্ধমান ঢুকলো তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে।

আগের ট্রেনটা বেরিয়ে গেছে । এই মুহূর্তে গন্তব্যে যাওয়ার ট্রেন সন্ধ্যা সাড়ে ছটার আগে নেই। এদিকে ওঁরা বলেছেন সূর্যের আলো থাকতে থাকতে যেন পৌঁছে যাই । কি করব ভাবছিলাম , যাব না আজকে রাতটা বর্ধমানেই থেকে যাব । শেষ পর্যন্ত থাকতে ইচ্ছা করলো না , উঠে পড়লাম ট্রেনে । কিছুক্ষনের মধ্যেই ট্রেন ছাড়ল । প্রচন্ড বৃষ্টির জন্যে ট্রেন একটু আস্তেই যাচ্ছিল।

আমি যখন দুবারিয়া হল্ট নামের জায়গাতে নামলাম তখন আটটা বেজে গেছে। এখান থেকে গরুর গাড়ি বা সাইকেল ভ্যানে করে নদীর ঘাট। সেখান থেকে নদী পাড় হয়ে আরও চারক্রোশ পথ পাড় হয়ে তবে হাড়মোড়া গ্রাম।

ঝেঁপে বৃষ্টি পড়ছে , আমার হাতে আবার দুটো বড় বোঝা। কুলি মজুরও নেই। নিজের মাথায় করেই বয়ে নিয়ে বাইরে এলাম। দেখি কোনো লোক নেই , গাড়ি নেই। শুধু একটা গরুর গাড়ি স্টেশন পেড়িয়ে চলে যাচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে সেটা থামল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম " আমি নদীর ধারে হাড়মোড়া গ্রামে যাব। একটু নদীর ধারে ছেড়ে দেবে ? " লোকটা আমার উপর থেকে নিচে একবার দেখে নিয়ে একটা বিচ্ছিরি হেসে বলল " পেছনে বসুন। "

আমি একটু অবাক হলেও উঠে পড়লাম । আমি ছাড়াও আরেকজন নেমেছিল এই স্টেশনে , সে লাইন পেড়িয়ে চলে গেল। নদীর পাড় এসে গেলে চালক আমাকে নামিয়ে দিয়ে আবার সেই বিশ্রী হাসি হেসে চলে গেল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে সে এক পয়সাও নিল না। বর্ষার তুমুল বৃষ্টি , নদী ফুলে ফেঁপে একাকার। নদীর ঘাট পুরো অন্ধকার , একটাও নৌকা দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবছি বর্ধমান থেকে গেলেই ভালো হত। ঘাটের পাশেই বেড়ার ছোট্ট গুমটি মতো করা আছে , সেখানে ব্যাগপত্তর রেখে আমি বসলাম। মনে মনে এই দুর্দশার কথা ভাবছি। এমন সময় কাঁধে হঠাৎ কার হাত পড়তে চমকে উঠলাম।

- " ভয় পাবেননা বাবু , আমি এই নদীর মাঝি। " কথাটা বলে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। বয়স আন্দাজ চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে , গায়ের রং মিশমিশে কালো। লোকটি আবার বলল " আপনি এই দুঃসময়ে ঘাটে বসে আছেন যে ? " বলে আমার দিকে তাকালো।

- " আমি ওপারে যাব , কিন্তু কোনো উপায় না পেয়ে এখানেই বসে আছি। " বললাম আমি।

- " আকাশের অবস্থাতো দেখতেই পাচ্ছেন । তার ওপর নদীর এই হাল। দুপুর থেকেই খেয়া পারাপার বন্ধ।"

- " তাহলে কি কোনো উপায় নেই ? মানে পয়সা বেশি দিলেও ... " একটু লোভ দেখাবার চেষ্টা করলাম , যদি কাজ হয়।

- " তা আপনি যাবেন কোথায় ? " একটু হাসি মুখ করে জিজ্ঞাসা করলো লোকটা।

- " হাড়মোড়া গ্রাম। "

- " হুম .. বুঝলাম , এই বয়সেই প্রাণ খোয়াবার ইচ্ছা। নতুন নাকি এ পথে ? আমি যদি পাড় করেও দিই , যাবেন কিভাবে এত রাতে ওই গ্রামে ? ডাকাত বা ঠ্যাঙ্গাড়েদের হাতে প্রাণটা যাবে। তাছাড়াও তেনারা তো আছেনই । " একটু থেমে আবার বলল " তারচেয়ে এখানেই থেকে যান কোথাও। "- " আচ্ছা এই তেনারাটা করা ? ডাকাত বা ঠ্যাঙ্গাড়ে তো বুঝলাম " প্রশ্নটা শুনে সে বেশ জোরে হাসতে থাকলো "

বুঝবেন বুঝবেন সবই বুঝবেন " বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

বেশ ভালো মতো বুঝলাম যে আজ আর যাওয়া হবে না । বৃষ্টি এখন ঝিরি ঝিরি , আমি গুমটির মধ্যে মোমবাতি জ্বাললাম। বর্ধমান থেকে সীতাভোগ আর বিস্কুট , পাঁউরুটি কিনেছিলাম তা দিয়েই রাতের খাওয়াতা মেটালাম। কাঁহাতক এই ঘরে বসে থাকা যায় ? বিড়ি ধরিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম । কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরের দিকে যাচ্ছি এমন সময় অন্ধকার থেকে ডাক এলো।

- " কোথায় যাবেন ? নদী পাড় হবেন নাকি ? " ঘুরে দেখি একটি বছর বিশের ছেলে লুঙ্গি গায়ে আমাকে বলছে।

- " আমি ওপারে যাব। " বেশ করুন ভাবে বললাম।

- " তা কার বাড়ি ? "

- " কারও বাড়ি না। আমি যাব সেই হাড়মোড়া গ্রাম। সেখানকার রায় বাড়ি। "

- " নতুন নাকি ? এই সময়ে আপনি হাটভাঙ্গা পেরোতে পারবেন না । তার আগেই ঠ্যাঙ্গাড়েদের পাল্লায় পড়ে মারা পরবেন।

- " চুপ " মুখে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে চুপ করতে বলল । একটু থেমে আবার বলল " মহামারিতে গ্রামের সব লোক একসাথে মারা যায়। মুখে জল দেওয়ারও কেউ ছিল না। পরে সরকারের লোক এসে কোনো মতে টেনে এনে এই নদীর ধারে আধপোড়া পুড়িয়ে যায়। তবে থেকেই ... "

- " এরা সবে আগে মা - মারা গেছে ? " আমার মাথার তখন ঠিক নেই। এসব কি হচ্ছে ?

- " আমিও এই গ্রামেই থাকতাম , এদের সাথেই মারা যাই .. হা হা হা হা হা ... "

- " কি ? " একই .. এই ছেলেটার মুখও এদের মতো হয়ে গেল ...

আমি জ্ঞান হারালাম ....

চোখ যখন খুলল তখন দেখলাম আমি এক নদীর ধারে একটা বড় গাছের তালে শুয়ে আছি । বৃষ্টি নেই আকাশ পরিষ্কার। আমার পাশেই আমার স্যুটকেস , ব্যাগ আর ছাতা পরে আছে । উঠে দাঁড়ানোর পর আমার চোখ ঘাটের একধারে একটা গাছে লাগানো সাইনবোর্ডের দিকে গেল , তাতে লেখা " বড় শ্মশান , হাড়মোড়া গ্রাম "।

- " কি রে ? কি বুঝলি ? " সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অবনীদা আমাদের জিজ্ঞাসা করলো। আমি চমকে যেন অন্য দেশ থেকে ফিরে এলাম। আমার হাতের চা প্রায় পুরোটাই রয়ে গেছে , ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে।

- " আর ওখানে গিয়ে অবশ্য আরও এক ভূতের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা বরং অন্য একদিন শোনাব। আজ উঠি রাত অনেক হলো। " বলে আমাদের বিদায় জানিয়ে চলে গেল অবনীদা । সুনীল আর অনুপও বেরিয়ে গেল। তবে আমার মনে কিন্তু একটা ইচ্ছা রয়ে গেল .. পরের গল্পটা শোনার।

আলোর চিত্র রেখা ২
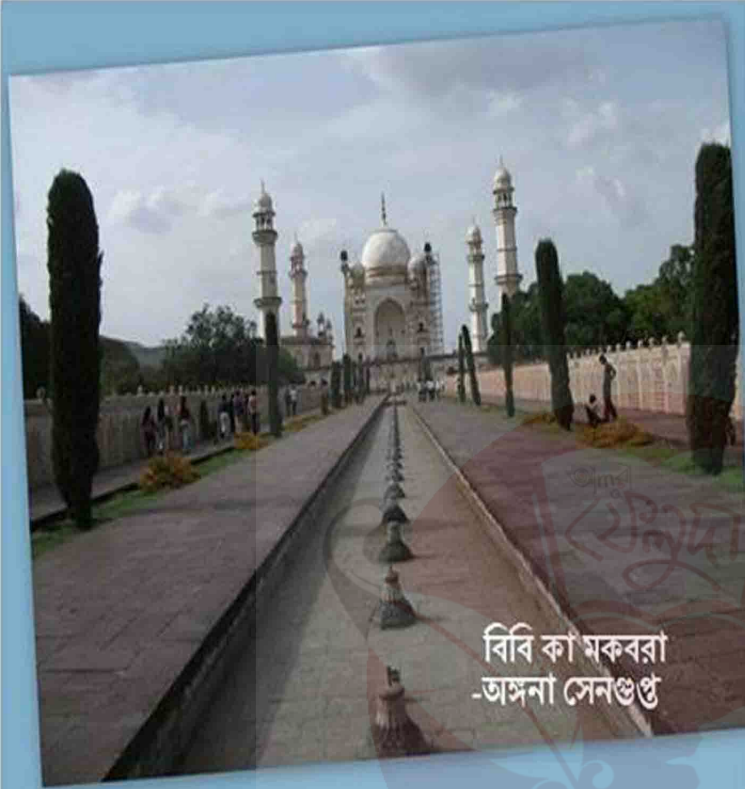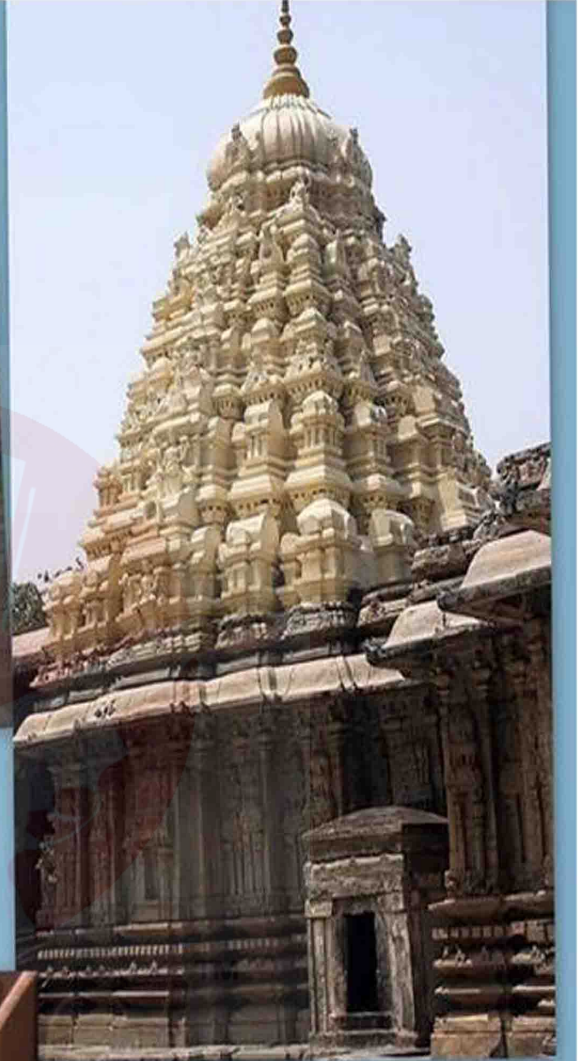
বিবি কা মকবরা
-অঙ্গনা সেনগুপ্ত
তালাক্কার মন্দির
-অদিতি মুখার্জী চক্রবর্তী
সঙ্গী
-শুভদীপ ভট্টাচার্য

ছোট্ট পাখী

অর্ণব দাস মোহান্ত

ছোট্ট পাখী বলত যখন ,
ডানা মেলে উড়ব আমি –
ডাকছে আমায় ওই আকাশ ,
বলত সবাই মুচকি হেসে –
হয়নি বয়স এখনও যে তোর ,
ডানায় বাঁধবি এই বাতাস।
পাখীর তখন দুঃখ হত ,
মুষড়ে পড়ত ছোট্ট মন ,
বুদবুদেরই সঙ্গী হত
আকাশ পরীর তার স্বপন।
সেই পাখীটাই হয়েছে বড় ,
ডানায় হাওয়ার ঝড় তোলে ;
মুচকি হেসে প্রশ্ন করে ,
“ কি গো আমায় গেছো ভুলে ?”
আকাশ তাকায় অবাক চোখে...
এই কি সেই তার ছোট্ট পাখী ,
পালক ঢাকা পূর্ণ দেহ
স্বপ্ন মাখা গভীর আঁখি।

শব্দের জালে ফেলুদা

- সোমা মজুমদার

পা শা পা শি...

১। লখনৌ তে যার প্রাইভেট চিড়িয়াখানা

৫। অম্বর ________________

৬। যেখানে সোনার কেল্লা

৭। পুরী তে রহস্য

৮। _____ শ্বর ঘোষাল, উমানাথ ঘোষালের ঠাকুরদার বাবা

১০। ঘনশ্যাম কর্কটের নাকের সাথে এর মিল আছে

১১। অপু যখন তোপসে

১২। ভুবনেশ্বরের যক্ষীর মাথা যে চুরি করে

উ প র – নি চ...

২। একটি ফেলুদা কাহিনী

৩। প্যারাসাইকোলজিস্ট

৪। ফেলুদার প্রধান শত্রু

৯। মহীতোষ সিংহ রায়ের বন্ধু

১০। পঞ্চান্ন টি গোন

*** স মা ধা ন শে ষে র পা তা য় ...*

ফেলুদা বিভ্রাট

স হে লী রা য়

ফেলুদা না ? যাচ্ছ কোথায় ? দার্জিলিং না রাজস্থান ?
কলকাতাতেই ? তোপসে কোথায় ? একাই যাবে গোরস্থান ?
লালমোহনকে ফোন করেছ ? ফোনটা কি ও ধরছে না ?
হরিপদ ছুটি নিল ? তাই জটায়ু আসছে না ?
এখন সবে ভোর পাঁচটা – এখনই যে চললে !
প্রাণায়াম , যোগব্যায়াম – এরই মধ্যে সেরে নিলে ?
সিধুজ্যাঠার বাড়ির দিকে যাচ্ছ বুঝি এই বেলা ?

– আর একটা প্রশ্ন করলেই খাবি একটা কানমলা।
আমার কত হাইট হবে আর ! – পাঁচ-ছয় কি পাঁচ-সাত ;
ফেলুদার তো সাতাশ বছর – আমার চেয়ে আনেক তফাৎ।
আমায় দেখে ফেলুদা ভাবিস ! – কি আজব তোর ভাবনাটা !
মাথা ভর্তি কি আছে তোর ? বুদ্ধি নেই কি এক ফোঁটা ?
সত্যি যেদিন ফেলুদাকে দেখতে পাবি রাস্তাতে ,
বুঝবি তখন কি জাদু ওই ফেলু মিত্তির নামটাতে।
মগজাস্ত্রের গুঁতো খেয়ে হয়ে যাবি হয়রান –
তখন কি আর কাজে দেবে তোর এইসব প্রশ্নবাণ !

মধ্যবিত্ত কেরানি

- শুভদীপ ভট্টাচার্য

রোজ সকালের মত আজও দিনটা শুরু হলো রজনী বাবুর , ভোর ৬ টায় ঘুম থেকে উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে এক কাপ চা খেয়ে বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে পরা | ৭:৩০ টার মধ্যে বাজার করে ফিরে স্নান করে নাকে মুখে কিছু গুঁজে অফিসে বেরিয়ে পরা | বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কেরানি রজনী বাবু | নিজের বিধান সরণীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ৩৪ নম্বর বাস ধরে সকাল ১০ টার মধ্যে অফিস এ পৌঁছে যান। নিজের বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর একটি ছেলে , বৃদ্ধা মা ও মানসিক ভারসাম্যহীন একটি ভাই আছে | এই ৫২ র বেরঙিন সাদা কালো জীবনে এখন তাঁর চাহিদা বলতে শুধু একটু অবসর , শনি রবিবার ছাড়া সপ্তাহের ৫ দিন ঘড়ি ধরে তার জীবন চলে , রোজ ঘুম থেকে ওঠার সকাল ৬ টার এলার্ম টা শুনলেই এক রাশ হতাশা রজনী বাবুকে গ্রাস করে | ছাপোসা সাধারণ বাঙালি চেহারার সাথে তাঁর জীবনের মিল যথেষ্ট | নিজের পরিবারের

চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য তাঁকে প্রাইভেট একটি টিউশন ও ধরতে হয়েছে , বিকেল ৫ টায় অফিস ছুটি হলেও বাড়ি ফিরতে তাঁর রাত ৯ টা বেজে যায় | তারপর থাকে ভাই ও মার শারীরিক উন্নতি বা অবনতি নিয়ে খোঁজ খবর |

এরমই একদিন অফিস ছুটি হবার পর কিছু সহকর্মীর সাথে আগের রাতে ভারতের খেলা নিয়ে কথা বলতে বলতে অফিসের করিডর দিয়ে বেরোচ্ছিলেন , আজ তাঁকে যেতে হবে সল্টলেক, আগের মাস থেকে নতুন একটি টিউশন ধরেছেন , ছাত্রটি ক্লাস ৮-এ পড়ে | হঠাৎ একটা ফোন , ছাত্রর মা ফোন করে বলল " স্যার আজ আমরা একটু শপিংএ যাব , আপনি পরের সপ্তাহে আসবেন " , ফোনটা রেখে করিডর দিয়ে নেমে বাড়ি ফেরার বাস ধরতে গেলেন রজনী বাবু , হাত দেখিয়ে বাসটার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো " আজ দিন টা একটু অন্য রকম কাটালে কেমন হয় ?? ", দাঁড়িয়ে পড়লেন হাত টা নামিয়ে , কোনো কিছু না ভেবে একটা ট্যাক্সি তে উঠে পড়লেন " প্রিন্সেপ ঘাট চল " | ১০ মিনিটের মধ্যে প্রিন্সেপ ঘাটে নেমে একটা বাদাম ওলার কাছ থেকে ৫ টাকার বাদাম কিনে খেতে খেতে একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন | আজ দিন টা তাঁর নিজের, শেষ কবে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ভুলে গেছেন , শেষ কবে দোকান থেকে ভালো খাবার এনে খেয়েছেন ভুলে গেছেন | কি পাচ্ছেন রোজ এত খাটাখাটনি করে ?? আয় করা সমস্ত টাকা তাঁর চলে যায় ছেলের পড়াশোনা ,ভাই আর মার চিকিৎসায় | তাঁর নিজের কোনো সখ নেই , অথবা বলা ভালো শখ করার মত সামর্থ নেই , সহকর্মীরা অনেকেই সিগারেট খান , তিঁনি নিজেও এককালে খেতেন যখন তার ছেলে ছোট ছিল, এখন ক্লাস বেড়েছে খরচা বেড়েছে, শখ ছাড়তে হয়েছে | কি করেননি প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য? যে বছর কলেজে ভর্তি হলেন সেই বছরেই তাঁর বাবা মারা গেলেন , তাঁর ভাই আর বোন তখন ক্লাস ৯-এ পরে , হঠাৎ পুরো সংসারের দায়িত্বটা তাঁর কাঁচা কাঁধে এসে পড়ল , তাঁর বাবার জমানো টাকা থেকে অভাবের সংসার চালাতে মা হিমশিম খেতেন , নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই যোগার করার জন্য একটি অফিসে কাজ নিলেন , গুদামে মাল ডেলিভারি করে রশিদ লিখিয়ে নিতে হত | পড়াশোনা সাথে হাড় ভাঙ্গা খাটুনি বেশী দিন সহ্য হয়নি, যা হোক করে কলেজ পাস করে নানা সরকারী দপ্তরে ঘোরাঘুরি করার পর এক সুযোগ মিলে যায় চাকরি করার, আর গভর্নমেন্টের রাইটার্সে ঢুকে যান তিনি | বোনের বিয়ে মোটামুটি দিলেও তার ভাই কলেজে পড়ার সময়ই এক এক্সিডেন্টে মানসিক ভাবে আঘাত পান, তিনি আর কোনোদিন সুস্থ হননি |

" কিছু দয়া করুন বাবু " , হঠাৎ চটক লাগে রজনী বাবুর ,পাস ফিরে দেখেন একটা ৫ অথবা ৬ বছরের বাচ্চা ছেলে , গায়ে আধ ছেঁড়া ময়লা জামা ও ছেঁড়া প্যান্ট পরে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে , অন্য সময় হলে হয়তো তাড়িয়ে দিত কিন্তু ছেলেটার চেহারা দেখে একটু মায়া হলো তাঁর ,পকেট থেকে ২ টাকার একটা কয়েন বের করে ছেলেটাকে দিয়ে দিলেন , ছেলেটা একটা সেলাম ঠুকে পেছন ফিরতেই রজনী বাবু বললেন " এই শোন্ " .. " তোর নাম কি রে ? " , " রাজা " , "এই বয়স এ ভিক্ষে করছিস কেন ? ", " কি করব বাবু ? মা যে একা পারে না খাওয়াতে " , " তোর মা কি কাজ করে ? " " খিদিরপুরে আমাদের বস্তির পাসে ১ টা বাড়িতে কাজ করে " , " তুই স্কুলে যাস না ? "

" স্কুল ?? এলাকার দাদাদের টাকা দিতে গিয়েই তো সব শেষ হয়ে যায় , না দিলে যে বস্তিতে থাকতে দেবে না , মা মাঝে মধ্যে ধার করে আনে বাবুদের বাড়ি থেকে , স্কুলে কি করে যাব ? আমাদের বস্তি তে একটা

স্কুল খুলেছিল কিন্তু হিন্দু মুসলিম ঝামেলায় স্কুলটা বন্ধ হয়ে যায় , টাকা দিয়ে স্কুলে পড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই | " , " তোর বাবা কি করে ? " , " বাবা তো আমাদের সাথে থাকে না , মাঝে মধ্যে আসে কিছু টাকা দিয়ে চলে যায় আবার কোথায় , আমি জানি না , মা কে জিজ্ঞেস করলে মা বলে সে ও জানে না " , খুব মায়া হলো ছেলেটার ওপর , এত অল্প বয়সে ভিক্ষা করে খাবার জুটছে ছেলেটার | কম বয়সের ভিখারী তিনি অনেক দেখেছেন এখনও কিন্তু এই ছেলেটার মধ্যে একটা কিছু আছে , খুব অসহায় লাগছিল ছেলেটাকে দেখে , এক সময় তাঁকেও তো চিন্তা করতে হয়েছে কি করে পরের দিনের ভাত হবে বাড়িতে , টাকা নেই পকেটে , কতবার ডালহৌসির অফিস থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরেছেন , এখন তাঁর কিছুটা হয়তো অবস্থা ফিরেছে | নিজের ২০ বছর আগেকার অবস্থা ভেবে আশ্চর্য বোধ করলন তিনি , কত উন্নতি করেছেন তিনি , হ্যাঁ হয়তো এখনও তাঁর অবস্থা খুব একটা ভালো নয় , নিম্ন মধ্যবিত্তই তাকে বলা যায় , কিন্তু তাও , একটা ফার্স্ট ইয়ারের কলেজ ছাত্র যে ভবে জীবনটার সাথে লড়াই করে জিতলো সেটা সত্যি একটি বিস্ময় তাঁর কাছে | টাকা তো অনেক মানুষের কাছেই থাকে , কিন্তু আজ তাঁর যা কিছু আছে , তিনি সগর্বে বলতে পারবেন এগুলো সবই তাঁর নিজের করা , নিজের কৃতিত্ব | ছেলেটাকে মন ভরে আশির্বাদ করলেন রজনী বাবু , পকেট থেকে সামর্থ্য মত একটি ১০০ টাকা দিয়ে বললেন " যা আজ তোর আর তোর মার জন্য ভালো কিছু খাবার নিয়ে যা, আর প্রতি সপ্তাহে আমি এখানে আসব , তোকে পড়াব, ভালো করে পড়াশোনা শিখে একদিন মস্ত বড় মানুষ হবি তুই | ", ছেলেটো টাকাটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দেখল , এত টাকা তার কোনো দিন হয়নি ভিক্ষা করে , সম্মোহিতর মত ঘর নেড়ে সে বলল সে পড়াশোনা শিখবে , প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে সে এসে শিখে যাবে পড়াশোনা |

সন্ধে ৬:৩০ বেজে গেছে ঘড়িতে , রজনী বাবু একটা কিছু করার অনুভূতি টের পাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে , এত দিন তিনি যা যা করেছেন সবই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে , আজ যা করলেন সেটা নিজের জন্য , নিজের ইচ্ছেতে , আজ কেউ তাঁকে জোর করেনি , একটা ছোট ছেলেকে তিনি জীবনের স্বাদ দিতে চলেছেন |

তাঁর মত খেটে খাওয়া মানুষ হাজারে হাজারে আছে যারা রোজ ভিড়ে উপচে পরা বাসে উঠে অফিস যায় , হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর বাড়িতে ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস নেয় | নাহ আজ দিনটা আলাদা , আজ তিনি জীবনের থেকে অনেক কিছু শিখলেন , এত দিনের অভিযোগপূর্ণ জীবনটা তার কাছে হটাৎ খুব আকর্ষক হয়ে উঠলো , " রে ছেলেটা কে যে বড় করতে হবে ভালো মত পড়াশোনা শিখিয়ে .. " বাড়িতে ভাইটার জন্য অনেক দিন ভালো খাবার নিয়ে যাননি , আজ নিয়ে যেতে হবে , তাঁর মা পাড়ার মোড়ে র তেলেভাজা খেতে খুব ভালবাসেন , আজ নিয়ে যাবেন বাড়িতে , ছোট ছেলেটার জন্য ১ প্যাকেট মোমো কিনতে হবে , আর তাঁর আর তাঁর স্ত্রীর জন্য একটা করে রোল | অনেক দিন পর নিজের দায়িত্বটাকে উপভোগ করতে লাগলেন তিনি | জীবনটা হোক না একটু আলাদা , ক্ষতি কি ?? বাঁচা মরা তো থাকবেই , এর মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে বাঁচার আনন্দকে , সেটাই তো বাঁচার রসদ , খুশী মনে সামনের বিহারী দোকানদারটার দিকে চেয়ে বললেন " একটা সিগারেট দাও তো.."
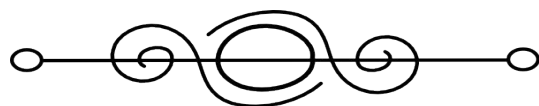
ভার্মিলিয়ন

অনুরাধা সরকার

সূয্যিমামার মুখ আঁকতে ভার্মিলিয়ন লাগত ......
খাতার পাতা জুড়ে তখন থাকত শুধু ওই মুখটাই ,
এখন সেটা ছোট হতে হতে তার -
কপালে এসে ঠাঁই পেয়েছে। এরপর আলতো ছোঁয়া
মাথার মাঝবরাবর ...... চেহারা পালটে যায় ...
অনেকদিনের চেনা রাস্তার মতো ...... ।
বিদেশ কত দূরে ? মাপতে হবে তাকে।
এখন তো বড় ,মাঝারি , রাস্তাগেলা খেয়াল রাখেত হয় ,
মানিচেত্র ধরা পেড় না ... ওরা অনামি।
এটা প্রবাস নয় একথা জানা ...
তবুও সকালে উঠে অচেনা বাতাস , কোনও এক নাম না জানা
ফুলের গন্ধ মস্তিষ্কে আসে ... ।
বেচারা তখন তার ধূসর খাতায় টুকে রেখে দেয়
চেনা অচেনার লিস্টি ... ।
এ দেশের কি নাম ? ... এই কাঁটাতারের বেড়াটা ঠিক কোথায় গিয়ে শেষ ?
খোঁজা বন্ধ হয় একদিন ... ভার্মিলিয়ন পুরনো হতে থাকে ...
বিদেশ আর বিদেশ থাকেনা তখন ... ।

সঙ্গে সন্দীপ রায়

- আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

"ফেলুদা ও তার সঙ্গীদের আর প্রফেসর শঙ্কু-র প্রতি আমার তরফ থেকে একটি ছোট শ্রদ্ধার্ঘ... জয় বাবা ফেলুনাথ!"

প্রিয় পাঠক -বন্ধুরা ,

আমি তোপ্‌সে | হ্যাঁগো, সেই তপেশ রঞ্জন মিত্র | আমার জ্যাঠতুতো দাদা ফেলুদা আর আমাদের সব থেকে কাছের বন্ধু "রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদিপাশে যাহা বিধিলে মরণ" ওরফে জটায়ু| তবে একটা মুশকিল হয়েছে , এই ক -বছর আগেও আমরা তিনজন নানান রকমের নতুন নতুন এডভেঞ্চারে যেতাম , তবে এখন আর যাই -ই না !

কারণ ফেলুদা এখন ঘরে ওর আর্ম চেয়ার-এ বসে বসেই রহস্যের সমাধান করে ফেলে !(অনেকটা Miss Marple এর মত) তাছাড়া কাগজ পড়ে | আর ডায়েরি লেখে | না না ! সেই গ্রিক হরফে নয় ! ওই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে ফেলুদা ওর লেখার টাইপ টা চেঞ্জ করে নিয়েছে | ফেলুদা সেটা কাউকে বলতেও বারণ করেছে ! এছাড়া ওর একটা ডেস্কটপ আছে | মাঝে মধ্যে ওটাতে ইন্টারনেট চেক করে | অবিশ্যি আমিও করি ! আমার কাছে এখন একটা ট্যাবলেট আছে, তাতেই সমস্ত কিছু পেয়ে যাই ! না না , ভুল বললাম , সমস্ত পাই না .. কোনও একটা সাবজেক্ট এর সমস্ত keywords -এর লিস্ট ফেলুদাই দরকার মত বলে দেয় (ট্যাব কিন্তু সেটা পারেনা !) আমি মাথা খোলা রাখবার জন্য ট্যাব এ চেস খেলি | পাশাপাশি একটা Forensic Department খুলেছি | তবে আমাদের এজেন্সী তে যেসব কেসগুলো আসে , সবই কিরকম নতুন নতুন ,অদ্ভুত অদ্ভুত । সেগুলোর সঙ্গে ফেলুদার সেই পুরনো কেসগুলোর বিন্দুমাত্র মিল নেই ! ফেলুদা তো তাই বলছিল , "এখন ক্রাইমগুলো সবই পাল্টে গেছে ! চোর আর সেকেলে চোর নয় , খুনের ধাঁচ কিরকম পাল্টে গেছে , এ এক নতুন যুগ !"

লালমোহন বাবু র বইও এখন আর হাতে লিখতে হয় না ! ওনার কাছে বেশ ভালো কোয়ালিটি-র কীবোর্ড , স্ক্যানার , প্রিন্টার আর ডেস্কটপ আছে | ওনার বই এখন Scribd, Flipkart, Amazon এমনকি "Kobo"- আর "Kindle"-এর সাইটেও কিনতে পাওয়া যায় !! জটায়ু -র গোয়েন্দা প্রখর রুদ্র এখন অনেকটা "আয়রন -ম্যান" -এর মতন হয়ে গেছে | তার কাছে নাকি একরকম অদ্ভুত কস্টিউম আছে যেটা পড়লে গায়ে গুলি , বোমা, মিসাইল এসে লাগলেও হিরো -র কিস্স্যুটি হবেনা | এক আশ্চর্য গাড়িও

আছে নাকি তার! যেটা Speedboat ,Submarine, Jetplane আবার কখনো রকেট পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে!!! ফেলুদা ওনাকে নিয়ে একটা নতুন ছড়া লিখেছে দেখলাম Microsoft Word 2012 -এ! ছড়াটা অনেকটা এইরকম—

"বুঝে দেখো জটায়ুর টাইপ-এর জোর,

ঘুরে গেছে mystery স্টোরি-র মোড়,

প্রখর-এর Investigation,

ইচ্ছে মতো পেরোয় Pacific Ocean,

অদ্ভুত এক গাড়ি তার,

বদলায় যার অবতার!

বুঝে দেখো জটায়ুর টাইপ-এর জোর!"

তবে ফেলুদা পুরনো স্মৃতি আগলেই বসে থাকে না! স্মৃতি-র মধ্যে ফেলুদার থমকে থাকাটা বড়ই কষ্টকর.... ও এখনকার ক্রাইম কেস এর জটও ছাড়ায় ! এই তো সেদিন, কালো বুট জুতোর মধ্যে স্পাই ক্যামেরা আটকানো ছিল.. খুনটা হবার সময় বুটটা সেই ঘরেই রাখা ছিল| তবে ফেলুদা কি দারুণভাবে আরামে ঘরে বসেই এই জটিল রহস্যের কিনারা করে ফেলল!!

আর জানো, ফেলুদা এখনো আগের মতো ব্যায়াম করে| ও ইউটিয়ুব থেকে "ইওগা লেসন" এর ভিডিও নামিয়ে নিয়েছে! আমি জিগ্যেস করলাম, "ফেলুদা, ব্যায়াম এর তো তুমি সবই জানো, আবার ভিডিও লেসন-এর কি দরকার?"

ফেলুদা বলল, "না রে, এখন অনেক নতুন নতুন ব্যায়াম এসেছে যেগুলো আমি জানতাম ই না,যেমন ধর ওই Aerobics!"

ওর শরীর তাই এখনও বেশ আগের মতই তাজা এবং ফিট আছে|

এবারে বলি সিধু জ্যাঠা র কথা| সিধু জ্যাঠাকে মনে আছে নিশ্চইয়ই তোমাদের? ফেলুদা-র Mycroft Holmes! তবে ফেলুদা Internet use করা সত্তেও মাঝে-সাঝে-ই wisdom এর সন্ধানে জ্যাঠা-র কাছে যায়|

ওনার বয়স হিসেব মতো এখন ১০০। অবাক হচ্ছ, না?

জ্যাঠা-র দীর্ঘ বয়স বেঁচে থাকবার একমাত্র কারণ হলো মিরাকিউরাল| আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রফেসর শঙ্কু-র আবিষ্কৃত! আমিই এনে দিয়েছি জ্যাঠা-র জন্যে |জানো , আমাদের Forensic Department এ প্রফেসর শঙ্কু কেমিস্ট এর দায়িত্বে আছেন| ২ মাস হল উনি মঙ্গল গ্রহ থেকে ফিরেছেন,নিউটন,প্রহ্লাদ-ও সঙ্গে আছে এখানে| Rocket টাকে নাকি আবার ঠিক করতে হয়েছে অনেক কষ্ট করে| উনি এসে নানা ভাবেই আমাদের হেল্প করেন এখন |ফেলুদা-ই বলল যে, "দেখ তোপ্‌সে, সিধু জ্যাঠা কে সুস্থ রাখতেই হবে! ইন্টারনেট এসে গেলেও ওনার প্রয়োজন কোনদিনই ফুরোবে না| এমন অনেক তথ্য জ্যাঠা-র সংগ্রহে আছে যেটা তোর ওই গুগল-এর কাছে নেই!"

সত্যি, ভুল কিছু বলেনি ফেলুদা, তাই না?

এবার বলি একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে| বিষয়টা হলো এই 2013 সালের ক্রাইম এর ধাঁচ| Rapid চেঞ্জটাই অদ্ভুত! আগের মতন মক্কেলরাও বেশি বাড়িতে আসেন না| Webcam-এ যোগাযোগ করে নেন ! ওদিকে তৈরী হয়েছে একরকমের অদ্ভুত চোর যার নাম হলো "Hacker"! তারা ওয়েবসাইট বা কারোর প্রোফাইল হ্যাক করে তার সমস্ত তথ্য বার করে ন্যায় ! এই তো সেদিন আমাদের এজেন্সী তে একটা হ্যাকিং-এর কেস এসেছিল| আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর-এর একটা ভাঙ্গা পুরনো গ্যারেজ এ

বসে কোল্ড ড্রিংক খেতে খেতে NASA-র ওয়েবসাইট হ্যাক করে দিয়েছে একজন ২৩ বছরের ছেলে, নাম ম্যাক ডিউক। আমাদের এজেন্সী র দুজন এজেন্ট নিউ ইয়র্ক গিয়ে ছেলেটাকে ধরেওছে!

আর তৈরী হচ্ছে হাজার হাজার Fake প্রোফাইল , সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট গুলোয়! তারা একটা হিজিবিজি URL পোস্ট করছে| আমরা কেউ কৌতুহল বসত সেটা খুললেই আমাদের কম্পিউটার এ ম্যালওয়্যার, Spyware-এর মতন আরো নানান রকমের ভাইরাস ঢুকে যাচ্ছে!

এইসব বিষয় নিয়েই সেদিন আমরা 3 musketeers আর প্রফেসর শঙ্কু সিধু-জ্যাঠা র কাছে আলোচনা করছিলাম| ফেলুদা তাই আমায় বলছিল, "দ্যাখ তোপ্‌সে, Facebook-এর মতন সাইট গুলোয় থাকিস না! একদম গন্ডগোলের সব! নিজের ভালো চাস তো De-activate করে দিস!"

আমি অবিশ্যি De-activate করিনি| কারণ তোমরা তো জানই যে Facebook এ আমার, ফেলুদার আর লালমোহন বাবুর প্রচুর ফ্যান-স, মানে ভক্তবৃন্দ আছে! আমাদের নিয়ে কত পেজ, গ্রুপ, এমনকি প্রোফাইল পর্যন্ত খোলা হচ্ছে!! তাই ওগুলোই মাঝে মাঝে খুলে খুলে দেখি, এই একটু স্মৃতিচারণ হয়!

এবার একটু অন্যদিকে আসছি। বাধ্য হয়েই আসতে হচ্ছে, কারণ এনার সম্পর্কে না বললে আমার এই লেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে! তিনি হলেন আমাদের লালমোহন গাঙ্গুলী! জটায়ুর নতুন বইও বেরিয়েছে ২০১২-র পুজোয় - "কলকাতাতে তুলকালাম"। বই-এর কভার এর নিচে আবার লেখা CALCUTTA PANDIMONIUM-BY JOTAYU. বাংলা ছাড়া আরও ৩ টে ভাষাতে এই বই অনুবাদ করা হয়েছে!!

এই বইটা প্রখর রুদ্র-র কলকাতা এডভেঞ্চার নিয়ে লেখা। এবারের ভিলেন এর নাম ঘনশ্যাম দাস নয়, তার নাম বঙ্কুবাবু , একটা বড় ব্যাঙ্ক এর হেড| তিনি নাকি আবার সাধারণ মানুষের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করেন! সেই চুরি করার ব্যাপারটাই রুখতে ছুটে যায় প্রখর রুদ্র! এছাড়া লালমোহনবাবু কলকাতার এখনকার হাল-চাল, কত খুন খারাপি রাহাজানি বেড়েছে, এইসব নিয়েও বলেছেন বিস্তর। উনি আমাকে বলছিলেন যে, "ভাই তপেশ, আমার এবারেও চার-পাঁচ টা ভুল হয়েছিল গল্পতে| কিন্তু আর ফেলুবাবু নন, Encyclopedia Britanica ২০১২ ডেস্কটপ এ নিয়ে তারপর সব শুধরে নিলুম!"

ফেলুদা-র বইটি পড়ে বেশ ভালো লেগেছে, Prof.শঙ্কু-ও পড়ে প্রশংসা করেছেন| ফেলুদা তাই একদিন জিগ্গেস করলো, "তা লালমোহনবাবু, হঠাৎ এরকম বই?"

জটায়ু তার নিজের ভাষায় উত্তর দিলেন, "দেখুন মহাই , কতকিছু ঘটচে কলকাতায়, আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব নিকি?? তখনকার আর এখনকার কলকাতার মধ্যে বেশ অনেকটা তফাত, যাকে বলে বিশাল gap ! আরো কত ব্যাপার বদলেচে এখানে, সেকি গুনিচি নিকি?"

ওদিকে আবার তিনি তার পুরনো সবুজ Ambassador কে বিদায় জানিয়ে একটা নতুন Black Wagner কিনেছেন। তবে হরিপদ বাবু-ই রয়েছেন, ওনাকে তো রেখে দিতে হয়েছেই! ফেলুদা বলছিল যে, "হরিপদ বাবুর মতন মানুষ হয় না!" লালমোহনবাবুর এক-একটা বই এখন $50 তে বিক্রি হয় ইন্টারনেটের বড় বড় সাইট গুলোয়।

প্রফেসর শঙ্কু বইটা পড়ে খুশি হয়ে ওনাকে একটা Kindle ই-রিডার উপহার দিয়েছেন|

প্রফেসর বলছিলেন, "আর পাতা উল্টে বই পড়তে হবে না, এখন ফ্রি ডাউনলোড করে নিন এখেনে আর পড়ুন! এখন সবই গ্যাজেট-এ!"

লালমোহনবাবু তো মহা খুশি|

এবার একটু গল্পের মতন করেই আমার পরশু দিনের সকালটা তোমাদের বলব|

সকাল ৯ -০০ টা । আমি Dan Brown এর Da Vinci Code বইটা ট্যাব এ বেশ মনোযোগ দিয়ে পরছিলাম| Last Supper ছবিটা ছাড়াও খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানছিলাম বইটা থেকে| Symbologist Robert Langdon কে বেশ লাগে আমার প্রতিবার-ই... তবে এবারে Cryptologist Sophie Neveu কে আরও বেশি ভালো লেগেছে, কারণ তার ভূমিকা এই বই-এ বেশি...কিন্তু ফেলুদা -র "তোপ্‌সে" চিৎকার শুনে ট্যাব রেখে আর Prof .Langdon কে ফেলে ই উঠতে হলো ।

গিয়ে দেখি ফেলুদা ডেস্কটপ খুলে কি যেন করছে|

গিয়ে বললাম, "কি বল ফেলুদা ?"

ফেলুদা আমার দিকে ফিরে একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল, "জানিস, ব্রাসেলস-এর একটা ব্যাঙ্কে পুলিশ অফিসার সেজে হাতে বিশাল Law -80 নিয়ে ঢুকে গিয়ে প্রায় US$50 হাজার ডলার চুরি করেছে!

আমি বললাম, "ব্যাঙ্কে? কেউ বুঝতে পারেনি?"

ফেলুদা হেসে বলল, "বোঝার কারোর সাধ্যি আছে নাকি? মুখে দামী প্লাস্টিক সার্জারী করিয়ে এলে কি আর তাদের চেনা যায়? "

আমি বললাম, "ব্যাস ,এটাই বলার ছিল? "

ফেলুদা একটা স্মোক রিং ছেড়ে বলল, "না, এখানেই শেষ নয় রে তোপ্‌সে! আরও একটা খবর আছে|

লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন সেনেট্ মেম্বার এর বাড়িতে ডাকাতি! বাড়ি তে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার বাদে সব নিয়ে সাফ সুত্র করে দিয়ে গেছেন বাবাজি !"

আমি বললাম, "কেউ বাড়িতে ছিলেননা? "

ফেলুদা সিগারেটটাকে অ্যাস্ট্রেতে পিষে দিয়ে বলল, "আরে নারে! সেনেট্ এর মেম্বার, বুঝছিস না? বউ আর মেয়েকে নিয়ে মল-এ শপিং করতে গেসলেন!"

আমি বললাম, "কিভাবে চুরিটা হলো গো ফেলুদা?"

--"আন্দাজ কর দেখি| প্রতিষ্ঠিত Forensic Department এর মালিক যখন ---

--"লেসার রে কি ফেলুদা? ওটারই এখন চল বেশি!"

ফেলুদা পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, "ব্রাভো! আলমারি দরজা সব "রে" দিয়ে কেটে চুরি করেছে, ভাবতে পারছিস! "

আমি মনে মনে এইসব নিয়েই ভাবছি , হঠাৎ ফেলুদার এক অদ্ভুত প্রশ্ন।

---"মেড ইন চায়না , আরেকটি দুর্ধর্ষ ক্রাইম! "

আমি অবাক হয়ে গেলাম, "কি বলছ কি তুমি? মেড ইন চায়না, কিরকম ক্রাইম? "

ফেলুদা হেসে আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, "আরে বোকা, জানিস না? বাচ্চাদের সবক'টা খেলনা এখন মেড ইন চায়না! খেলনাগুলো ভীষন toxic , ভেতরে Cadmium বলে এক ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানো থাকে, সেই খেলনাগুলোকে

নিয়ে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা সারাক্ষণ থাকে! এতে তাদের ব্রেনটা আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে যায়,বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পরে! তাহলে যারা এগুলো বানাচ্ছেন, তারা ক্রিমিনাল নন?"

ফেলুদা আর কিছু বলল না, ওর কম্পিউটারে একটা বই পড়তে শুরু করলো।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল |আজকাল কেন যে এত ক্রাইম বেড়ে গাছে, যে আমাদের 3 musketeers সহ প্রফেসর শঙ্কু আর সিধু জ্যাঠাকেও চমকে দিচ্ছে! আর পারলাম না| ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন করেই ফেললাম—

---"ক্রাইম কেন এত্ত বেড়ে গেছে গো ফেলুদা?"

ফেলুদা বই পড়া থামালো না। বলল ---

"বড়লোক গরিব লোকের মধ্যে যতই তফাত বাড়বে, তত বেশি ক্রাইম হবে। তবে শুধু গরিবরাই ক্রিমিনাল নন| বড়লোকেরা হচ্ছেন জন্মসুত্রে ক্রিমিনাল! কারণ ওরা প্যারাসাইট, পরজীবী। গরিবের শ্রম শুষে নিয়ে নিজেদের পেট ভরান ! এখন আসলে এই ব্যাপারটাই বেড়েছে। তাই ---"

আমি মাথা নিচু করে নিলাম। ফেলুদা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল ---

------"আমাদের ছোটবেলায় একটা ওয়্যারলেস জোগাড় করার উপায় ছিলনা! লাইসেন্স লাগত,নাহলেই হাতে হাতকড়া! আর এখন, সবার হাতে মোবাইল,ট্যাবলেট,আইফোন বা স্মার্টফোন| এই মডার্ন ওয়্যারলেসের জন্য আজকাল কত ক্রাইম বেড়ে গেছে! তাছাড়া আরেক ধরনের ক্রিমিনাল হয়, বুঝলি তোপ্সে? যাকে নিয়ে এবার খুব ভালো একটা গল্প লিখেছেন আমাদের জটায়ু! গ্যাংস্টার-এর মতই তৈরী হয়েছেন Bankster-রা! এরা আবার মানুষের রক্ত কেন হাড়গোর পর্যন্ত কামড়ে শুষে ছিবড়ে করে খান! এই bankster দের নিয়েই যৌথ গবেষণা করছি আমি আর তোর সিধু জ্যাঠা মিলে| জ্যাঠা বলছিলেন যে, "এই bankster রা সবথেকে বদমাস, বুঝলে ফেলুচাঁদ! এই ক-বছর ধরে ব্যাটারা খুব রাজত্ব চালাচ্ছে! এদের সেপ্টপাস-এর মুখে ফেলে দেওয়া দরকার, Vampires!" প্রফেসর হিজিবিজবিজ একটা চিঠি-তে আমায় বলেছিলেন যে " একদিন Bankster গুলোর গলাটা কেটে ছাগল এর গলায় বসিয়ে দেব আমি!"

ফেলুদা আর কিছু বলল না, আবার পড়তে শুরু করলো|

আমি আমার ঘরে চলে এলাম। হঠাৎ ট্যাব এ আমার রিংটোনটা বেজে উঠলো|

"বুদ্ধি আমার শানিয়ে নেওয়া , কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না,

এদিক ওদিক বেড়ায় তবু ভুলের পাড়া বেড়ায় না....."

গিয়ে ফোনটা তুললাম|

ওপার থেকে ---"ভায়া তপেশ?"

--"হ্যাঁ।কে—লালমোহনবাবু বলছেন?"

--"হুম…আমি।"

---"তা হঠাৎ এই অচেনা নম্বরে? বুথ এ ঢুকেছেন?"

--"ধরেছ ঠিক! তোমাদের বাড়ি আসছিলাম, হঠাৎ একটা দোকান দেখতে পেলাম!"

--"কি , খাই –খাই ? "

--" ধুর ! Damn your খাই খাই !! ওসব back -dated ! নতুন একটা দোকান খুলেছে তোমাদের রজনী সেন-এ। BAKE CLUB। আনব নাকি ভায়া? স্বাস্থ্যের পক্ষেও হয়ত ভালো ..খেতেও সুস্বাদু ! "

আমি চমকে গেলাম| হেসে বললাম , "ওতো খেয়েছি আমি। তবে ফেলুদা খায়নি। নিয়ে আসুন !! "

---"okkkk "। ফোন টা কেটে দিলেন|

শ্রীনাথদাকে চেঁচিয়ে বলে দিলাম। "শ্রীনাথদা, তিনটে চা"!

পুরো ব্যাপারটা ফেলুদাকে গিয়ে বললাম।

ফেলুদা আনন্দে বলল , "প্রায় ১ মাস বাদে আসছেন| আবার Bake Club! না ,মাসে এক –দু'বার জাঙ্ক ফুড খেলে কোনও ব্যাপার নয় ! নিশ্চয়ই এসবের পিছনে কোনো কারণ আছে ! মনেহয় ওনার লেখার সামারি টা ------"

বেল বাজলো| গিয়ে আমি দরজা খুললাম|

--"GOOD MORNING তপেশ ভাই এন্ড ফেলুবাবু "!

---"মর্নিং , আসুন ! "

----"একটা বিগ প্লেট ! ওরা গরম করেই দিয়েছে মাইক্রোওয়েভ -এ ! তুরন্ত ! এই নাও —কুইক !

আমি গিয়ে শ্রীনাথদার কাছ থেকে একটা প্লেট নিয়ে এলাম| সঙ্গে তিন কাপ চা|

লালমোহনবাবু তিনটে চিকেন গার্লিক কাবাব বার করলেন|

আমি কাবাব -এর প্রথম মাংস-টায় কামোড় দিতেই লালমোহন বাবুর প্রশ্ন -

"কেমন ..মানে ..কোয়ালিটি --?"

ফেলুদা খানিক খেয়ে নিয়ে তারপর বলল , "বেশ করেছে ! এনিওয়ে , তা আপনার গল্পটা এবারে কি নিয়ে "?

লালমোহনবাবু থ হয়ে গেলেন|

---" ওমা …হ্যা ..মানে ..ওই এবারে গল্পটা আমি লিকচি জাপান নিয়ে| পৃথিবীর গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর চোটে জাপান এর অবস্থা খারাপ| সেই খারাপ অবস্থায় প্রখর রুদ্র গিয়ে সবাইকে বাচাচ্ছে , আর কিভাবে পৃথিবীকে বাঁচানো যায় সেই নিয়েও খুব ভাবছে --- চেষ্টা চালাচ্ছে আমার হিরো!"

ফেলুদা বলল , "হমমম … বাঃ …বেশ ভালো আইডিয়া …তবে প্রখর রুদ্র এবারে ঠিক detective নন , rescuer !"

জটায়ু বললেন ," হে ..হে …আজ্ঞে…"

ফেলুদা বলল , "কিন্তু এবার তো এই নিয়ে আমাদের সত্যি সত্যি ভাবতে হবে ! "

লালমোহনবাবু বললেন , "তা বটে …গল্পকে সত্যি তে বদলাতে হবে ..বাঁচাতে হবে আমাদের বিশ্বকে ! "

ফেলুদা বলল, "কিভাবে বাঁচানো যায় বলুন তো? উপায় খুঁজে বার করুন! Anthopogenic গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর চোটে পৃথিবী-র axis বেঁকে যাচ্ছে... হয়ত প্রফেসর শঙ্কু এই বিষয়ে আমাদের বেশ অনেকটাই ----

বেল বেজে উঠলো| আমি গিয়ে দরজা খুললাম| বাইরে দেখি প্রফেসর শঙ্কু|

---" জানেন ফেলুবাবু—"

ফেলুদা বলল, "আরে, প্রফেসর …আপনি?! এইমাত্র আপনার কথা বলছিলাম! আছে,আছে! আমাদের টেলিপ্যাথি -র জোর আছে! হ্যাঁ.. তা বলুন কি ব্যাপার?"

আমি চেঁচিয়ে বললাম,"শ্রীনাথ দা,একটা ব্ল্যাক কফি!"

লালমোহনবাবু দেখি আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন| কেন হাসছেন সেটাও বুঝলাম| ওনার এক্সপ্রেশনটা হলো এইরকম, "ভাগ্যিস আমাদের কাবাব সবে শেষ হয়ে গ্যাছে! নইলে... —হে হে হে"

প্রফেসর বললেন, "জানেন মশাই - আজ কাগজে মগনলাল কে নিয়ে খবর বেরিয়েছে।"

আমি বললাম, "মানে আমাদের তিন এডভেঞ্চারের সেই দুঃসাহসী ভিলেন?"

লালমোহনবাবু বললেন, "উফ! প্রত্যেকবারই ও আমাকে নিয়ে কত্ত তামাসা-ই না করেছে! ভুলব কোনদিন?"

প্রফেসর শঙ্কু বলতে থাকলেন ---

"আজ আনন্দবাজার,প্রতিদিন,Times of India, Indian Express সবেতেই বেরিয়েছে খবরটা| মগনলাল এর ফাঁসি হবে| এখন জেলেই রয়েছে, তবে আমার মতে ওরকম ক্রিমিনালকে তো Anahilin পিস্তল অথবা ইলেকট্রিক গান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া উচিৎ!"

লালমোহনবাবু "ফিক" করে হেসে বললেন, "হে হে! নানা, Snuff গানই ভালো বাবা! খুন খারাপি ভালো লাগেনা!"

আমার মনে হলো যে এই সাদামাটা অহিংস্র ভদ্রলোকই লোমহর্ষক রহস্য কাহিনী লেখেন!

শ্রীনাথদা কফি দিয়ে গেল|

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল—"হুম….শুনেছি ওর দলে নাকি একজন মার্কিন সায়েন্টিস্ট-ও জুটেছিল| তার সম্বন্ধে …যদি কিছু আলোকপাত করেন!"
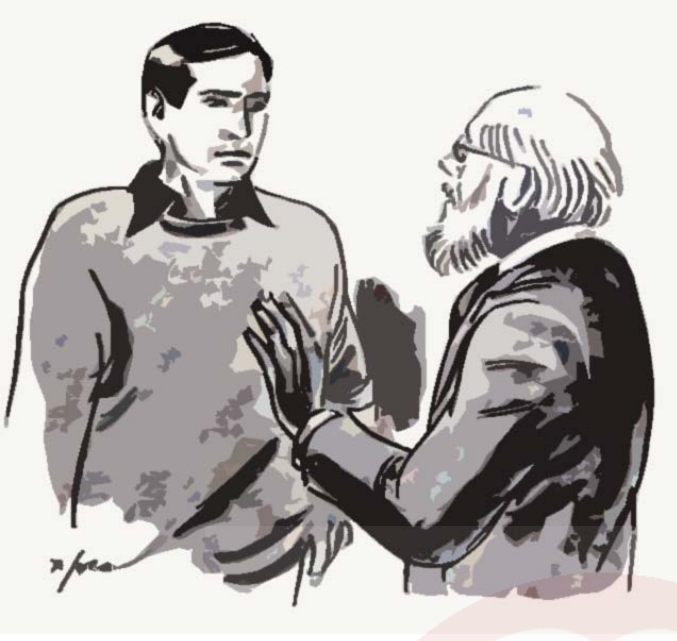
প্রফেসর শঙ্কু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ…ও ভয়ংকর সব ফ্লুইড বানায় যেগুলো দেখে জল বলেই মনে হবে কিন্তু খেলেই ১ সেকেন্ডে মৃত্যু ! আরো কত অস্ত্র-শস্ত্র বানায় ও| একটা অস্ত্র আবিষ্কার করেছে যেটাতে গুলি ,বোমা ,ছুরি সব একসাথেই আছে| সেই যন্ত্রকে হাতের সঙ্গে attach -ও করে নেওয়া যায় ! আরও আবিষ্কার করেছিল ও| কিন্তু সবই মারণাস্ত্র ! Spiderman-2 এর ওই ভিলেন তা যেরকম লোহার চারটে হাত পরত ,ওটাও বানিয়েছিল| তবে এই সবই ও তৈরী করত মগনলাল মেঘরাজ এর কথায়...লাইক আলাদিন এন্ড জিন দৈত্য !"

এই সবকিছুর মধ্যে আমরা তিনজন আর সিধু জ্যাঠা, প্রফেসর শঙ্কুর মতোই ভালো নেই ! আমাদের মনটা খারাপ, সবসময়ই অন্য একটা ব্যাপার মাথার মধ্যে ঘরে ! এই পৃথিবী-র Global Warming এ যা অবস্থা হয়েছে তা তোমরা তো জানই| বরফ কিরকম তাড়াতাড়ি গলে যাচ্ছে…প্রফেসর শঙ্কু তো বলছিলেন যে "সবাই মাইল আমার রকেটে চেপে মঙ্গল অথবা চাঁদে চলুন ! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে যেতে হবে…এভাবে যে আর চলছেনা !"

প্রফেসর একটা নতুন গ্যাজেট বানাচ্ছেন, এমন একটি যন্ত্র যেটির সাহায্যে (মানে যন্ত্রটির একটি switch চালু করলে)এক মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের গাড়ি, A .C. মেশিন, Fridge etc. etc . মানে যা যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটাচ্ছে সেই সেই যন্ত্র গুলিকে ভ্যানিশ করে দিতে পারে.. তখন আর কোনদিনও সেসব জিনিসের কোনও তথ্য পাওয়া যাবেনা..they will not exist forever...! এমনকি যেসব Industry আছে বড় বড়, সেগুলিকেও পাওয়া যাবেনা...প্রফেসর বলছেন যে এই মেশিনটি বানাতে তাকে নাকি অনেকবার বিদেশ যেতে হবে..ইতিমধ্যেই ৬ বার আমেরিকা ঘুরে রিসার্চ করেই এসছেন।

কিন্তু বন্ধুরা, এই ব্যাপারের কথা আমাদের প্রিয় লীলা দিদা হাওয়ার দাঁড়ি- তে কতদিন আগেই বলে দিয়ে গেছিলেন ! সেই কয়েকটা লাইন মনে পড়ে কি তোমাদের ? ভালো করে পড়ে দেখো, আমাদের এখন পৃথিবীতে যা যা ঘটছে…সব লেখা আছে এই কয়েকটা লাইন এ -------

"কিন্তু বুড়োর কি রাগ ! যাবে না তো কি করবে ? তোদের জ্বালায় পৃথিবী চুপসে যাচ্ছে, ফোপরা হচ্ছে ,কোনদিন না হিমালয় পাহাড় টোল খেয়ে ভিতরে ঢুকে যায় ! অমনি বরফ গলে ভুস ভুস করে সারা দেশের উপর দিয়ে বান ডেকে যাবে ,সব চ্যাপ্টা একাকার সমুদ্দুর হয়ে যাবে ! তার মধ্যে থেকে গ্যাসগুলো উপে যাবে ! আমি অঙ্ক কষে স্পষ্ট এসব দেখতে পাচ্ছি, আর তোরা যে দিনে রাতে কয়লা তুলছিস ,তেল তুলছিস ,নলে করে গ্যাস চালান দিচ্ছিস ,জালাচ্ছিস ,পোড়াচ্ছিস ! সব খেয়ে পরে শেষ করছিস ! এ নিয়ে ভেবেছিস কখনো ?---??"

Top scientist offers way out of global warming

Nobel Laureate's 'Escape Route': Alter The Chemical Makeup Of Exosphere

Warming unstoppable

CLIMATE CHANGE

Global warming projection

CO_2 level at 800,000-year high

Study Of Antarctica Ice Suggests The Increase Will Alter The Climate Dangerously

Global 'sunscreen' likely thinned

The Heat Is On

This winter was warmest on record: US

Engineering a cooler planet

Global warming:

Global warming can bring back Jurassic era

কদিন আগে তো সত্যি -ই "এবার আরেক কান্ড কেদারনাথ -এ" হলো ! কেদারনাথ ডুবলো জলের তলায়| কারণটা উপরের লাইনগুলোতেই লেখা রয়েছে| জাপানও ভেসে যাবে ক'দিনের মধ্যেই , আন্দামান , লাক্ষাদ্বীপ , আমেরিকা , ইংল্যান্ড , রাশিয়া ,কোনদিন দেখবে কলকাতাও --------

----

যাক্‌গে , আচ্ছা বন্ধুরা , আমরা একটু চেষ্টা করতে পারিনা , পৃথিবীটাকে বাঁচাতে ? তোমাদের সঙ্গে আমরা ৫ জন -ই আছি ! এসো না সবাই মিলে আমাদের থাকার জায়গাটাকে সুন্দর করি ! এসো না চেষ্টা করি বাজে কাজগুলো বন্ধ করতে !! প্রফেসর শঙ্কুর গ্যাজেটের সাহায্যে !

আমার লেখাটা তবে আপাতত এই পর্যন্তই থাক| তোমাদের ফেলুদা ফ্যান ক্লাব দীর্ঘজীবি হোক !

আমার না খুব ঘুম পাচ্ছে। রাত ও হল অনেক| কিন্তু এখনও আমাদের তিন জনের অনেক কাজ বাকি ,অনেক কর্তব্য বাকি ! প্রথমেই পৃথিবীটাকে বাঁচাতে হবে না ? আজকে Robert Frost এর লেখা সেই বিখ্যাত তিনটে লাইন আমার মনে পড়ে যাচ্ছে -----

WOODS ARE LOVELY, DARK AND DEEP.

BUT I HAVE PROMISES TO KEEP.

AND MILES TO GO BEFORE I SLEEP ………

AND MILES TO GO BEFORE I SLEEP ...

আপাতত তবে আসি বন্ধুরা ?

বিদায় ……………………..বিদায়....

ইতি ---------

তোমাদের সকলের প্রিয়

তপেশ রঞ্জন মিত্র (তোপ্‌সে)

স্কেচ ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং কোলাজ--- তপেশ রঞ্জন মিত্র

আলোর চিত্র রেখা ৩

ঢেউএর কাছাকাছি
-সোমা মজুমদার
লাল সূর্য ওঠে
-চিরঞ্জিত রক
27/01/2013 06:34
তুমি রবে নীরবে...
-অঙ্গনা সেনগুপ্ত

ক বি তা

রাজস্থানে ফেলুদা

সো মা ম জু ম দা র

বছর ছয়ের বাচ্চা ছেলে
জাতিস্মর বলে
মাঝরাতেতে একলা বসে
ছবি এঁকে চলে ;
ডাক্তার হাজরার সাথে
হয়ে গেল দেখা
চলে গেল রাজস্থানে
এক্কেবারে একা ;
বর্মণ আর মন্দার বোস
চালল এক চাল
রহস্য তাই ধীরে ধীরে
বিছোল তার জাল ;
ট্রেনেতে এক ম্যাজিশিয়ান
দেখাল তার খেলা
দুষ্টুলোককে করল ভ্যানিশ
ভবানন্দের চ্যালা ;

সোনায় মোড়া কেল্লা যাবে
হাজার গুপ্তধন
সম্মোহনের শক্তি দিয়ে
জয় করবে রণ ;
খবর পেয়ে ফেলুদা
ট্রেনে চেপে রাজস্থান
নিজের টাকা খরচা করেও
আসল হল শিশুর প্রাণ ;
সহকারী তোপ্‌সে মশাই
পড়াশুনা শিকেয় তুলে
ফেলুদার সঙ্গ নিল
কামাই দিয়ে দিব্যি স্কুলে ;
কানপুর এক স্টেশন এল
জটায়ুকে সঙ্গে নিয়ে
খুব সাহসী মারবে ডাকাত
নেপাল রাণার কুকরী দিয়ে ;
ফেলুদাকে করতে খতম
ব্রাজিলের বিচ্ছু
অনেক ফন্দী আঁটল তবু
পারলনা কিচ্ছু ;

উটের পিঠে চড়তে হবে
জটায়ুর শখ
স্বপ্ন সফল লালমোহনের
ফেলুদার ছক ;
জটায়ুকে সঙ্গে করে
রাজস্থানে রক্তপাত
ফেলুদার মগজাস্ত্রে
ভূপর্যটক কুপোকাত ;
মুখোশ খুলে গেল সবার
সাঙ্গ সকল খেলা
ফেলুদার জয় হল
ঘরে ফেরার পালা ;
সবাই মিলে চলল ফিরে
মোদের প্রিয় কলকাতা
তোপ্‌সে এবার লিখবে বসে
সোনার কেল্লা অভিজ্ঞতা ॥

নিসর্গ ভয়ংকর

আখর বন্দোপাধ্যায় ও দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(এই গপ্পে একাধিক রহস্যের পূর্বাভাস দেওয়া রইল। হয়ত বা কোনদিন এই একটা লেখা-ই আরও অনেক লেখা প্রসব করবে!)

প্রিয় ফেলু,
উত্তরমেরু
,13.07.200-

লক্ষণ খুব একটা সুবিধের নয় এখানে — যে পরিমাণ বরফ গলছে, তাতে পোলার বিয়ারগুলো বরফের চাই ধরে বেশি দূর এগোতে পারছে না। মাঝপথে চাই গলে গিয়ে ডুবে মরছে। আর হিমবাহগুলো অশ্চর্যভাবেই বোল্ডারের আকার নিচ্ছে। একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি হতাশ, কারণ হিসেবে আমি যা সাব্যস্ত করেছি, বা আমার যা আন্দাজ তাতে মনে হচ্ছে বিগত ২৫০ বছরের শিল্প-বিপ্লব উত্তর সমাজ যে পরিমান কার্বন নি:সরণ করেছে, সেটাই বুমেরাং হয়ে ওম

(শব্দটা তোমার প্রিয় বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে চালু করেন ইন্দির ঠাকুরণের মুখ দিয়ে) বাড়াচ্ছে , বরফ গলছে |

আচ্ছা ফেলু , এটা কি মানুষের সংগঠিত অপরাধ নয় ? কি হে ABCD ফেলু মিত্তির ? তোমার সমাধান কি ?

শুভেচ্ছা সহ

ত্রিলোকেশ্বর

প্রিয় প্রফেসর , কলকাতা ,

13.07.200-

আমাদের এখানকার প্রাতিষ্ঠানিক ফান্ডেড গবেষণা মন্দিরের বাইরের লোক বলেই এত আগে ভাগে ব্যাপারটা নজর করেছেন | আপনি তো প্রতিষ্ঠানের থাকবন্দি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে PROFESSOR উপাধিটা পাননি —তবু এই জন্যই আপনি আমাদের সবার প্রফেসর | এমন দূরদর্শিতার জন্য প্রণাম জানানো ছাড়া আমার আর কি -ই বা করার আছে বলুন !

তবে এই ক্রাইম -এর সমাধানটা আমার জানা : এখন যখন প্রযুক্তি আর শিল্প বিপ্লবের খেসারত দিতে হচ্ছেই , তখন স্রেফ কৃষি -ভিত্তিক অরণ্য নির্ভর কৌম -এ ফেরাটা জরুরি ! লোকে আমাদের পাগল ঠাওরাতে পারে | কিন্তু লীলা পিসির হাওয়ার দাঁড়ি মনে রেখে এই কথাটা আমাকে বলতেই হচ্ছে , জীবাশ্ম পোড়ানোর অপরাধের সমাধান কিন্তু আপনার মতো ভিন ধাঁচের বৈজ্ঞানিকের হাতেই !

শ্রদ্ধাবনত ,

আপনার ফেলু

প্রিয় ফেলু, Manila, Philippines,

08.08.200-

তোমার ওই কৃষিভিত্তিক কৌম কথাটা কেন জানি আমার মনে ধরে গেল | ভাবলাম, শস্যবীজ নিয়ে কিছু করা যায় কিনা ···আসলে কি জানো ফেলু, আমি তো প্রযুক্তি নিয়েই সারাজীবন মাথা ঘামিয়েছি ,গ্যাজেটস বানিয়েছি ---মানব আর না -মানবের কল্যাণে সেগুলো কাজে লাগানোর প্রয়াস চালিয়েছি, তবুও খেদ হচ্ছে এই ভেবেই যে আমিও এডিসন টাইপের ইনভেন্টরের বেশি কিছু নই; বিজ্ঞানের তত্ত্বকথার জগৎটা আমার ডায়েরি থেকে উবে গেছে| বাচ্চারা যখন আমার ডায়েরি পড়ছে, তখন ভাবছে lab থাকলেই বুঝি বৈজ্ঞানিক হয়ে যাওয়া যায়| আইনস্টাইনদের মতন মানুষদের মগজাস্ত্রটাই যে একটা বিশাল lab, সেটা বোঝাতে পারিনি! যাই হোক। শস্যবীজের কথাটা মনে পড়তেই অবিনাশবাবুর কথা মনে পড়ল| আমার ব্যোমযান তৈরীর এক্সপেরিমেন্টে ওনার ক্ষেত নষ্ট করে ওকেই গালি দিয়েছিলাম ভেবে এখন কষ্ট পাচ্ছি|

উত্তর মেরু থেকে ফিলিপিন্স-এ পারি দেওয়ার এইটাই কারণ। এখানে মস্ত বড় ডিএনএ ব্যাঙ্ক তৈরী হয়েছে শস্যবীজের | এটা বিক্রি-বাটা করা হবে পৃথিবীর নানান দেশে| এখানে দেখলুম এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গ্রামবাংলার প্রায় ১৫০টা ধানবীজের জিন এখানে বেচতে এসেছেন| তার গবেষণার পুরো টাকাটাই এসেছে ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে|

এটাকে কি বলবে ফেলু? এই বেচাকেনার জগতটা কি ক্রাইম নয়? যা কিনা চাষীরা নিজেদের সংগ্রহে রেখে বছরের পর বছর চাষ করত তা এবার কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নামক চিহ্ন দিয়ে কিনতে হবে?? তুমি-ই তো বল না, যে, “যারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে, তাদের শাস্তি পেতেই হবে, তারা ক্রিমিনাল?”

শুভেচ্ছা সহ

ত্রিলোকেশ্বর

পুন: সিধু জ্যাঠা কেমন আছেন জানিও|

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর, Kolkata, 10.08.200-

হ্যাঁ, এরা নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল, একে বলা চলতে পারে জিন ডাকাতি! ওই ভারতীয় ভদ্রলোকের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলাম| সিধু জ্যাঠার কাছেও গেসলুম। (ও হ্যাঁ, তিনি আপনার মিরাকিউরাল-এর দৌলতে বেশ ভালই আছেন|) যে খবরগুলো পেলুম, তা আপনাকে পরপর জানাচ্ছি|

1. ভারতবর্ষের নিজস্ব ধানবীজের সংগ্রহ নিয়ে প্রথম মাথা ঘামান রিশি আচারিয়া| শুধু মধ্যপ্রদেশেই ১৯০০ ধানবীজের সন্ধান তিনি দেন| এজন্য কর্পোরেট বীজ ব্যবসায়ীদের কোপের মুখে পরেন| তাঁর সংগ্রহশালা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়| কারণ অজ্ঞাত তথা রহস্যময়, এটা না করলে তো I.R.8 রত্না -র মত ধানবীজ বাজারে বিকোবে না!

2. রতনলাল ব্রহ্মচারী সন্ধান পান প্রায় ৪ হাজার স্বদেশী ধানবীজের। কিন্তু, তদ্দিনে অধিক ফলনশীল ধানবীজে বাজার ভরে গেছে|

3. ওই ভারতীয় ভদ্রলোকও খুবই সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করছিলেন| কিন্তু তাঁকে স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়| রাগের চোটে তিনি বীজগুলো সব বিক্রি করতে শুরু করেছেন, জিন ডাকাতিতে সাহায্য করছেন|

এই ক্রাইম ফেলু মিত্তির কেমন করে বন্ধ করবে বলুন তো!

প্রিয় ফেলু, Giridi,
21.08.200-

দেশে ফিরে অবিনাশবাবুর ক্ষেতে গিয়ে আমি হতবাক! মাটি পাথরের চেয়েও শক্ত |খানিকটা তুলে আনলাম ল্যাব-এ টেস্ট করব বলে| টেস্ট করে দেখলাম যে এতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার আর অধিক ফলনশীল বীজের দরুন মাটির এই করুণ অবস্থা! তাছাড়া প্রচুর কীটনাশকের অস্তিত্বও দেখতে পেলুম!!

এমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চেয়েছিলাম বুঝি?

শুভেচ্ছান্তে ,

ত্রিলোকেশ্বর

2.09.200-

Ballygaunge, Kolkata. 21, Rajani sen Road. সকাল ৭ টা। ফেলুদার ফোন বেজে ওঠে|

ফেলুদা ফোন ধরতেই শুনতে পায় রাগে উত্তেজিত ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর গলা ! কথোপকথনটা এইরকম ---

---"আচ্ছা , ফেলু তুমি-ই বলতো , আমরা বিজ্ঞানীরাই যদি বিজ্ঞান বিরোধী কাজকম্ম করি , তো তা হলে কি হয় বল দিকি ? "

---"কেন কি হল ? আর এ আর নতুন কথা কি ! Manhattan Project থেকেই তো এইসব চলছে |"

----"আর বোলো না ফেলু , আমার এক অগ্রজ বৈজ্ঞানিক এই গিরিডিতেই চাষবাস আর সমাজবিজ্ঞানের একটা প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন | তার পরিবেশ -ভাবনা এত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল যে , তিনি তখনই বানিয়েছিলেন সবুজ স্থাপত্য ----আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা |ফাঁপা ইটের বাড়ি , আকাশজল সংরক্ষণ ব্যবস্থা ,গাছ রক্ষা --- এসবই তিনি করেছিলেন | অথচ আজ দেখছি , নতুন বিজ্ঞানীরা সেই সবুজ-বন্ধু স্থাপত্য ভেঙ্গে ফেলছেন ,পুকুর বাঁধাচ্ছেন , এমনকি বলছেন যে এই কার্বন এমিশন , ক্লাইমেট চেঞ্জ সবই নাকি রূপকথার গপ্প , সবই বাজে কথা !

ফেলুদা হেসে ওঠে |

----- "তা আপনাদের মতন বৈজ্ঞানিক এদের নিয়ে চিন্তিত কেন ? "

------" চিন্তিত হব না ?? এরা সাধারণ মানুষদের কি শিক্ষা দিচ্ছেন ? বিজ্ঞান যদি বামনাই কান্ড হয়ে যায় , সাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় , তাহলে তো সে এক সমূহ বিপদ হে ফেলু !"

-----"আপনি তো এদের ফুঁৎকারেই উড়িয়ে দিতে পারেন ! "

-----" কিভাবে গো ফেলু ? হাতে -নাতে তো প্রমাণ দিতে হবে ! কি করে বোঝাব যে আজ গ্লাসিয়ের গুলো এক -একটা বোল্ডার -?? "

ফেলুদা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে| তারপর বলে ওঠে —

----" আচ্ছা , আপনি কার্বন এমিশন -এর একটা ঘর বানিয়ে , সেখানে ওই বৈজ্ঞানিকগুলোকে পুরে দিন না … তারপর …---"

-----"ইউরেকা ! Exactly ফেলু ! Exactly! Thank u ফেলু … তবে রাখি …---"

ফোনটা "খট " করে কেটে গেল| ফেলুদা ওর আর্ম চেয়ারে বসে একটা চারমিনার ধরালো|

শঙ্কুর ডায়েরি -র একটি পাতা

সাংখ্যবিজ্ঞান মন্দির

25.09.200-

ফেলুর ক্লু-টা পেয়ে গিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ একটা ঘর চেয়ে নিলাম | ২০X২০ ঘরটাকে চাদ্দিকদিয়ে বন্ধ করে , বিজ্ঞান মন্দিরের CFC বিকিরক AC মেশিনগুলো উল্টো করে বসিয়ে চালিয়ে দিলুম | শানবাঁধানো মেঝের উপর একপরত পিচ –বিটুমেন ---ব্যাসল্ট চড়িয়ে দিলুম | একটা গাড়ির মোটর জোগাড় করে মেঝের উপর বসিয়ে দিলুম , সঙ্গে একটা ডিজেল জেনারেটার | ঘরের মধ্যে পশুপাখি রাখবার প্ল্যান করেছিলাম বটে , কিন্তু আজকাল তা একেবারেই সম্ভব নয় ---ওদের উপর টর্চার করা বারণ| তারপর পাঁচটা বড় বরফের চাই রাখলাম | তারপরেই দুজন লোককে ঢোকালাম | ওদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা আগেই করে নিয়েছিলাম , চমৎকার স্বাস্থ্যবান তারা| কিন্তু ঠিক ঘন্টা -দেড়েক এর মধ্যেই ওই কার্বন বিকিরক পরিবেশে তারা এক্কেবারে কাত , বরফগুলো গলে একাকার ! খুবই দ্রুত গলছে ! পুরো নিরীক্ষণের ভিডিও রেকর্ডিং যখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সামনে পেশ করলাম , তখন প্রথমে যে আপত্তিটা উঠলো , সেটা হল যে পৃথিবী একটা ওপেন স্পেস| আর আমার এক্সপেরিমেন্টটি করা হয়েছে বদ্ধ ঘরে (without any ventilator), ফলে পরীক্ষার রেজাল্ট নির্ভরযোগ্য নয় | আমি নাকি miniature পৃথিবী বানাতে পারিনি !

অতএব , আমি বোঝাতে শুরু করলাম , এই Biosphere আর Stratosphere-এর মাঝখানে কেমন করে একটা নবীন লেয়ার তৈরী হয়েছে , স্রেফ দূষণের জন্যই ----- ।

----****___***___***___***___****____***____****----

প্রফেসর শঙ্কু -র gmail-এ আরেকটা কি একটা মেইল পেয়ে ফেলুদা গিয়ে হাজির হল সিধু জ্যাঠার কাছে| প্রফেসর এখন গারো --খাসি --জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকায় কিসব যেন করে বেড়াচ্ছেন| আমি ব্যপারটা ঠিক মতন জানিনা! আসলে এই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক কোনও বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে না থেকেও, একজন স্বাধীন গবেষক হয়েও কি করে যে প্রফেসর হলেন, তা আমার এক্কেবারেই অজানা| আর কোথায় যে কখন যাচ্ছেন আসছেন কিসুই ঠাওর করতে পারিনা!

সিধু জ্যাঠার ঘরে ঢুকতেই উনি বললেন, "এই, তোমরা কে? আমার ঘরে না বলে ঢুকে যাচ্ছ ?"

ফেলুদা হেসে বলল, " মাফ করবেন ---আসলে --- "

সিধু জ্যাঠা ফেলুদার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝলে ফেলুচাঁদ, যা নেই গুগল-এ, তা নেই ভূগোলে! তা এখন তুমি আবার আমার কাছে কি-ই বা জানতে এসেছ"?

----" প্রফেসর শঙ্কু উত্তর -পূর্ব ভারতের সাত -বোনের রাজ্যে এখন ঘুরছেন| কিছু ভাষাতাত্ত্বিক সেখানে ভাষা—সমীক্ষা করছেন---মরে যাওয়া বা বিপন্ন ভাষাকে বাঁচাবেন বলে ঠিক করেছেন "!

----" বাজে কথা! কোনও ভাষাকে - একমাত্র বাঁচানো যেতে পারে পুঁজি---বিনিয়োগের জোরে| ওদের ধান্দা অন্য হে ফেলু মিত্তির!"

------"সেই ধান্দাটাই তো প্রফেসর বুঝতে চাইছেন!"

সিধু জ্যাঠা বললেন, "দ্যাখো ফেলু, Cryptography বলে একটা শব্দ আছে তা জানো নিশ্চয়ই ! তপেশ, তুমি তোমার লেখার পাঠককে এটা গুগল-এ সার্চ করে দেখে নিতে বল, বুঝলে? "

লালমোহনবাবু এতক্ষণ চুপ করে সিধুজ্যাঠা আর ফেলুদার কথা শুনছিলেন| তিনি এবার মুখ ভেটকে বললেন," কিন্তু, আমি কি করে বুঝব তপেশভায়া? "

আমি লালমোহনবাবুকে টিপে দিয়ে ফিস-ফিস করে বললাম, "পরে বুঝিয়ে দেব খন|"

সিধুজ্যাঠা আবার শুরু করলেন, "দ্যাখো ফেলু, তুমি তোমার গোয়েন্দা জীবনে সুপ্রচুর হেয়ালি decipher করেছ! একদল সায়েন্টিস্ট আছেন, যারা cryptic language তৈরী করেন, আবার decipher ও করেন| আর এই গুপ্তলিপি তৈরী করবার জন্য তারা বেছে নেন খুবই অপ্রচলিত

ভাষা গুলোকে ---যেগুলো ৮০ % মানুষ -ই জানেন না| ওগুলোকে ওরা বলেন , Endangered Language.

হু , মানুষ , না -মানুষ স্বয়ং আজকাল বিপন্ন তো "ভাষা"! এই ব্যাপারটা আমাকে প্রথম জানায় বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ মনমোহন| ও ভালো কথা , লালমোহন , এই মনমোহনের সঙ্গে আপনার আলাপ হলে আপনি আপনার লেখার প্রচুর খোরাক পেয়ে যাবেন|

জটায়ু "হে হে " করে একটু সংকুচিত হাসি হাসলেন| ফেলুদা বলল , "ওই মনমোহন বাবুই আমাকে এই পুরো সভ্যতার বিপন্নতার কথা জানান ---ওই বিষয়টি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন| কিন্তু এত গুপ্তলিপি তৈরী পাঠোদ্ধারের ধুম লেগেছে কেন , তা বুঝতে পারছি। যুদ্ধ কি?"

সিধু জ্যাঠা বিমর্ষ মুখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন ," ঠিকই ধরেছ হে ফেলুচাঁদ| Nation-এ Nation-এ চলছে প্রতিযোগিতা| এ ওর তথ্য জানতে চাইবে আবার নিজেরটাও লুকোতে চাইবে! যুদ্ধের তো তাই রীতি রেওয়াজ| 2nd World war-এর সময় থেকেই এরকম অপকম্ম করে চলছে ভাষাতত্ত্ব| Millitary Crash course-এ ভাষা শেখার কারিকুরি জেনে নিয়ে একদল লোক অন্য nation-এর সংস্কৃতির ভিতর সেঁধিয়ে যেত| তাই তো ভাষাতত্ত্বের অন্য নাম , বা বদনাম হল , " Paratroopers Linguistics"| আমার মনে হয় ত্রিলোকেশ্বর এমন সব অপকম্মই দেখছে ওই গারো -খাসি পাহাড়ের আশেপাশে|"

আমার মনে হল , এইসব অপ্রাতিষ্ঠানিক মানুষজন , সিধুজ্যাঠা ,শঙ্কু , ফেলুদা বা মনমোহনরাই ফান্ডেড organized institutionalized বিজ্ঞানের ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করে দেবেন ! খুলে যাবে ওদের সক্কলের মুখোশ !

প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরির একটি পাতা মেঘালায়া , 15.10.200-

মেঘালয়ের নানান জায়গায় সারি সারি সিমেন্ট কারখানা দেখে আমার ভারী কৌতূহল হল| উঁকি মেরে দেখলুম মজুররা সব খালি হাতে কি একটা জিনিস তুলছে| একটু নমুনা সঙ্গে নিয়ে এলুম| এবং বাড়ি ফিরে টেস্ট করে যা পেলুম , তা দেখে আমার হতবাক হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় রইলো নাহ ! জিনিসটা পিচ বেল্ট ------- Uranium এ ভর্তি !

আরও কত বোম , Missiles তৈরী হবে কে জানে !

“ ওরে তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল ---?”

___****____***___

25.10.200-

Uranium খালি হাতে নেবার পর আমি আরও সতর্ক হয়ে গেছি | এমন একটা গ্যাজেট বানিয়েছি যেটা কোনও বিকিরণ আমার শরীরের ধারে কাছে এলেই সিগনাল দেবে !

এই যন্তরটা আজ দারুন কাজে লাগলো | আকাশে হঠাৎ দেখি একটা হেলিকপ্টার খালি চক্কর কাটছে | হেলিকপ্টারের তলায় দেখলুম একটা বড় গোল চাকতি | আমার মাথার উপর দিয়ে যখন উড়ে যাচ্ছিল , ঠিক তখনই গ্যাজেটটা কয়েকটা বিপ বিপ আওয়াজ করে উঠলো | এটা থেকে এই বুঝলুম , যে ইনফ্রা -রেড রশ্মির আমার শরীরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে | আরও পরে আরেকটা হেলিকপ্টার থেকে গামা রশ্মির অস্তিত্ব টের পেলুম | ব্যাপারটা কি ??

বাঁকুড়া , 26.10.200-

সিধুজ্যাঠার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলুম , তা সাংখ্যবিজ্ঞান মন্দিরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে | উপগ্রহ বা ওই রকম হেলিকপ্টারের মাধ্যমে রশ্মির ফেলে একধরনের ছবি তুলছেন একদল সায়েন্টিস্ট : একে বলা হয় রিমোট সেন্সিং | এবার সেই ছবিগুলোকে বিশ্লেষণ করে মাটির তলার খনিজ সম্পদের হদিস পাওয়া যায় | একে বলে ইমেজ প্রসেসিং |

এইভাবেই নির্বিচারে মাটির তলার জিনিস তুলে হীরক রাজ-রা আছেন বেশ | কিন্তু এদিকে নিসর্গ যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এসব কান্ডকারখানার জন্য , তা আর ভাবে কে ?

লালমোহনবাবুর কথা   গড়পার ,

21.11.200-

আমি যাদের সঙ্গে থাকি , তারা সবাই বুদ্ধিমান লোকজন | আমি এদের থেকে এতদিন যা সব শিখেছি , তা আর মুখে বলবার নয় ! আজ তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদের সব্বাইকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছি | প্রফেসর শঙ্কুর মেঘালয় Adventure নিয়ে আমার নতুন রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস ---“ মেঘালয়ে মেঘরাজ ” নিয়েও এদের সঙ্গে কিছু কথা বলা যাবে ,আস্তে আস্তে সব্বাই এসে পড়লেন | মনমোহনবাবু , নকুরবাবু , শঙ্কু , সিধুবাবু , ফেলুবাবু আর তপেশ |

জোর আড্ডা শুরু হলো। সঙ্গে এক্কেবারে উত্তর কলকাত্তাইয়া খাওয়া-দাওয়া। তার মধ্যে ব্রেন-চপ আর লড়াই-এর চপ হলো মানে যাকে বলে বলবার মতন Items !

সবাই দেখলুম যে মনুষ্য জনিত কারণে পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাবার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন।

এমন সময় যে কান্ডটা ঘটালেন নকুরবাবু, তা আমরা কেউ-ই স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ! হঠাৎ আমার খাবার ঘরটা পুরো Science City-র Space Theatre-এ পরিণত হলো !

নকুরবাবু খালি অস্ফুট স্বরে বললেন, "আর এক TWENTY-TWENTY…..দু হাজার বিশ সাল …..2020……"

আমরা যেন প্রফেসর শঙ্কুর তৈরী ব্যোম যানে চেপে পৃথিবীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছি !! আমার হাত-পা থর-থর করে কাঁপছে … উত্তর — দক্ষিণ মেরুর বরফ গলে একাকার ….সমুদ্র বিশ মিটার উঁচু হয়ে ধেয়ে আসছে …

এরপর …এরপর … এরপর আমি আর কিচ্ছু জানিনা …

আমার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছাড়া আর যে কোনও উপায়ই ছিল না …!!

****

গোলাপ

শিবাদিত্য দাস শর্মা

গোলাপ , তোমায় হঠাৎ অনেকদিন পর দেখে ফেললাম একটা বাংলো
বাড়ির বাগানে , তুমি দল বেঁধে ফুটে আছো ,
আর তোমার স্নেহ , ভালোবাসা , রূপ ও গন্ধে ভোরটা আরও লক্ষ গুণ
আলোকিত হয়ে আছে !! হ্যাঁ , আমি সেই স্নেহের কথা বলছি ,
যে ছোটদের চাচা নেহরুকে আরও কাছে নিয়ে আসে ১৪ই নভেম্বর !!
আমি সেই প্রেম ছড়ান মহিমার কথা বলছি যা
১৭ বছরে হওয়া প্রথম প্রেমের সাক্ষী হয়ে বইয়ের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ে।
গোলাপ , আমি তোমার সেই গন্ধের কথা বলছি , যে ,
কোন এক মেমের খোঁপায় কিংবা সাহেবের কোটের পকেটে নিজেকে লুটিয়ে দেয়.....
গোলাপ , তোমায় ফুটে থাকতে দেখেছি...
খোলা আকাশের নীচে , চাষের ক্ষেতে , চাষীর অন্ন হয়েছ তুমি !!
কিন্তু সেই তুমি নিজের গন্ধ , রূপ , স্নেহকে , বিকিয়ে দিতে পারছ পারফিউমের বোতলে ,
কিংবা গোলাপ জলের শিশিতে চলে যাচ্ছ দেশ - বিদেশে !!
সত্যি বল , তুমি কি শুধু নির্বাক সৌন্দর্য্য , নাকি প্রকৃতির সুন্দর জবাব ???
গোলাপ , আমি তোমায় চিনতে পারিনি ....

তুলির টানে

সূর্যোদয়
-অঙ্গনা সেনগুপ্ত
বিদেশিনী
-মোনালিসা সাহা
অনামিকা
-মোনালিসা সাহা
চ্যাপলিন
-অর্ক চক্রবর্তী
নদী পারে
-অর্ক চক্রবর্তী
স্থির চিত্র
-রক্তিম আচার্য
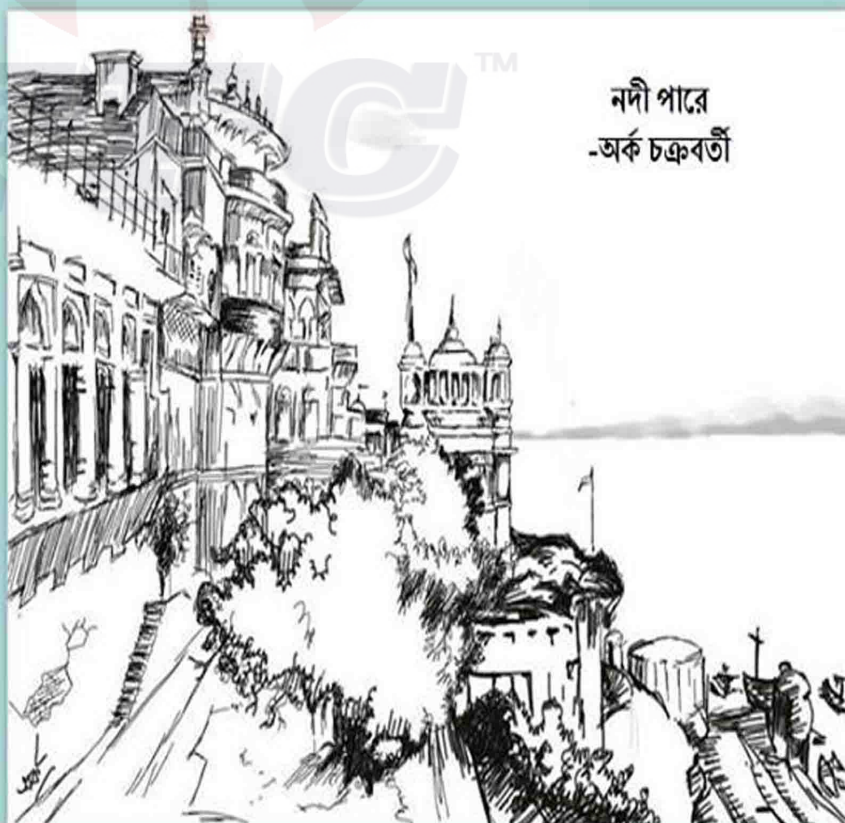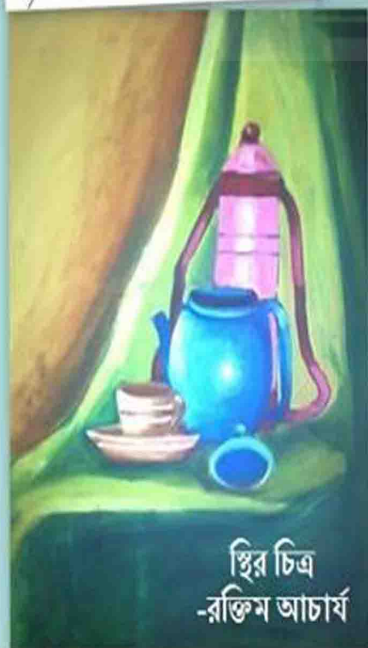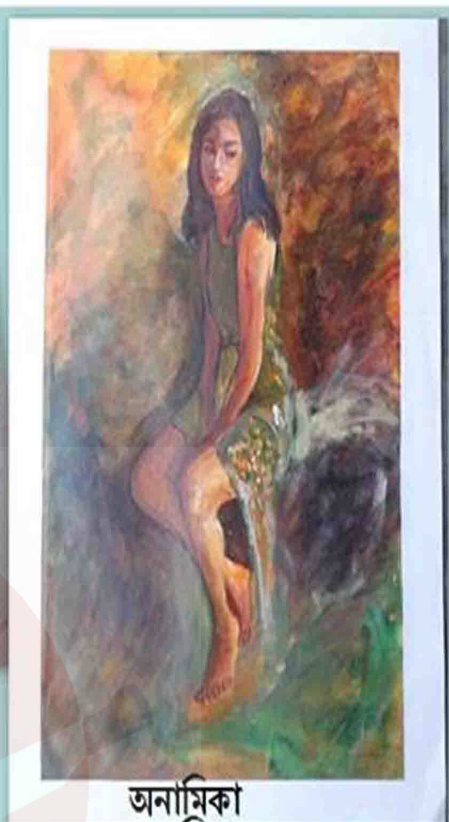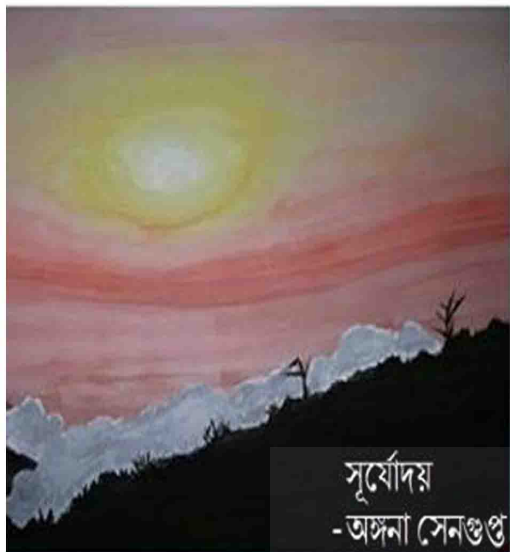
আমি ও আমার ফেলুচাঁদ

- অঙ্গনা সেনগুপ্ত

ABCD । আজ কাল abcd বললেই হয়ত বেশিরভাগ লোক বলবে " Any Body Can Dance " । কিন্তু আমার কাছে অনেক ছোটবেলা থেকেই এর ফুল ফর্ম ছিল " Asia's Best Crime Detective "| কার কথা বলছি বোধ হয়ে সবাই জানে - সেই একমেবাদ্বিতিয়াম ফেলু মিত্তির | P.C. জিনিসটার ফুল ফর্ম যে পার্সোনাল কম্পিউটার সেটাও জেনেছি অনেক পরে | তার আগে P.C. ছিলেন P.C. Mitter বা প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে সবার প্রিয় ফেলুদা |

ফেলু মিত্তির লোকটার সাথে প্রথম পরিচয় বোকা বাক্সের পর্দায় | সোনার কেল্লা | তখন বয়েস ৪ কি ৫ | গল্প বইয়ের পোকা তখন হয়ে উঠিনি | লোকটাকে বেশ ভালো লাগলো | তবে সেই একবারই সাক্ষাৎ | তখন তো আর আজকের মতো গ্যাজেট যুগ ছিলনা যে হুট বলতেই সিনেমা ডাউনলোড করে নিলাম সবচেয়ে সহজলভ্য যন্ত্রটিতে | বিশেষ করে মফঃস্বলে বেড়ে ওঠা শিশুর কাছে তখন কম্পিউটারই ছিল আকাশকুসুম স্বপ্ন | কাজেই মনের মতো কিছু দেখতে হলে দূরদর্শনের কৃপা দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না |

তা সে যাই হোক প্রথম পরিচয়েই বেশ মনে ধরল ব্যাক্তিটিকে , যাকে বলে " love at first sight " | আর সেইদিন থেকে ফেলু মিত্তিরের মহিলা অনুরাগীর সংখ্যা আরো একটি বেড়ে গেল | তারপর পরিচয় ঘটল রহস্য রোমাঞ্চ নামক এক বিশেষ ধরনের গল্পের সাথে যা কিনা এতদিন ঠাকুমার ঝুলি আর ক্ষীরের পুতুল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল | শিশুমনে রহস্যের প্রথম ছবিটা সত্যজিত রায় - এরই আঁকা | সেই শুরু.. তারপর প্রায় বছর কুড়ি কেটে গেছে | " ফেলুদা – জ্বর" আমাকে ছাড়েনি |

মনে পড়ে ফেলুদা সিরিজের প্রথম পড়া গল্পটা ছিল টিনটোরেটোর যিশু | তখন বছর সাতেক হবে | বলা বাহুল্য যে প্রথম গল্পটিই চূড়ান্ত রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল | শুধু রহস্য বললে ভুল হবে , এডভেঞ্চার জিনিসটার সাথেও সেই প্রথম পরিচয় | আরো পড়ে যখন অন্যান্য গোয়েন্দাদের সাথে পরিচয় হলো , যখন টিনটিন আর চাঁদের পাহাড়ও পরে ফেলেছি , কিরিটি রায় বা অর্জুন বা কাকাবাবু দের চিনে ফেলেছি তখন বুঝতে পেরেছি সত্যজিত রায় গোয়েন্দা হিসেবে যে ব্যক্তির সৃষ্টি করে গেছেন তার ব্যাপ্তি কত দূর | কত দূর বিস্তৃত তার সেই চারণভূমি | সত্যি বলতে সে এক বিশাল মহাসাগর | সেখানে মুক্তো খুঁজতে একবার নামলে কত যে মুক্তো পাওয়া যায় সে ঠাহর করা কঠিন | সেই কোন ছোট্টবেলায় সেই সমুদ্রে ডুব মেরেছি , এত সহজে কি আর সেই মহাসাগর থেকে উঠে আসা যায় ?

বয়স যত বেড়েছে তত নতুন করে পেয়েছি ফেলু মিত্তির কে | যত সময় গেছে তত বেশি করে চিনেছি তাকে | আর তার সাথে তার দুই ছায়াসঙ্গী | এঁদের দুজনের কথা না বললে ফেলুচর্চা অসম্পূর্ণ | তপেশ রঞ্জন মিত্র না থাকলে যে আমাদের ফেলু মিত্তিরের সাথে দেখা হওয়ার কোনো সুযোগ ঘটত না তা বলা বাহুল্য | তিনি না থাকলে কে যে আমাদের ফেলুদা সমুদ্রে পেশাদার ডুবুরির মতো গাইড করত , কে জানে ? ফেলুদাকে মগান লালের হাত থেকে বাঁচানোই হোক আর ভয়ানক বিষাক্ত বিছার হাত থেকে বাঁচানোই হোক তোপসের সাথে সাথে সেই সব জায়গা আমিও উপস্থিত ছিলাম সেই সব ঘটনার আমিও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম | আর তার সাথে সেই জটায়ু | জটায়ু যে এক " বড়িয়া পনছি " আর তিনি যে " সীতা মাইয়া " কে বাঁচানোর জন্য এক ভানায়ক রকমের যুদ্ধ করেছিলেন সেটা ওই সোনার কেল্লা থেকেই প্রথম জানতে পারলাম | ইনি না থাকলে সেই ছোট্ট বয়েসে জানতে পারতাম না উট মরুভূমিতে বাঁচে কি ভাবে | এই রকম আরও ছোট বড় জিনিসের সঙ্গেই জটায়ু ওরফে লালমোহন বাবু না থাকলে পরিচয় ঘটত না | অনেকে বলে থাকেন লালমোহন গাঙ্গুলীর সৃষ্টি হয়েছিল তখনকার যুগের স্বল্পজ্ঞানী লেখকদের ঠেস দেওয়ার জন্য | এই কথাটা ঠিক কতটা খাঁটি তা আমার জানা নেই তবে লালমোহন বাবু না থাকলে যে আমাদের নিজেদের মনেরও অনেক বোকা বোকা শিশুসুলভ প্রশ্নের উত্তর অজানা থেকে যেত তা হলফ করে বলতে পারি | আবার তিনি যতই শিশুসুলভ প্রশ্ন করুননা কেন বিপদে পড়লে কিন্তু মাঝে মাঝে তার মাথা গোয়েন্দা মস্তিস্ককেও হার মানে | বিপদের সময় কবরস্থানে দাঁড়িয়ে শত্রু কে ঘায়েল করা.. বা হংকং-এ বসে অপহৃত অবস্থায় বাক্স তুলে ধরে গুন্ডার মাথায় আঘাত করা - এগুলো কি প্রাত্যুত্পন্নমাতিত্বের পরিচয় নয় ? যতই লোকে ফেলুদার সাগরেদ চেলা ইত্যাদি বলে অপমান করুক তিনি কিন্তু অনেকবারই বন্ধুর উজ্বল আলোয় ঢাকা পরে গিয়েও

কোনদিন একবারের জন্যও বন্ধুর উপর মনক্ষুন্ন হননি| বরং বন্ধুকে সাহায্য করতে কানে কালাও সেজেছেন আবার নিজের জীবন বিপন্ন করে ছুরির ডগার সামনেও দাঁড়িয়েছেন|

এই সব নিয়েই তিনমূর্তি| সেই তিনমূর্তি যার এখনো অজস্র অন্ধ ভক্ত , সেই তিনমূর্তি যার প্রেমে বাংলার মেয়েরা আজও প্রেমে হাবুডুবু খায়| কুড়ি বছরের মডার্ন যুবতী বলুন বা মাঝবয়েসী গৃহ বধু অথবা স্কুলের বাচ্চা মেয়ে| সবাই ফেলু-প্রেমে পাগল| ভাগ্যিস সত্যজিত ফেলুদাকে অবিবাহিত রেখে গেছিলেন| নাহলে কিন্তু প্রেম করতে একটু কষ্ট হত| এই প্রেম নিয়ে উপহাস কিন্তু একদাম ঠিক নয়|

যেদিন ফেলুদার শেষ গল্পটা মানে জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা শেষ করলাম সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল| ইসস এইগুলো আর কখনো সেই প্রথমবার পড়ার মতো করে পড়তে পারব না ? আবার তপশের পুজো বা গ্রামের ছুটিতে ফেলুদার সাথে দূর দেশে কোথাও নতুন কোনো রোমাঞ্চকর এডভেঞ্চারে যেতে পারবনা ? এই এক চরিত্রের সঙ্গেই তো প্রায় ভূভারত ভ্রমণ করেছি| কেদারনাথ , অজন্তা এল্লোরা বা লখনৌ বা জায়সালমীর বা বেনারসের গলি অথবা সেই লন্ডন , হংকং... দেশে বিদেশে আরো কত জায়গায়ই না ঘুরেছি ফেলু মিত্তিরের পাশে পাশে| আগে মনে মনে ভাবতাম যদি ফেলুদা সত্যি কেউ হত কত ভালো হত| মনে হত যাই একবার রজনী সেন রোডের সেই বাড়িটাতে| ফেলু মিত্তিরের ঠিক দেখা পেয়ে যাব| হয়ত সেই সময় জটায়ুও উপস্থিত থাকবেন| নাহয় সবার সামনেই প্রেম নিবেদানটা সেরে ফেলবো| কিন্তু হায় , সে উপায় তো নেই| তাই আজও যখন হাতে সময় পাই পুরনো স্মৃতি চারণ করি হাতটা আপনা থেকেই বইয়ের তাকে রাখা ফেলুদার বইগুলো তুলে নেয়| নাই বা থাকলো প্রথম পড়ার সেই রোমাঞ্চ| ক্ষতি নেই , সেই ফেলুদাকেই আবার পরবো , আবার নতুন করে কাছে টেনে নেব| তোমরাই বল ফেলুদা কি আবার পুরনো হয় নাকি ?

লি মে রি ক
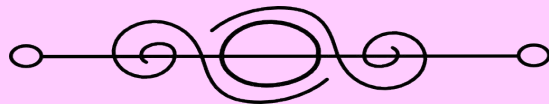
মা দুগ্গা-ই আসল সুপার- ওম্যান...
দশ হাত আর তিনটে চোখ...করেন অসুর দমান!
অসুর রা-ই ক্রিমিনাল, ওরাই দুষ্টু লোক...
পৃথিবীটার ক্ষতি করছে ওরা,
কারুর পরে না ক্যানো চোখ??
দেবী পক্ষ্য শুরু হলো,
আজকে মহালয়া.. ,
ফেলুদা এসে গেলে...
হবে "মগন" বধের পালা!

---আখর

কবিতা

পায়ের ধুলো

অঙ্গনা সেনগুপ্ত

এখন আবার শরৎ , পুজো নাকি আসছে !
পুজো ? আচ্ছা কার পুজো বলতো ? রাম না রহিম ? নাকি খ্রিস্ট ?
আরে না না .. এতো দুর্গা পুজো , নারী শক্তির পুজো।
নারী শক্তি ? হাসালে , মজা ভাল করতে পারো তোমরা !
ধুর বোকা বোকা মেয়ে , এটা তোদের পুজো রে .. মেয়েদের পুজো !
তোর পুজো..
আমার পুজো ? আমাকে পুজো করা যায় ? আমি না খারাপ মেয়ে !
আমায় পুজো করতে আছে নাকি ? ওরা যে বলে আমাদের আশে পাশে আসতে নেই ,
আমাদের স্পর্শও নাকি পাপ ।।
তবে কেন জানি না আমাদের বাড়ির মাটি দিয়েই তৈরি হয় ওদের ওই ঠাকুর .. মাতৃ মূর্তি
আমাদের ঘরের মাটি পবিত্র ? কিন্তু আমরা খারাপ ?
আর যারা খারাপ করল তারা ? যারা রোজ রাতে আমাদের খারাপ করে তারা ?
ওঃ আচ্ছা তারা তো সেই পুজো করবে ? তারাই তো সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
নাহলে মাতৃ বন্দনা যে আটকে যাবে .. ওদের ছাড়া চলে নাকি ?
ওরা পাপী হতেই পারেনা.. পাপী তো আমরা..
আমরাই তো দেশটাকে মোহ , লোভ , লালসা , কামে উজাড় করে দিচ্ছি...
আমরা তো সপ্তম রিপু ,
ধুর ধুর , আমাদের আবার পুজো কে করবে ?
আমরা তো সমাজের পায়ের ধুলো , আমরা তো পতিতা।

সাহিত্যিক

– সহেলী রায়

ছোট্ট একটা ঘর। শান্ত পরিবেশ। ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে ... আর তার সাথে কাগজের উপর কলমের খসখসানির মৃদু শব্দ। অবিনাশবাবু টেবিলে বসে লিখে চলেছেন ....

'সৃষ্টির রোমাঞ্চ অপরিসীম --- আর কোনকিছুর সঙ্গেই এর তুলনা চলে না ... এ হলো সকল নেশার রাজা। সৃষ্টিকর্তা বোধ করি এই নেশাতে বুঁদ হয়েই অনন্তকাল ধরে সৃষ্টির বিস্তার করে চলেছেন। সৃষ্টির নেশা যখন কাউকে ভর করে, তখন আর সবকিছুই গৌণ হয়ে যায়। কবি বোধহয় এই জন্যই বলেছেন —" আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে , মোর চোখ হাসে , মোর মুখ হাসে... "।

নিজের কথায় আসি। আমাকেও মাঝে মাঝে লেখার নেশায় ভর করে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ , শিহরণ আর অশান্ত ভাবের মিশেল অনুভূতি ---তখন আর সবকিছু দূরে ঠেলে কাগজ কলম নিয়ে বসি। অ - আ - ক - খ - র বেড়াজালে কখনো বা সব রোমাঞ্চ ধরা দায় , আবার অনেক সময় আধো আধো ধরা দিয়ে

অধরায় রয়ে যায়| ধরা দিলে ভালো, নেশামুক্তি হয়| আবার শান্ত মনে দৈনন্দিন কাজে মন দেওয়া যায়| কিন্তু হায় --- অধরা থাকার প্রবনতাই যে তার বেশি| সত্যি তো, কথায় বলে মানুষের মন! --- একে কি সীমিত শাব্দারাশিতে আটকে রাখা সম্ভব? তাও আবার আমাদের মতো অতি সাধারণের পক্ষে --- যার শব্দভান্ডার ক্বচিৎ-কিঞ্চিৎ ভাব ভান্ডারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে| কিন্তু তাতে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভাঁটা পরে না|

আজ আমাকে সেই নেশায় পেয়েছে| মনের মধ্যে এত রাসায়নিক বিক্রিয়া ... কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না কলমে| এতসব লেখার পরও নয় ... '

... এইটুকু লিখেছেন; ঠিক এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠলো| এই রে, এখান আবার কে এলো! ডায়েরিটাকে সাবধানে টেবিল এর আর পাঁচটা বইয়ের আড়ালে রেখে দরজা খুলতে গেলেন অবিনাশবাবু ... পাছে আগন্তুকের চোখে পরে যায়| দরজা খুলে দেখলেন ক্যাবল লাইনের ছেলেটা টাকা নিতে এসেছে ... টাকা দিতেই চলে গেল| অবিনাশবাবু নিশ্চিন্ত হলেন, যাক বাবা, গল্প-গুজব করার জন্য কেউ আসেনি, লেখাটা নিয়ে বাসা যাবে আবার| এই সময় আবার মাঝে সাঝে দু একজন প্রতিবেশী আসে আড্ডা দেওয়ার জন্য| অবিনাশবাবু একা মানুষ, বিয়ে থা করেননি, ১০ টা ৫ টা সরকারি চাকরি ... কোনো ঝুট ঝামেলা নেই ... অবসর সময় পেলেই যা মনে আসে তাই লেখা-লিখি করেন --- এই তার একমাত্র সখ| কিন্তু সখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আত্মবিশ্বাস কিম্বা সাহস কোনটাই ততটা নেই ... তাই নিজের লেখা কোনদিন কোথাও ছাপাতে দেওয়া তো দূরের কথা, কাউকে কখনো দেখানও নি ... পাছে কেউ যদি হাসি-ঠাট্টা করে, কেউ যদি তার লেখাকে ব্যঙ্গ করে, তাই| টেবিল এ গিয়ে বসে আবার ডায়েরি-র পাতাটা খুললেন অবিনাশবাবু| নিজের লেখাটার উপর একবার চোখ বুলোলেন --

সত্যি মন্দ হয়নি তো! এ লেখা যেই দেখুক, সেই প্রশংসা করবে ... নিজেকে নিয়ে একটু চাপা গর্ব অনুভব করছেন| এমন সময় কলিং বেলটা আবার বেজে উঠলো| আবার কে এলো ... একটু বিরক্ত হয়ে তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন|

" কি মশাই, কি করছেন? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম অনেকদিন আপনার বাড়ি যাওয়া হয় না, তাই চলে এলাম "...মনোতোষ চ্যাটার্জী ... অবিনাশবাবুর বাড়ির তিনটে বাড়ি পরেই ওনার বাড়ি| সাহিত্যিক হিসেবে এলাকায় ইদানিং বেশ নামডাক হয়েছে| এই লোকটাকে দেখলে অবিনাশবাবুর বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা হয়. .. এই লোকটা-ও এত নাম করে ফেলল!... যা লেখার ছিরি ... আজকালকার ছেলেপিলেরাও জানি কেমন ... যাকে তাকে নিয়ে মাতামাতি করে ... কিন্তু যাই হোক, সাহিত্য জগতে নামডাক, ওনাকে তো সমাদর করতেই হয়| নাহলে যে লোকে অবিনাশবাবুর সাহিত্যে অনুরাগ নেই ভাববে| " এই তো বসে আছি একা একা| ভালই হলো আপনি এলেন, গল্প করা যাবে| " একথা সেকথার মাঝে মনোতোষবাবু বললেন —" জানেন তো, পাড়ার ছেলেরা খুব ধরেছে পুজোর ম্যাগাজিনে লেখা দিতে| কি বলব বলুন, কোনো প্লটই মাথায় আসছে না "| অবিনাশবাবুর নজরটা তাঁর টেবিলের দিকে চলে গেল ... তাড়াহুড়োতে দ্বিতীয়বার দরজা খোলার সময় ডায়েরিটা আর আড়াল করা হয়নি| মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি —যদি মনোতোষবাবুর নজর

যায় ডায়েরিটার দিকে ... যদি উনি লেখাটা পড়ে প্রশংসা করেন --- নিজের সৃষ্টি অন্য কাউকে দেখাতে কার না ভালো লাগে ! একবার দেখালে কেমন হয় ?... কিন্তু পাশাপাশি একটা আরষ্টতাও কাজ করছে | " ইয়ে মানে ঠিক কি ধরনের লেখা চাইছে ওরা ? " ... " কেন মশাই ? আছে নাকি কেউ লেখালিখি করে ... থাকলে বলবেন | " ... " না মানে তেমন কিছু না ... " কথাটা আর এগোলো না | অবিনাশবাবু টিভিটা খুলে রিমোটটা মনোতোষবাবুর হাতে দিয়ে বললেন , " আপনি টিভি দেখুন , আমি মিনিট দশেকের মধ্যে চানটা সেরে আসছি | আমার আবার সন্ধেবেলায় চান করাটা প্রতিদিনের অভ্যেস , হে হে " | চান সেরে দু কাপ কফি বানিয়ে আনলেন , আরো মিনিট ২০ পারে মনোতোষবাবু বিদায় নিলেন |

মাসখানেক প্রায় কেটে গেছে | চারদিকে পুজো পুজো গন্ধ | মাঠে ঘাটে কাশফুল , শিশিরমাখা শিউলির গন্ধ ... এমনি এক সকালে বাজার যাওয়ার সময় দেখা হলো মনোতোষবাবুর সঙ্গে ... " কেমন আছেন ? "... " ভালো " ... এইটুকু বলেই মনোতোষবাবু তড়িঘড়ি চলে গেলেন | কি হলো ব্যাপারটা ? ব্যস্ত হবে হয়ত | এমন সময় পাড়ার ক্লাবের দু একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল | অবিনাশবাবুকে বলল ... " কাকু কেমন আছেন ? প্যান্ডেল এর কাজ দেখেছেন ? এবার কিন্তু ব্যাপক হয়েছে প্যান্ডেল | আর ম্যাগাজিনও বের করেছি আমরা | মনোতোষবাবুর লেখা আছে ... যা লিখেছেন না আর্টিকেলটা , একেবারে ইউনিক | শুরুর দিকটাতো জাস্ট অসাধারণ | আপনাকে পাঠিয়ে দেব একটা কপি বিকেলে | "... " পাঠিয়ে দিও একটা ম্যাগাজিন "... অবিনাশবাবু নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন |

ক্লাব এর ছেলেগুলো এমনিতে ভালই | কথামত বিকেলে এক কপি ম্যাগাজিন দিয়ে গেছে অবিনাশবাবুর ঘরে | ম্যাগাজিন হাতে পেয়েই সবার আগে মনতোষ চ্যাটার্জীর লেখাটা খুঁজে বের করলেন | কিন্তু এ কি !! ... ' সৃষ্টির রোমাঞ্চ অপরিসীম .... ' এক মুহূর্তের জন্য সব তালগোল পাকিয়ে গেল অবিনাশবাবুর ...এ যে হুবহু তার নিজের লেখাটা ... অবশ্য মনোতোষবাবু আরো অনেকটা জুড়ে দিয়েছেন এর সঙ্গে | নিজের লেখাকে ছাপার অক্ষরে দেখার যে কি সুখ , তা আজ বুঝতে পারছেন অবিনাশবাবু | হোক না তা আরেকজনের নামে | মনে মনে হাসলেন তিনি | এখন বুঝতে পারছেন মনোতোষবাবু কেন তড়িঘড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন ... তাহলে ডায়েরিটা সেদিন মনোতোষবাবুর নজরে পড়েছিল বেশ ভালোভাবেই | কিন্তু এসব কিছুই আর ভাবতে পারছেন না তিনি | বারবার শুধু মনে হতে লাগলো পাড়ার ছেলেগুলোর কথাটা .... " যা লিখেছেন না আর্টিকেলটা ...শুরুর দিকটাতো জাস্ট অসাধারণ "....

আলোর চিত্র রেখা ৪
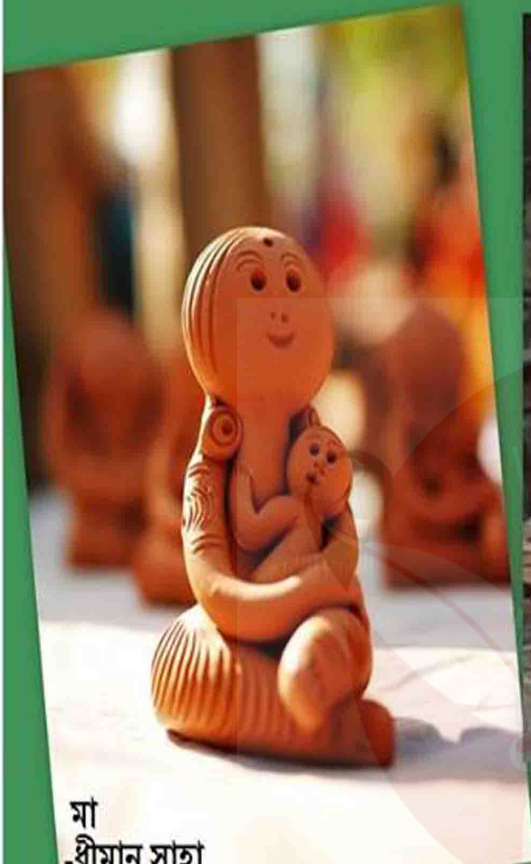
মা
-ধীমান সাহা

নিরাবরণ শৈশব
-শুক্লা সিংহ

ভরষার আশ্রয়
-শুক্লা সিংহ

এও আমার দুর্গা

সায়নদীপ চট্টোপাধ্যায়

আমি হলাম তোমাদেরই আফ্রিকার রাজা ,
কিন্তু আমার শরীর আজ আর নেইকো তেমন তাজা।
সিংহদেহে আসলে আমি হলাম নারায়ন ,
মা'কে পিঠে চড়াব বলেই এরূপে তাঁর বাহন।
কিন্তু আমার মা'য়ের আজ অনেক অনেক কষ্ট ,
বিষ্ণু আমি পুরুষোত্তম ,কলঙ্কেতেই নষ্ট।
একদা দ্রৌপদীর সন্মান রক্ষায় সচেষ্ট ,
আজ নারীদের বস্ত্র বাঁচাতে ব্যর্থ আমি কেষ্ট ?
শত শকুনির পাশার চালে সমাজ যেন বিবস্ত্র ,
এমন দশায় কবে জানিনা আসবে আমার অস্ত্র।
অশালীনতা ছেয়ে গেছে আজ,সাথে খুন ও ধর্ষণ ,
এসব দেখেও জানিনা কেন অচল মোর সুদর্শন ।
এই কারনে পিঠে আমার দুঃখিনী মহামায়া ,
লক্ষ-কোটি নারীর ভিতরে রয়েছে তাঁরই ছায়া ।
"পৌরুষ" কৃত অপমানে রক্তিম যার গা ,
বহু অপমান সহেও তিনি আমারই দুর্গা ।
আমার দুর্গা আত্মবিশ্বাস ,নয় সে কুসংস্কার ,
আমার দুর্গা বিশ্বময় মাতৃত্ব কে নমস্কার।
আমার দুর্গা অগ্নিবর্না ,সিংহ যার ভক্ত ,
আমার দুর্গা রাঙায়িত কারন বিপ্লবীদের রক্ত।
আমার দুর্গা খড়গ ধরে হয়েছে শ্যামা-কালী ,
আমার দুর্গা সতী-পার্বতী, অথবা মরুর বালি।
আমার দুর্গা সোনার বাংলা এবং ভারত মাতা ,
আমার দুর্গা বিশ্ব-প্রকৃতি,গাছের সবুজ পাতা।
আমার দুর্গা রবি-নজরুল-রামপ্রসাদের গান ,
আমার দুর্গা অসুর মেরে করবে রক্তপান।
আমার দুর্গা সারা বছরই মনের শারদপ্রাতে ,
আমার দুর্গা রান্নাঘরে প্রতিদিন প্রতি রাতে।
আমার দুর্গা ছোটবেলা থেকে প্রিয় পরিচিত নাম ,
আমার দুর্গা আমার ভাবনা,যদি নেই কাজ কাম।
আমার দুর্গা যোনি থেকেই জন্ম মহাকাশের ,
আমার দুর্গা ক্ষেপে চামুণ্ডা দেবী সর্বনাশের।
আমার দুর্গা মূর্তি হয়ে শিল্পীর কারুকার্যে ,
আমার দুর্গা সংসারি গদাধরের ব্রহ্মচর্যে।
আমার দুর্গা অচিন পাখি যেখানে ফকির লালন ,
আমার দুর্গা মনুষ্যত্ব,চৈতন্যের কারন।
আমার দুর্গা মহামায়া তাই গতিশীল মহাকাল ,
আমার দুর্গা মায়ের আঁচল ,দুনিয়া-তরীর পাল।
আমার দুর্গা আঁধার সমাজে নগ্ন কালরাত্রি ,
আমার দুর্গা নর-নারী উভয়েরই জন্মদাত্রী।
আমার দুর্গা দশমীর রাতে সবার সিঁদুর খেলা ,
আমার দুর্গা গরীব-ঘরের অন্ন পূর্ণ থালা।
আমার দুর্গা রক্ত থেকে দুগ্ধ মায়ের স্তনে ,
আমার দুর্গা বহুরুপিনী ,প্রতিদিন প্রতিক্ষণে।

আমার দুর্গা অস্কার রূপে সত্যজিতের জয় ,
আমার দুর্গা সদাই মুণ্ডমালায় বরাভয়।
আমার দুর্গা লাল পাড় গায়ে দাড়ায় ঠাকুর-দালানে
আমার দুর্গা পিঠে ঝুড়ি নিয়ে চা তোলে বাগানে।
আমার দুর্গা একের কুমারী থেকে একশোর বৃদ্ধা ,
আমার দুর্গা শাক্তমতে দশটি মহাবিদ্যা।
আমার দুর্গা পাক-আফগানে চায় যে বিদ্যা-ভিক্ষা ,
আমার দুর্গা কিভাবে সেথায় দেবে সন্তান শিক্ষা ?
আমার দুর্গা রূপে গুনে শুনতে চায় না বড়াই
আমার দুর্গা বিবেকের সাথে আদিম রিপুর লড়াই।
আমার দুর্গা যদি সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশিনী ,
আমার দুর্গা কুমারীকালেই দালালের বিকিকিনি ?
আমার দুর্গা খুশি হয়ে আঁখিপাতে রং-তুলি ,
আমার দুর্গা গড়েই রোজগেরে কুমোরটুলি।
আমার দুর্গা খুব মিষ্টি,বইছে রুপের বন্যা ,
আমার দুর্গা কাশবনে ছোটা কৌতূহলী কন্যা।
আমার দুর্গা "ভগবান" আর "মা" শব্দের মিলন ,
আমার দুর্গা ক্রীড়াজগতে সানিয়া,মিতালী,ঝুলন।
আমার দুর্গা কিছু ক্ষেত্রে ,বাড়ির কাজের মাসি ,
আমার দুর্গা কেন আসবেনা? হলেও বা জ্বর কাশি।
আমার দুর্গা সাতচল্লিশে হয়েছে খণ্ড খণ্ড ,
আমার দুর্গা ভাঙিয়ে খায় ,জ্যোতিষী যত ভণ্ড।
আমার দুর্গা বাংলাদেশে একাত্তরের যুদ্ধ ,
আমার দুর্গা রক্তজবার লাল সেলামে মুগ্ধ।
আমার দুর্গা বিসর্জনেই বাড়ছে গঙ্গা দূষণ ,
আমার দুর্গা প্যান্ট পরলেই " লজ্জা নারীর ভূষণ "?
আমার দুর্গা বিপন্না হলে "পোশাক সঠিক নয় "?
আমার দুর্গা নালিশ জানালে "সাজানো ঘটনা" হয়।
আমার দুর্গা নিপিরীতা কোনও নারীর চিৎকার ,
আমার দুর্গা আল্লাহ-ব্রহ্ম , নিরাকার-সাকার।
আমার দুর্গা শত চিৎকারে করে ওঠে গর্জন
আমার দুর্গা কাপড় ছিড়ে মিথ্যে পোশাক বর্জন।
আমার দুর্গা গীতা,বাইবেল আর কোরানের বানী ,
আমার দুর্গা দাম্ভিকদের করবে অহংহানি।
আমার দুর্গা বিয়ে করেছে পিতার অনুমতি ছাড়া ,
আমার দুর্গা হয়নি অফিস-সংসারে দিশেহারা।
আমার দুর্গা দশভুজা নয়, সে যে অনন্তভুজা ,
আমার দুর্গা দুর্জ্ঞেয় বটে,খুবই কঠিন খোঁজা।
আমার দুর্গা BIG BANG রূপে পদার্থ-বিজ্ঞানে ,
আমার দুর্গা তাকিয়ে থাকে ভবিতব্যের পানে।
আমার দুর্গা মুক্তধারা , দেহবলেতেও পূর্ণ ,
আমার দুর্গা মায়ের আবেশে দুঃখ-দৈন্য চূর্ণ।
আমার দুর্গা কোনও পাগলের প্রবল অট্টহাসি ,
আমার দুর্গা শাস্তি রুপে কাসভ-কণ্ঠে ফাঁসি।

আমার দুর্গা বস্তি-শিশুর "হবো এপিজে কালাম" ,
আমার দুর্গা সেনা বাহিনীর-"মা তুঝে সালাম" ।
আমার দুর্গা জগদীশের উদ্ভিদে থাকা প্রাণে ,
আমার দুর্গা বন্যা-ক্ষেত্রে লক্ষ লোকের ত্রাণে।
আমার দুর্গা হাজার লক্ষ ধর্ষিতাদের কান্না
আমার দুর্গা এখন ভাবে – "অনেক হয়েছে,আর না " ।
আমার দুর্গা যদি সর্বনারীর প্রতিবিম্ব ,
আমার দুর্গা ব্লেডাস্ত্রে কবে কাটবে ধর্ষক-লিঙ্গ ?
আমার দুর্গা আত্মঘাতী পতিনিন্দার দুঃখে ,
আমার দুর্গা প্রয়োজনমতো পা দেয় স্বামীর বক্ষে।
আমার দুর্গা ঠোঁটে রঙ মেখে লালবাতি নিরুপায় ,
আমার দুর্গা দুধ খাওয়ালে মৃত হর প্রাণ পায়।
আমার দুর্গা ছাড়া মহাদেব প্রানহীন মহাশব ,
আমার দুর্গা প্রেম করলেই ওঠে শত কলরব।
আমার দুর্গা ভীষণ ঝড়ে,অটল পাখির বাসা ,
আমার দুর্গা স্বপ্ন হয়ে নেতাজির ফিরে আসা।
আমার দুর্গা মাদার টেরিজা ,সিস্টার নিবেদিতা ,
আমার দুর্গা নার্স হলেও রোগীর অপরিচিতা।
আমার দুর্গা মৃণ্ময়ী থেকে চিন্ময়ী বিরাজে ,
আমার দুর্গা বিমানসেবিকা রূপে উড়োজাহাজে।
আমার দুর্গা ঘরের লক্ষ্মী, যদি সে কন্যা-ভ্রুণ ,
আমার দুর্গা জন্মের আগেই মায়ের পেটে খুন ?
আমার দুর্গা কলেজ লাইফে শোভিত জিনস-স্কার্টে ,
আমার দুর্গা উৎসবের আগে ভিড়ে ঠাসা সিটি-মার্টে।
আমার দুর্গা বান্ধবী রূপে আমারই সাথে ঘোরে ,
আমার দুর্গা সূর্যের আভা ,ভোরের নীল সাগরে।
আমার দুর্গা আরব দেশেতে বোরখা পরা নারী ,
আমার দুর্গা অপুর সাথে ছুটে দেখে রেলগাড়ি।
আমার দুর্গা অন্তরাত্মা ,আমারই মনান্তরে ,
আমার দুর্গা পরমাত্মা ,অসীমের চত্বরে।
আমার দুর্গা কখনো একদা নকশাল-আন্দোলনে ,
আমার দুর্গা মাতৃভূমির পতাকা উত্তোলনে।
আমার দুর্গা দেহে ও প্রাণে সমাজে এতোই সস্তা ,
আমার দুর্গা মুণ্ডু কেটে নিজেই ছিন্নমস্তা।
আমার দুর্গা বিভূষিত শতআটটি বিশেষণে ,
আমার দুর্গা এই প্রজন্মের "মাল" উচ্চারণে ?
আমার দুর্গা বলেন- "সব মেয়ে মোর অংশ" ,
আমার দুর্গা বটী দাঁ হাতে করবে সবই ধ্বংস।
আমার দুর্গা পুজোতে লাগে পতিতা গৃহের মাটি ,
আমার দুর্গা ইভটিজিংরত ছেলের গালে চাটি।
আমার দুর্গা সারদা দেবী, স্বাধীনে সংস্থিতা ,
আমার দুর্গা শিকাগো-সভায় নরেনের বক্তৃতা।
আমার দুর্গা মৃত্যুর পর কারোর দেহ দানে ,
আমার দুর্গা ইডেনের মাঠে দাদার শতরানে।

আমার দুর্গা বিজয়ার ঠোঁটে লেপটে মণ্ডামিঠাই
আমার দুর্গা হরিনাম রূপে গাইত নিমাই-নিতাই।
আমার দুর্গা আনন্দদায়ী সব কিছুরই যোগ ,
আমার দুর্গা সশরীরে এলে,লোভী-মনে জাগে ভোগ ?
আমার দুর্গা আমার কাছে আমার মাতৃভাষা ,
আমার দুর্গা ছোট্ট শিশুর স্বপ্ন পূরণের আশা।
আমার দুর্গা প্রখর খরায় কৃষকের কাছে মেঘ ,
আমার দুর্গা এই বাঙালীর সর্বোচ্চ আবেগ।
আমার দুর্গা শরীরে যখন শুধুই মাটির ড্যালা ,
আমার দুর্গা দেখে তখন প্রণাম করার পালা।
আমার দুর্গা জ্যান্ত যুবতী যখন পথে হাঁটে ,
আমার দুর্গা দেখে তখন কামুকরা জিভ চাটে ?
আমার দুর্গা রাত বিরেতে পায় পথে যেতে ভয় ,
আমার দুর্গা না রইলে সমাজের অবক্ষয়।
আমার দুর্গা না কাত্যায়ন ,দক্ষ-হিমের মেয়ে ,
আমার দুর্গা ঘরে ঘরে ওঠে মুক্তির গান গেয়ে।
আমার দুর্গা জীবনযুদ্ধে একাই হাজারো রূপে ,
আমার দুর্গা সুখ পেলেই ধরতে চায় তা লুফে।
আমার দুর্গা অস্ত্র পেলে পাপ দমনে রেডি ,
আমার দুর্গা আই-পি-এসে তাই কিরণ বেদী।
আমার দুর্গা দময়ন্তী ,মানুষ-অসুর ধরে ,
আমার দুর্গা নাড়া বাকোস হয়ে বিন লাদেনকে মারে।
আমার দুর্গা দুগগা নাম ডেকে শুভকাজে গমন
আমার দুর্গা সকল হৃদে শুধু করে যায় ভ্রমন।
আমার দুর্গা মুক্তকেশী এবং শতনয়নী ,
আমার দুর্গা ক্রন্দনরতা মহাজাগতিক জননী।
আমার দুর্গা অশ্রু হয়ে মহাসাগরের জল ,
আমার দুর্গা মহাশক্তি ,আমার মনোবল।
আমার দুর্গা আর কতদিন একা আড়ালে কাঁদবে ?
আমার দুর্গা ছেলে মেয়েদের সাম্য-সুতোয় গাঁথবে।
আমার দুর্গা শুধু মন্দিরে,থাকতে পারেনা কখনো ,
আমার দুর্গা সর্বভূতেসু,প্রেম-প্রীতি রস মাখানো।
আমার দুর্গা স্বর্গে দেবী,মর্ত্যে মানবী বটে ,
আমার দুর্গা চরিত্র নিয়ে কত কথাই না রটে।
আমার দুর্গা একশো আটেই নয়কো সীমাবদ্ধ ,
আমার দুর্গা শূন্য থেকে অশেষ সংখ্যা তত্ত্ব।
আমার দুর্গা এই কাব্যে শুধু নয় নারী-শক্তি ,
আমার দুর্গা সব কিছুরই ইতিবাচক এক দিপ্তী।
আমার দুর্গা নিয়ে লিখলে,কভু হবে নাকো শেষ ,
আমার দুর্গা চায় সন্মান ,সুস্থ পরিবেশ।
আমার দুর্গা গ্রামে-শহরে ,ট্রেনে,বাসে আর ট্রামে ,
আমার দুর্গা মর্ত্য থেকেই পাচার জাহান্নামে ?
আমার দুর্গা ভাঙছে দুয়ার জাহান্নামের খাঁচার ,
আমার দুর্গা স্বর্গ খোঁজে নিজের মত বাঁচার।

ফেলুদাময় স্মৃতি গুলো

- সোমা মজুমদার

তখন আমি স্কুলে পড়ি। বইয়ের ভারে নুইয়ে পরা শৈশব কাটাচ্ছিলাম। সাদা কাগজের ওপর পেনসিলের লেখা রাবার দিয়ে মুছে দেওয়ার পর যেমন লেখা অস্পষ্ট হলেও পড়া যায় , তেমনি আবছা হয়ে আসা মনের খাতার পাতার স্মৃতি গুলো আজও যেন পড়তে পারি। স্কুলের পোশাকের রং সবুজ ছিল বলে কিনা জানিনা , আমাদের মন টাও ছিল সবুজ বরণ , তবে কিঞ্চিৎ অবুঝ। সেই সবুজের রাজ্যে বিচরণ করতে করতে হঠাৎই একদিন পরিচয় হয়ে গেল এক মহামান্য স্রষ্টার সাথে , ফেলুদার সৃষ্টি কর্তা শ্রীমান সত্যজিৎ রায়ের সাথে , আর সেই সঙ্গে সন্ধান পেলাম এক অসীম এবং অফুরন্ত সাহিত্য খনির , যাতে আজীবন খনন কার্য চালালেও ক্ষয় হয়না এক বিন্দু সাহিত্য সম্পদ। সত্যজিৎ সৃষ্ট সেই সাহিত্যের আকাশে বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে এক নক্ষত্র ছিল শ্রী প্রদোষ চন্দ্র মিত্র বা ফেলুদা। ঠিক কোন গল্প দিয়ে ফেলুদার অভিযানে আমার প্রথম প্রবেশ মনে নেই , তবে ফেলুদা প্লাস ফেলুদা আর ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু , এই বই দুটো আমার প্রথম কেনা ফেলুদার বই। সেই পরিচয় ফেলুদার সাথে , সেই জানা ফেলুদাকে। আরো সময় কেটেছে , আরো বেশী করে জেনেছি এই অসামান্য গোয়েন্দাকে। যত দিন গেছে বেড়েছে উপলব্ধি ক্ষমতা , তার সাথে সাথে বদলেছে ফেলুদার গল্পের বিশ্লেষণ গুলোও। লেখার জাদুতেই হোক বা রহস্যের অদ্ভুত মায়াজালে , ফেলুদা পড়তে পড়তে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হতনা যে ফেলুদা একটা কাল্পনিক চরিত্র মাত্র , এর কোনও অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। ভাবতে ইচ্ছে হতনা যে রজনী সেন রোডে কোনও গোয়েন্দা প্রদোষ চন্দ্র মিত্রের বাড়ি নেই , যার কাছে জটিল রহস্যের সমাধান করতে ছুটে যাওয়া যাবে। কখন যেন কল্পনাকে ছাড়িয়ে , বইয়ের পাতার ওই শব্দ গুলোর বেড়া টপকে ফেলুদা পৌঁছে গেছিল আমাদের মনে , বাঙালীর ঘরে , বাংলার প্রতিটা গোয়েন্দা প্রেমীর হৃদয়ে। হয়ে উঠেছিল আমাদের ঘরের মানুষ , আমাদের প্রিয় দাদার মত। মনে হত রজনী সেন রোডে গেলেই দেখা মিলবে সেই আপাদ মস্তক বাঙালী ফেলু মিত্তিরের , দেখা মিলবে তার সহকারী তোপসের বা আরেক রহস্য রোমাঞ্চ গল্প লেখক লাল মোহন গাঙ্গুলীর। শৈশব থেকে কিশোর বা আরও পরে ফেলুদার গল্প গুলো আরও নতুন করে ভাবিয়েছে , শিখিয়েছে আরও অনেক কিছু যা হয়ত আগে বুঝতে পারিনি। স্কুলে পড়তে সেলুলয়েডে ফেলুদা মানে হাতে গোনা মাত্র দুটো চলচ্চিত্র। সোনার কেল্লা আর জয় বাবা ফেলুনাথ। এখনকার মত ডিভিডি , ইন্টারনেট , ইউটিউবের রমরমা ছিলনা , মন চাইলেও সিনেমা দেখার জন্য নির্ভর করে থাকতে হত টিভি চ্যানেলের ওপর। কেবল টিভি আসলেও চ্যানেলের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। যখন টিভিতে ফেলুদার কোনো ছায়াছবি দিত , বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। তার বাইরে তাই সঙ্গী ছিল ফেলুদার ওই বইগুলো। পড়তে পড়তে মিশে যেতাম কল্পনার গভীরে , হারিয়ে যেতাম অভিযানের পথে। অনুভব করতাম অলক্ষ্যে বসে আমিও যেন ওই অভিযানেরই কোন অংশ। ছুটির দুপুর গুলো ছিল একান্ত নিজের , আর সেই সোনালী দুপুর গুলোতে একমাত্র বন্ধু ছিল রহস্যে ভরপুর ফেলুদা কাহিনীরা। মুহূর্ত গুলো কেটে যেত ফেলুদার সাথে ,

দেশ বিদেশের পথে পথে। যেন সাঁতার দেওয়া রহস্যের মহাসাগরে , সাঁতার না জানলেও যেখানে ডুবে যাবার ভয় নেই। কখন যেন গল্পের চরিত্র গুলো হয়ে উঠত ভীষন চেনা , বড় আপন। তাই বুঝি ফেলুদা আজও আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের। মাঝে মাঝে খুব হিংসে হত তোপসের ওপর। পরীক্ষার ভয়ংকর সেই দিনগুলোতে মনে হত ফেলুদার গল্প গুলো কেন সিলেবাসে থাকেনা , তাহলে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া কেউ আটকাতে পারবেনা। আজ পুরনো সেই ফেলে আসা , আজও না ভোলা দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে , স্মৃতির ভাণ্ডার যেন উপচে পড়ছে মনের ঘরে। যে সময় গুলো একবার চলে যায় , তাকে আর হয়ত জীবনে ফিরে পাওয়া যায়না , কিন্তু থেকে যাই সেই শৈশবের গন্ধ আর তার সাথে ফেলুদার গল্পের স্বাদ। আজও যখন ছুটির দিনে অবসরের ফাঁকে বইরের তাক থেকে সেই ফেলুদার পুরনো বই গুলো পেড়ে নিয়ে পড়তে বসি , যেন কোন এক অদৃশ্য টাইম মেশিনে চড়ে পৌঁছে যাই কোন সে সুদূর অতীতে। আমরা আজও তৃষ্ণার্ত আরো নতুন কোনো ফেলুদার অভিযান পড়ার জন্য , কিন্তু আমাদের সে তৃষ্ণা হয়ত আর কখনো মিটবেনা। আমরা বসে থাকব পিপাসার্ত কাকের মত , কিন্তু যে জলে এই তৃষ্ণা মিটবে তার যোগান আর কোনদিন পাওয়া যাবেনা।

রিddle মানে ধাঁধা !

- সৌভিক ভট্টাচার্য

১. গোটা ভারতটাই এখন চলছে SMS – এর দ্বারা ... ব্যাখ্যা কর ।

২ . প্রথম দুই অক্ষরের সর্বদাই জয়

পরের দুই অক্ষর জয়ে তো রয় ;

আদালতের সিদ্ধান্তে নেই কো কোনো ভুল

এর রচনা সৃষ্টিতে আজও মুগ্ধ পাঠক - কূল !!!

৩ . গ্রামের নাম কেশপুর হলে কি হবে , গ্রামে মাত্র দুটি সেলুন । ধরো তুমি ওই গ্রামে বেড়াতে এসেছ ,তুমি খুব শৌখিন । তুমি দেখলে , প্রথম সেলুনের নাপিতের খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে চুল – দাড়ি কাটা থাকলেও , সেলুনটা খুব নোংরা । দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো । নিজে অপরিচ্ছন্ন থাকলেও , সেলুনটা পরিস্কার ।

এবার বলো , তুমি কোন সেলুনে যাবে ???

৪ .আমি এক কালে ভারতীয় থাকলেও বর্তমানে পাকিস্তানি । কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের প্রথম দিকেই আমাকে খুঁজে পাবে ... বলোতো আমিকে ???

সমাধান শেষের পাতায়......

আমরা কি স্বাধীন?

শিবাদিত্য দাস শর্মা

আজও সেই একই রকম ভাবে মালা তার কৌতুহলী চোখে
দেখছে সানরাইজ। আজ হয়ত ১৫ই আগস্ট , কিন্তু সবই তো সমান !
সত্যি হয়েছি কি স্বাধীন , নাকি আজও আমরা অর্বাচীন ! আজও মালা
দেখতে পায় , ফুটপাথে তার কোনও এক ভাই বসে ভিক্ষা
করছে। আর কোন এক বড় বাবু বাইপাসে নিজের স্বপ্ন
গড়ছে ! মালার চোখ কেঁদে ওঠে কোনও এক ধর্ষিতাকে
দেখে। আজও তিরঙ্গা উড়ছে , কিন্তু রং তার ফিকে !! মালার
কৌতুহলী চোখ দেখতে পাচ্ছে সীমান্তে জওয়ানদের
কষ্ট , কিন্তু কি লাভ ?? কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড তো নিজের মানি ব্যাগ
নিয়ে ব্যাস্ত ! মালা দেখতে পাচ্ছে এক শিশু হাতে
পতাকা , মুখে হাসি , সে ছুটে চলেছে দূরে কোথাও। তার
হাতেই মানিয়েছে বেশ , বাকি সবাই তো ছদ্মবেশ !! মালা
দেখছে , স্বাধীনতার খুশীতে , দেশ মেতে আছে সারা
দিন। তার কৌতুহলী চোখ প্রশ্ন করে যায় , সত্যি কি আমরা
স্বাধীন ? সত্যি কি আমরা স্বাধীন ?

এই যুগের ডিজিটাল তুলি

অপু ও দুর্গা
-অনিন্দ্য মিত্র

সত্যজিত রায়
-অর্ক চক্রবর্তী

হ্যারি পটার এন্ড
দ্য গবলেট অফ ফায়ার
-রৌনক ব্রাউন

অপেক্ষায় থাকো

তা প সী বো স

আকাশ থেকে ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি যখন পড়ে
স্বচ্ছ আকাশ আঁধার কালো করে
মনটা যদি তখন কারো উদাস হয়ে যায়
অচিন পাখীর ভেজা ডানায় ভর করতে চায়
মনের তবে দোষ কি বল তাতে ?
শ্রাবণ মাষের মেঘলা কালো রাতে
মনের মিতা কেউ থাকেনা সাথে
সজল চোখে বাতায়নের পথে
থাকো যদি কারো অপেক্ষাতে
প্রতিশ্রুতি মিথ্যে হয়ে যায়
বারি ধারার শুনি নাকি শাসন বারণ নেই
তাই তো থাকি একলা ভেজা রাতে
চির অপেক্ষাতে।

শারদ শুভেচ্ছা

শারদ উৎসবের দিনগুলি
আনন্দমুখর হয়ে উঠুক

"~FELUDA FAN CLUB~"

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

উপন্যাস

ফেলুদা ও তারিণী খুড়ো

অঙ্গনা সেনগুপ্ত, পিনাকী পাল ও তন্ময় দত্ত
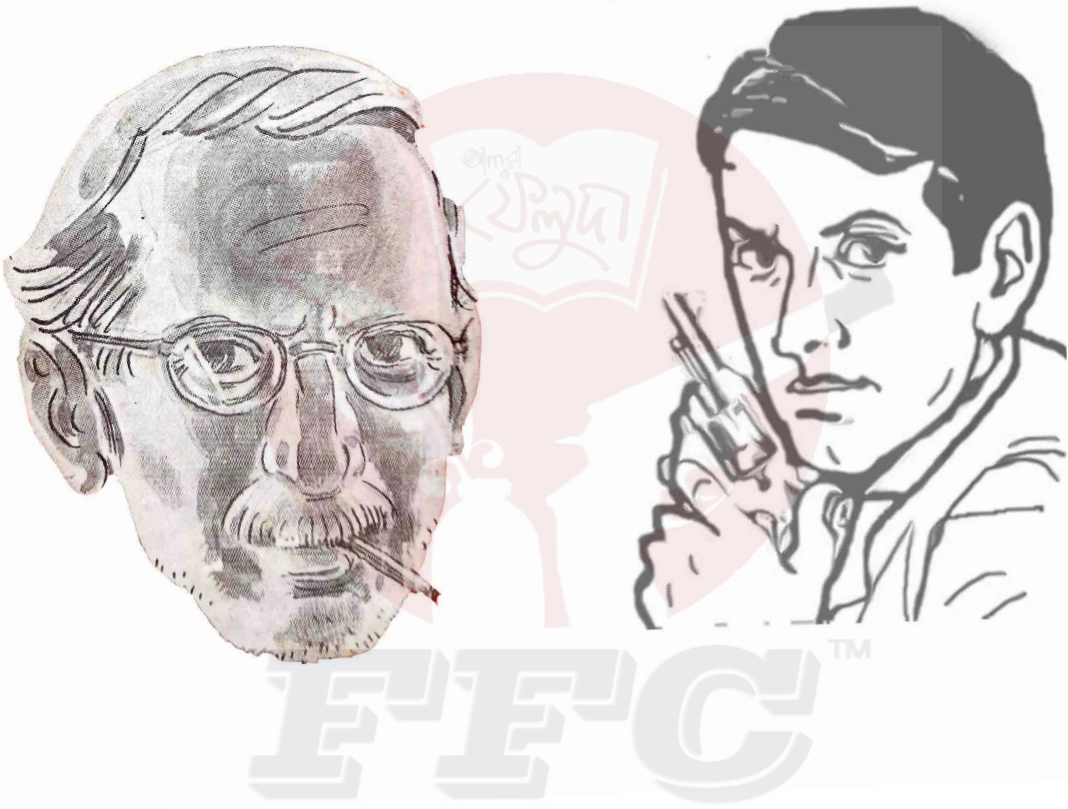
ফেলুদা সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট করছে। হঠাৎ টেলিফোনটা ঝন ঝন করে উঠল। ফেলুদা আমার দিকে আড়চোখে তাকাতেই আমি ফোনটা রিসিভ করতে গেলাম। ওপার থেকে, "আমি সিধু বাবুর বাড়ী থেকে বলছি। ফেলু বাবু বাড়ী আছেন? ওনাকে একটা আর্জেন্ট নিউজ দেবার ছিল"।

"আমি ওনার ভাই বলছি, তপেশ, আমায় বলতে পারেন।"

"ও আচ্ছা...আমার নাম অজিত পাকড়াশি। আমি সিধু বাবুর প্রতিবেশি। আজ সকাল থেকে, সিধু বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উনি ফেলু বাবুর নামে একটি

চিঠি রেখে গেছেন। আপনি ফেলুবাবু কে এখুনি আসতে বলুন। ”

ফোন রেখে ছুটলাম ফেলুদার কাছে। ও সবে ব্রেকফাস্ট সেরে একটা চারমিনার ধরিয়েছে। সব শুনে ঠিক তিন মিনিটের মধ্যে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। লালমোহন বাবুর আসার কথা আছে কিন্তু দশ মিনিট বাকি। ফেলুদা টেনশনে একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছে। একটু বাদেই লালমোহন বাবুর সবুজ ambassador-এর হর্ন শোনা গেল। আমি আর ফেলুদা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

আমাদের হন্ত-দন্ত হয়ে বেরোতে দেখে লালমোহন বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, “আবার নতুন কেস?”

ফেলুদা গম্ভীর হয়ে বলল, “কোন প্রশ্ন নয় লালমোহন বাবু, তাড়াতাড়ি হরিপদ বাবু কে গাড়ী স্টার্ট দিতে বলুন। আমরা এক্ষুনি বেরোচ্ছি। আপাতত আপনাকে এটুকু বলতে পারি, সিধু জ্যাঠা নিখোঁজ!”

“সিধু জ্যাঠা মানে, সেই লিভিং এন্সাইক্লপেডিয়া?” জটায়ুর মুখ হাঁ...

পথে ফেলুদা আর কোন কথা বলেনি, জটায়ু কয়েকবার উসখুস করছিলেন, কিন্তু আমাদের দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে চুপ মেরে গেলেন। একবার শুধু দেখলাম ডায়রিটা খুলে চুপি-চুপি কি যেন লিখছে। উঁকি মেরে দেখলাম, লিখেছে, “সিধু জ্যাঠার সন্ধানে।”

সিধু জ্যাঠার বাড়ীতে পৌঁছে প্রথমেই দেখা হল অজিত বাবুর সঙ্গে। বয়স আন্দাজ সিধু জ্যাঠারই মত। লম্বা গড়ন, গায়ের রঙ ফর্সা, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। উনি বেশ বিচলিত মনে হল। যা বললেন তার সারমর্ম হল এই-
কাল রাতে উনি সিধু জ্যাঠার সাথে রাত নটা অবধি দাবা খেলে বাড়ী ফিরেছেন। তারপর আজ সকালে জ্যাঠার চাকর এসে তাঁকে খবর দেয় যে জ্যাঠাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

ফেলুদা সোজা সিধু জ্যাঠার শোবার ঘরে ঢুকে গেল। চারিদিক তাকিয়ে বলল, “ হুম, বিছানা দেখে মনে হচ্ছে, রাতে জ্যাঠা বিছানায় শোননি।”

ফেলুদা অজিত বাবুর দিকে ঘুরে বলল, “ কই, চিঠি টা দেখি।” আমি আর জটায়ু পাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সিধু জ্যাঠা লিখেছেন –

“ফেলু কাল রাতে আমায় এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। গলা শুনে মনে হল বয়স ৭০ এর কাছাকাছি। নাম বললেন তারিণী চরণ ব্যানার্জি। বাসা কলেজ স্ট্রীটের বেনেতলা লেনে। ওই যেখানে আনন্দ পাবলিশার্সের অফিস। উনি কার কাছে থেকে যেন আমার নাম শুনেছেন, এটাও শুনেছেন যে আমার হবি হল বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। তাই আমার সাথে উনি দেখা করতে চান। ফোনে যেটুকু জানলাম তা হল এই... উনি ওনার কর্মজীবনে ভারতবর্ষের প্রায় তেত্রিশটি শহরে ছাপ্পান্ন রকম কাজ করেছেন। তাই ওনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও কিছু কম নয়। এখন উনি শয্যাশায়ী, acute arthritis এ ভুগছেন। তাছাড়াও বয়স জনিত আরো নানা অসুখে জর্জরিত। তাই নিজে আমার সাথে দেখা করতে আসতে পারছেন না। ওনার ইচ্ছে, উনি নিজের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে যেতে চান। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য ওনাকে অনুমতি দিচ্ছে না। তাই তিনি আমার সাহায্য চান। সাহায্যটা ঠিক কি ধরনের সেটা আমিও জানিনা, তবে লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তুমি তো আমায় চেনো ফেলু। যাইহোক তাই দেরি না করে আজ রাতেই রওনা হয়েছি। কাউকে খবর দেবার সময় পেলাম না। তাই তোমার নামে চিঠিখানা রেখে গেলাম। আমার জন্য চিন্তা কোর না। আমার কোন বিপদ হবে না। ভদ্রলোক যে ক্রুড নন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এটুকু অব্জারভেশন আমার আছে।

ইতি আশীর্বাদক
সিধু জ্যাঠা।

পুনশ্চঃ তুমিও পারলে চলে এসো, এমন সুযোগ হারিও না ফেলু...

ফেলুদা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে, ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ওঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। জটায়ু দেখলাম সিধু জ্যাঠার স্ক্র্যাপ-বুক এর আলমারির গায়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছেন, আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছেন, " ওহ! encyclopedia britaniya!!!"

হঠাৎ ফেলুদা লাফিয়ে উঠে পড়ল, " লালমোহন বাবু চলুন... তোপসে চল"

অজিত বাবু হতভম্ব হয়ে বললেন " পুলিশ কে একটা খবর..."

"না মিস্টার পাকড়াশি, তার কোন দরকার নেই মনে হচ্ছে... আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখন চলি। আপনি চিন্তা করবেন না।"

গাড়ীতে উঠে ফেলুদা বলল, " হরিপদ বাবু, সোজা কলেজ স্ট্রিট।" তারপর জটায়ুর দিকে তাকিয়ে বলল, " আপনার গাড়ীটা খুব কাজে দিচ্ছে মশাই।"

জটায়ু এক হাত লম্বা জিভ কেটে বললেন, " আমার নয়, বলুন আমাদের... মানে three musketeers–এর... হে হে হে।"

গাড়ী এসে মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের সামনে দাঁড়ালো। একটু এগোলেই বেনেতলা লেন, কিন্তু এত সরু গলিতে গাড়ী ঢুকবে না। তাই আমরা নেমে পড়লাম। বেনেতলায় এর আগে আমি আর ফেলুদা অনেকবার এসেছি। এখানেই আনন্দ পাবলিশার্সের অফিস, যারা আমার লেখা ফেলুদার বই প্রকাশ করেন। গলির মুখেই বড় করে লাল সাইন বোর্ড লাগানো। গলি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা ছোট চায়ের দোকানে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। "আচ্ছা, তারিণী চরণ ব্যানার্জির বাড়ীটা কোন দিকে? সত্তরের কাছাকাছি বয়স..."

ওপাশ থেকে একজন উত্তর দিল, "কে,আমাদের তারিণী খুড়ো? সোজা গিয়ে ডানদিকের পুরনো সাদা বাড়ীটা। সামনে একটা কল আছে দেখবেন।"

আমরা তিন জন এগিয়ে গেলাম... পিছন থেকে জটায়ুকে বলতে শুনলাম, "highly suspicious." কে জানে হয়তো ওই চা ওয়ালা কে সন্দেহ করছেন!

নির্দিষ্ট বাড়ীর সামনে এসে ফেলুদা কড়া নাড়ল। মিনিট খানেক বাদে এক বৃদ্ধা এসে দরজা খুললেন। বললেন, "কাকে চাই বাবা?"

"তারিণী বাবু বাড়ী আছেন? ওনার সাথে একটু দেখা করতে চাই।"

বুড়ী দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, "ভিতরে এস বাবারা।"

জটায়ুকে আর এক বার "highly suspicious" বলতে শুনলাম। কিন্তু কাকে বললেন- বুড়ীকে নাকি সে চা ওয়ালা- সেটা ঠিক বুঝলাম না।

বাড়ীটা বেশ পুরনো, চারিদিকে দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। সিঁড়ি বেয়ে আমরা তিন জন বুড়ীর পেছন-পেছন দোতালায় উঠে এলাম। বুড়ী ফেলুদা কে বললেন, উনি ওই ঘরে শুয়ে আছেন, অসুস্থ... তোমরা যাও বাবা।"

ফেলুদা ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, পেছনে আমি, সব শেষে জটায়ু উঁকি মারছেন। খপ করে জটায়ু আমার হাতটা চেপে ধরলেন...

"ভেতরে আসতে পারি?" ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

“আরে এসো এসো ফেলু, আমি জানতাম তুমি না এসে পারবে না।” সিধু জ্যাঠা চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। সিধু জ্যাঠার হাতে একটা পুরনো আমলের পিস্তল। সেটা হঠাৎ জটায়ুর দিকে তাক করে চেঁচিয়ে বললেন, “আপনি তো মিস্টার সম্পাতির ছোট ভাই?”

জটায়ু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুহাত ওপরে তুলে বললেন, আজ্ঞে স্যার, ...মানে আমার তো কোন ভাই নেই। আমি বাপ মায়ের এক মাত্র ... মানে ইয়ে ... মানে সন্তান।”

সিধু জ্যাঠা হাসতে হাসতে বললেন, “হাত নামান লালমোহন বাবু, ভয়ের কিছু নেই। এতে গুলি নেই। জটায়ু কে ছিলেন জানেন?”

লালমোহন বাবু ঢোঁক গিলে বললেন, “ আজ্ঞে, মহাভারতের থুড়ি রামায়ণের একটি চরিত্র... মানে বার্ড, মানে বার্ড ক্যারেক্টার, যিনি সীতা হরণের সময় রাবণকে বাধা দিয়েছিলেন।”

“কারেক্ট! আর সম্পাতি হল সেই জটায়ুর বড় দাদা... কি বুঝলেন?”

জটায়ু হাত নামিয়ে বললেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ দাদা... মানে স্যার!”

এবার আমাদের চোখ গেল ঘরের ভিতর উপস্থিত অন্য মানুষটির দিকে। সিধু জ্যাঠা বললেন, “আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হলেন শ্রী তারিণী চরণ ব্যানার্জি যার কথা তোমায় লিখেছিলাম। আর এই হল ফেলু, মানে শ্রীমান প্রদোষ চন্দ্র মিত্তির।”

বিছানায় যে ভদ্রলোক শুয়ে আছেন, তাকে দেখে মনে হয় বয়স ৭৫/৮০ এর কাছাকাছি। কিন্তু চোখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল। ফেলুদাকে আর আমাদের বসতে বললেন। আমরা তিনজন তিনটি চেয়ার টেনে বসলাম। সিধু জ্যাঠা খাটের পাশে, নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

তারিণী বাবু বললেন, “আমি আপনার বিস্তর নাম শুনেছি। আপনার মত একজন স্বনামধন্য গোয়েন্দার সাথে আলাপ হয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। আমি তো আজকাল আর বাইরে বেরোতে পারিনা। গেঁটে বাতে সারা শরীর কাবু। বই আর খবরের কাগজেই যা কিছু জানতে পারি। ওই দেখুন আমার বইয়ের আলমারি।”

ফেলুদা বলল, “সিধু জ্যাঠার চিঠিতে আপনার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমিও ভক্ত হয়ে উঠেছি। এদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই, এই হল আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ আর উনি হলেন লালমোহন গাঙ্গুলি। পেশায় একজন শিশু সাহিত্যিক। জটায়ু ছদ্মনামে বই লেখেন।”

তারিণী বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, “আপনি জটায়ু? আজ আমার কি সৌভাগ্য! এতজন বিখ্যাত মানুষের পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়ল। প্রখর রুদ্রের বই আমি কিছু কিছু পড়েছি। প্রথম দিকের গল্পগুলো বাদ দিলে ইদানীং আপনার লেখা বেশ চৌকস হয়ে উঠেছে।”

লালমোহন বাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, “হে হে, মানে সবই ফেলু বাবুর জন্য ইয়ে আরকি।”

তারিণী বাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার লেখাও বেশ পাকা তপেশ রঞ্জন। ফেলুদার গল্পগুলো ভালই লিখছ আজকাল।”

এবার সিধু জ্যাঠা হাতের পিস্তলটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে বলল, “ এটা কি জান ফেলু?”

ফেলুদা সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, “মনে হচ্ছে একটা ডুয়েলিং পিস্তল। জোসেফ ম্যান্টনের ছাপ মারা। এর জুড়িটা কোথায়?”

“এই যে এখানে,” বলে সিধু জ্যাঠা খাটের পাশে রাখা একটা মেহেগেনি কাঠের বাক্স থেকে আরেকটা পিস্তল বার করলেন। হুবহু একই দেখতে।

জটায়ু সেটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, তারপর নেড়েচেড়ে দেখে আমার হাতে দিলেন। প্রায় সতেরো ইঞ্চ লম্বা, ভারি পিস্তল। আশ্চর্য সুন্দর জিনিস, সত্যি যাকে বলে অ্যান্টিক পিস্। "এ জিনিস কোথায় পেলেন?" ফেলুদা সিধু জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করল।

"এই ভদ্রলোকের কাছে," সিধু জ্যাঠা হাসলেন। "আর এর সাথে যে জড়িয়ে আছে ডুয়েলিং- এর ঘটনা, সেটাও অনবদ্য। তারিণী বাবু আমার মতই অকৃতদার এবং জ্ঞান-পিপাসু। শুধু আমার সাথে তফাত একটাই, আমি চিরকাল ঘরকুনো, আর ইনি, যাকে বলে একজন পর্যটক, ভ্রমণ-পিপাসু মানুষ। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ ঘুরতে বাকি রাখেননি। কিছুটা ভ্রমণের নেশায়, কিছুটা অবশ্য পেশার কারণে। আর সেসব পেশাও বিচিত্র রকমের। কোন বাঙালি জীবনে এত রকমের কাজ করছেন বলে আমি অন্তত শুনিনি।"

জটায়ু এতক্ষন হাঁ করে শুনছিলেন। এবার একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, " আজ্ঞে, এই বন্দুক, থুড়ি পিস্তলটা দিয়ে DUAL না কি যেন বললেন, সেটার কথা এবার বলুন।"

ফেলুদা বলল, " ওটা DUAL নয় লালমোহন বাবু, কথাটা হল "DUEL", যার মানে হল দ্বৈত যুদ্ধ। আর DUAL মানে হল ডাবল।"

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ ফেলু। যাইহোক শুনুন তবে জটায়ু বাবু..." সিধু জ্যাঠা বলতে শুরু করলেন। "আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে কোন এক ১৬ অক্টোবর, লখনউ শহরে এই পিস্তল জোড়া নিয়ে ডুয়েল লড়েছিলেন দুই জন ইংরেজ সাহেব। একজন হলেন শিল্পী জন ওয়েলিংওয়ারথ্ আর অন্যজন হলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন চার্লস ব্রুস। তারিণী বাবু এই পিস্তল কিনেছিলেন লখনউ-এর এক অকশনের দোকান থেকে। এতক্ষন সেই রোমাঞ্চকর গল্পই পড়ছিলাম এই পাণ্ডুলিপি থেকে। তারিণী বাবুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অফুরন্ত। তার সামান্যই তিনি এই খাতায় লিখে উঠতে পেরেছেন এখন অবধি।কাল সারা রাত যেটুকু পড়লাম, তাতে বুঝলাম, এ শুধু আরব্য রজনীর একটি রাত, এখনও এক হাজারটি রাত বাকি। তাতেও ওনার ভাণ্ডার ফুরোবে কিনা সন্দেহ। আর ওনার সংগ্রহও কিছু কম নয়। যেমন এই পিস্তল, বিখ্যাত ক্রিকেটার রঞ্জির নিজের ব্যবহার করা ব্যাট, মুঘল যুগের আংটি, না জানি আরও কত কি !"

বলতে বলতে সিধু জ্যাঠা আর একটা ছোট বাক্স থেকে বার করলেন একটা চোখ ঝলসানো সোনার আংটি। মাঝখানে হীরে আর তার চারপাশে পান্না বসানো। ফেলুদার দিকে সেটা এগিয়ে দিলেন।

"যুবক বয়সে ইনি একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।" সিধু জ্যাঠা বলতে আরম্ভ করলেন। "নাম আলমগীর, নায়ক শ্রী রমণী মোহন। তখন সবে 'টকি' ছবি এসেছে। সে ছবি অবশ্য আমিও দেখেছি। তখনকার দিনে বেশ নাম ডাক হয়েছিল। যাকে বলে হিট ছবি। কিন্তু যে আশ্চর্য খবরটা এনার কাছে জানলাম, তা হল নায়কের ভুমিকায় রমণী মোহন নয়, অভিনয় করেছিলেন এই তারিণী চরণ। পাবলিকের কাছে এই রহস্য, রহস্যই থেকে গেছে। সেই সুত্রে এই মোঘলাই হীরের আংটি তারিণী বাবুর হাতে আসে।"

এমন সময় সেই বুড়ী একটা ট্রেতে চার কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সম্ভবত ইনি তারিণী বাবুর দেখা শোনা করেন।

"নিন, সকলে চা নিন।" তারিণী বাবু বিছানায় উঠে বসলেন। আমরা সবাই চা খেতে খেতে আরো অনেক গল্প শুনলাম। তারিণী বাবুর জীবনের নানান রোমাঞ্চকর ঘটনা। উনি আসলে ওপার বাংলার মানুষ। খুব কম বয়সেই কলকাতায় চলে আসেন সপরিবারে। তারপর এখানেই পড়াশোনা শেষ করে চাকরির ধান্দায় বেরিয়ে পড়েন। কখনও নেটিভ স্টেটে ম্যানেজার, কখনো বা কোন ছবির অভিনেতা অথবা যাদুকরের সেক্রেটারির কাজ করেছেন। আবার এক জায়গায় কিছুদিন প্রাইভেট টিউটরের কাজও করেছেন। বেশিরভাগটাই সিধু জ্যাঠা বললেন। মাঝে মাঝে তারিণী বাবু দুই একটা

কথা যোগ করছিলেন। ভদ্রলোক একসাথে বেশিক্ষন কথা বলতে পারছিলেন না। হাঁপের টান উঠছিল। শুনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল যে উনি কিভাবে ডাকাত তোতা সিং–এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিভাবে এক মৃত মানুষের কঙ্কালের সদ্গতি করেছিলেন, এছাড়াও মানুষখেকো বাঘ শিকারের গল্প, পাঁচ দিন কা বাদশা হবার ঘটনা, আলমগীরের অভিনয় করার নানা রকম অভিজ্ঞতা, এরকম আরো কত কি !

লালমোহন বাবু সব কিছু বেশ উৎসাহ নিয়ে শুনছেন। মাঝে মাঝে ওনার ডায়রিটা বের করে, তাতে কীসব যেন লিখে নিচ্ছিলেন। এখন দেখছি ওটা কোলের ওপর খুলে রেখে, হাঁ করে সিধু জ্যাঠার কথা শুনছেন। আসলে তারিণী বাবুর গল্পে এতো কিছু রসদ রয়েছে, গল্প লেখার জন্য নানা রকমের খোরাক দরকার হয়। তাই, লালমোহন বাবু সব সময় সঙ্গে একটা ডায়রি নিয়ে ঘুরেন। আর কিছু তথ্য পেলেই লিখে রাখেন। ওনার আরেক বাতিক হল অনুপ্রাস করে গল্পের নাম দেওয়া, যেমন "সাহারায় শিহরণ" , 'হন্ডুরাসে হাহাকার', 'বিদঘুটে বদমাশ', 'দুর্ধর্ষ দুশমন' ইত্যাদি। লালমোহন বাবুর নোটবুকে উঁকি দিলাম, দেখলাম অনেক কিছু লিখেছে। তার মধ্যে কয়েকটার তলায় আবার আন্ডারলাইন করা, যেমন 'আলমগীরের আংটি', 'মানুষখেকোর মস্তানি', 'ডাকাবুকো ডাকাত'... এগুলো বোধহয় গল্পের সম্ভাব্য শীর্ষক।

সেদিন মাত্র লালমোহন বাবু ফেলুদা কে বলছিলেন যে এবার সামনের পুজোয় কি লিখবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এখনও কোন জম্পেশ প্লট মাথায় আসেনি। অথচ ফি বছর পুজোয় আর পয়লা বৈশাখে একটা করে প্রখর রুদ্র বাজারে না ছাড়লেই নয়। পাঠকরাও আশা করে বসে থাকে, তাছাড়া প্রকাশকরাও চাপ দেয়। ভদ্রলোক সেদিন বেশ চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, জটায়ুর মাথায় প্লট গিজগিজ করছে!

শুনতে শুনতে আমাদের অনেক বেলা হয়ে গেল। এবার আমাদের ফিরতে হবে কারণ তারিণী বাবুরও এবার বিশ্রাম দরকার। কিন্তু একটুও উঠে আসতে ইচ্ছে করছে না। লালমোহন বাবুকেও বেশ ব্যাজার দেখালো। উনি একেবারে তারিণী বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম টনাম করে একশা! যাইহোক আমরা আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এলাম। চলে আসার আগে ফেলুদা নিজের কার্ডটা দিয়ে এল তারিণী বাবু কে, "যে কোন সময় আমায় প্রয়োজন হলে, ফোন করবেন।"

তারিণী বাবু মৃদু হেসে বললেন, "প্রয়োজন টা খুব শিগগিরই হবে বলে আমার বিশ্বাস প্রদোষ বাবু। কারণ টা আপনাকে সিদ্ধেশ্বর বাবু পরে বুঝিয়ে দেবেন।"

সিধু জ্যাঠা বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন তারিণী বাবু। ফেলু যখন আছে, আপনার কোন চিন্তা নেই।"

আমরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম সেই বুড়ী আমাদের দেখে থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। জটায়ু আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বললেন, " দেখলে তো তপেশ ভায়া, আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনছিল। হাইলি সাস্পিশাস!"

আমরা তারিণী বাবুর বাড়ীর গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এলাম। জটায়ু তাঁর গাড়ী নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। বললেন তাঁর নাকি এখন অনেক কাজ। বিকেল বেলা আবার আসবেন। আমরা তিনজন একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। সিধু জ্যাঠা বললেন, "তোমায় এবার আসল কথাটা বলি শোনো ফেলু। তারিণী বাবুর মুল উদ্দেশ্য কিন্তু আমার সাথে দেখা করা নয়। উনি আসলে তোমার সাহায্য চান। কিন্তু তোমার সাথে যোগাযোগ করতে না পারায় উনি কাল রাতে আমায় ফোন করেছিলেন। ফোনেই আমায় সব কথা বললেন। কাল রাতে আমি তোমায় ফোন করেছিলাম, কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করেও তোমার লাইন পাইনি।"

"হ্যাঁ, আমার ফোনটা কয়েকদিন হল খারাপ ছিল। আজ সকালেই ঠিক হয়েছে।"

"যাইহোক, তাই আমি আর দেরী না করে, তোমার নামে খাম বন্ধ চিঠিটা লিখে চলে আসি। চিঠিতে আসল কথাটা লিখতে সাহস পাইনি। আমি জানতাম চিঠি পেলে তুমি ছুটে চলে আসবে।"

"ওঁকে কি কেউ হুমকি দিচ্ছে?"

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। উড়ো ফোন এবং চিঠি দুই-ই আসছে গত দু মাস ধরে। এই দেখ হুমকি চিঠি গুলো।" সিধু জ্যাঠা চারটে চিরকুট দিলেন।

একটায় লেখা, " সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে...পুলিশ কে খবর দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই।" পরেরটায়, "প্রত্যেকটা মালের জন্য মোটা টাকা পাবেন, যা পাবেন, তা বাকি জীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেয়েও শেষ করতে পারবেন না।" আরেকটায় লেখা, "আমাদের কাছে পাকা খবর আছে, আমরা ইচ্ছে করলে আপনার গলার নলি কেটে, সিন্দুক লুট করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমরা খুন খারাপি চাই না। ভালোয়-ভালোয় মালগুলো আমাদের দিয়ে দিন। তাতেই আপনার মঙ্গল।" আর শেষ চিরকুটটায় লেখা, "আপনাকে আর এক সপ্তাহ সময় দিলাম। তারপর যা করার, আমরা করব।"

ফেলুদা চিরকুটগুলো পড়তে পড়তে বলল, "এরকম হুমকি পাওয়াই স্বাভাবিক কারণ মিস্টার ব্যানার্জির কাছে যেসব মুল্যবান জিনিস আছে দেখলাম, আন্তর্জাতিক বাজারে তার দাম কম করেও কয়েক কোটি টাকা। সবই তো প্রায় দুর্মূল্য অ্যান্টিক। চোরাকারবারিদের নজর তো পড়বেই! আর তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও আমার চোখে পড়ল, যার জন্য সন্দেহটা আরো দৃঢ় হল..."

"সেটা কি?" সিধু জ্যাঠা চমকে উঠলেন।

"আমরা এখানে আসার সময় যে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে মিস্টার ব্যানার্জির ঠিকানা জিজ্ঞেস করছিলাম, সেখানে একটা ছেলে কাগজ পড়ছিল। আমরা যখন মিস্টার ব্যানার্জির বাড়ীর কড়া নাড়ছি, তখন দেখলাম ওই ছোকরা উল্টোদিকের বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। তার মানে সে আমাদের পিছু নিয়েছিল। বাড়ী থেকে বেরোনোর সময় সেই ছোকরাকে আবার দেখলাম পাশের বাড়ীর রকে বসে আছে।"

সিধু জ্যাঠা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তো চিঠিতে তোমায় পুরো ঠিকানা লিখে দিয়েছিলাম, তাহলে তোমায় বাড়ী খুঁজতে হল কেন ফেলু?"

"উঁহু, আপনি তো শুধু বেনেতলা লেন বলেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর কিছু তো লেখেননি!"

"না, আমার যেন মনে হচ্ছে, আমি বাড়ীর নাম্বারও লিখেছি!"

ফেলুদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোপসে, চিঠিটা চট করে পকেট থেকে বার করে জ্যাঠাকে দেখা তো..."

সিধু জ্যাঠা বললেন, "থাক থাক... আর দেখাতে হবে না। হয়তো আমিই লিখতে ভুল করেছি। আসলে বয়স হয়েছে তো! ওসব এখন ছাড়ো। আমাদের এই মুহূর্তে কি করা উচিত সেটাই এখন ভাবতে হবে। তুমি কি বল ফেলু?"

"সবচেয়ে আগে জানা দরকার, তারিণী বাবু কি কাউকে সন্দেহ করেন?"

"হ্যাঁ,করেন। তারিণী বাবুর বাড়ীতে যে বুড়ীকে দেখলে, নাম মোক্ষদা, সে তারিণী বাবুর দেখাশোনা করে বহু বছর ধরে। তার এক অপগন্দ বাপ-মা মরা নাতি আছে। বয়স বাইশ বছর, নাম বিষ্ণু। খুব অল্প বয়স থেকেই তারিণী বাবুর বাড়ীতেই থাকতো। তারিণী বাবু ছেলেটির লেখা পড়ারও ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেটি ক্রমশ বদসঙ্গে মিশে বখে যাওয়ায় এবং চুরি চামারি করায়, তারিণী বাবু তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন। তারপর থেকে সে বেশ কিছুদিন উধাও ছিল।

হঠাৎ মাস দুয়েক আগে সে ফিরে আসে। তারিণী বাবুর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চায়। বলে জুয়া খেলে নাকি অনেক দেনা হয়েছে। এও বলে যে, আর সে খারাপ কাজ করবে না, তারিণী বাবুর কাছেই থাকবে। কিন্তু তারিণী বাবু রাজী না হওয়ায় সে ওঁকে শাসানি দিয়ে চলে যায়। বলে খুব শিগগিরই আপনার চরম ক্ষতি হবে। আর তারপর থেকেই সেই উড়ো চিঠিগুলো আসতে শুরু করে।”

“কিন্তু এ দুটো ঘটনা তো কাকতালীয়ও হতে পারে। কারণ সেই ছেলেটির চুরি করার সুযোগ তো আগেই ছিল, যখন সে ওই বাড়ীতেই থাকতো।”

“তাও অবশ্য হতে পারে। কিন্তু আগে হয়তো তার প্রয়োজন হয়নি।”

“আর কেউ কি তারিণী বাবুর এই সম্পদের কথা জানে? মানে ওঁর কোন আত্মীয় বা বন্ধু?”

“আসলে তারিণী বাবু অনেকদিনই বাতে শয্যাশায়ী। যৌবনে সারা দেশ চষে বেড়িয়েছেন। কোথাও বেশিদিন থাকেননি। তাই আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। শুধু বালিগঞ্জে আগে যাতায়াত করতেন এক পরিচিতের বাড়ী। সেখানে কিছু ছোট ছোট ছেলে, ওনার গল্পের খুব ভক্ত ছিল। তাদেরই গল্প শোনাতে যেতেন। এখন অবশ্য তারা আর কেউ ছোট্ট-টি নেই, সব বড় হয়ে গেছে। সবাই প্রায় বিদেশে, কেউ ডাক্তার, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। তারা অবশ্য এসবের কথা জানে। এছাড়া পরিচিত বলতে কলকাতা শহরে তেমন কেউ নেই...”

“আর উড়ো ফোনের কথা কি যেন বলছিলেন?” ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ, হুমকি চিঠির পাশাপাশি, উড়ো ফোনও আসতে থাকে। তার ভাষাটা অনেকটা ওই চিঠিগুলোর মতই।”

“হুম, আর কিছু?”

“ও হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার,” সিধু জ্যাঠা চেঁচিয়ে উঠলেন, “মাস চারেক আগে, তারিণী বাবু ‘টেলিগ্রাফ’ কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার এই সংগ্রহের ব্যাপারে। উদ্দেশ্য ছিল, যদি কোন মিউজিয়াম বা আর্কাইভ কিংবা সরকার থেকে এই বিপুল সংগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া হয়। কিন্তু কাজের কিছুই হয়নি। সুতরাং, যারা এই খবর পড়েছে, তাদের কাছেও এটা অজানা নয়!”

“হুম, ওই সময় একটা কেসের ব্যাপারে আমি কিছুদিন কলকাতার বাইরে ছিলাম, তাই হয়তো খবরটা চোখে পড়েনি।” ফেলুদা গম্ভির হয়ে বলল।

“এই খবর বেরোনোর এক সপ্তাহ বাদে এক সাহেব আসেন তারিণী বাবুর বাড়ী। নাম মাইকেল স্টলিংস। নিজের পরিচয় দেন একজন আমেরিকান ধনকুবের হিসেবে। তাঁর নাকি শখ হল নানান দেশের মুল্যবান অ্যানটিক সংগ্রহ করা। তিনি আলমগীরের আংটি আর ডুয়েলিং পিস্তলের জন্য তিরিশ লক্ষ টাকার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তারিণী বাবু রাজী হননি। কারণ তিনি চাননি, যে দেশের সম্পদ দেশের বাইরে যাক।তার পরেও ভদ্রলোক আরো বার তিনেক এসেছিলেন তারিণী বাবু কে রাজী করানোর জন্য কিন্তু কোন ফল হয়নি।”

“তাহলে তো সন্দেহের তালিকা বেশ দীর্ঘ!” ফেলুদা কে বেশ চিন্তিত দেখালো।

“কিন্তু এভাবে তো বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করে লাভ নেই ফেলু। এখন আমাদের কি করা উচিত সেটাই বল। দেশের সম্পদ এইভাবে চোর-ছ্যাঁচোড় আর স্মাগলারদের হাতে তুলে দেওয়া যায়না। কোহিনুর তো গেছেই, এবার কি আলমগিরও যাবে?”

“আমার মনে হয় আমাদের এক্ষুনি কলকাতা জাদুঘরের অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। উনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন।”

“ঠিক বলেছ ফেলু, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপও আছে, নাম

সমরেশ বিশ্বাস। আমি কালকে একটা চিঠি লিখে দেব ওনার নামে। তুমি সেটা নিয়ে গিয়ে সোজা ওঁর সাথে দেখা করবে।”

সিধু জ্যাঠার বাড়ীর কাছাকাছি ওঁকে নামিয়ে আমাদের ট্যাক্সি বাড়ীর দিকে গেল।

সারাদিন ফেলুদা চুপচাপ শুয়ে রইল এবং একটার পর একটা চারমিনার ধ্বংস করে গেল। বিকেলে আমি আর না থাকতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, “এতো কি ভাবছ ফেলুদা? তারিণী বাবুর সম্পদগুলো আমরা যদি ভালোয় ভালোয় কোন মিউজিয়াম বা আর্কাইভে দিয়ে দিতে পারি তাহলেই তো আর কোন চিন্তা নেই। তারপর সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তো তাদের।”

“হুম, সেটা ঠিক। কিন্তু শত্রুরা যে প্রতিশোধ নেবার জন্য তারিণী বাবুকে কিছু করবে না, তার গ্যারান্টি কি? ওদের এতো চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে, সেটা কি ওরা মেনে নেবে?”

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, “কিন্তু শত্রু তো আমাদের হাতের সামনেই রয়েছে। বুড়ীর বখাটে নাতি বিষ্ণু। তাকে গ্রেফতার করলেই হয়।”

“কিন্তু আমাদের কাছে ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। আর এও হতে পারে বিষ্ণু শুধু টাকার বিনিময়ে কাজ করছে। হয়তো তার পিছনে অন্য কোন রাঘব বোয়াল আছে, কারণ এতো টাকার মাল লোকাল বাজারে বিক্রি করা চুনোপুঁটিদের কাজ নয়। তার জন্য বড় নেটওয়ার্ক দরকার। আর দরকার অনেক টাকা আর ইনফ্লুএন্স। কিন্তু আরো কয়েকটা বিষয়ে খটকা রয়েছে...”

“আবার কিসের খটকা?”

“এক নাম্বার, সিধু জ্যাঠার এতো ভুল হবে কেন? দুই, আমেরিকান সাহেব এতো তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিল কেন? নাকি তার অন্য কোন মতলব আছে? আর সে যদি এতো ধনী হয়, তাহলে সেক্রেটারি না পাঠিয়ে ফস করে নিজে এল কেন? তিন, বিষ্ণু তারিণী বাবুর ক্ষতি করতে চায় কেন? কি ক্ষতি? তাহলে কি বুড়ী মোক্ষদা সব কিছুই জানে? চার, হুমকি চিঠি আর ফোন কে দিচ্ছে? বিষ্ণু না অন্য কেউ!”

ফেলুদা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল, “নাহ, খটকাগুলো দূর করা দরকার। তোপসে, আমি একটু বেরোচ্ছি। সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসব। জটায়ুকে বসতে বলিস।”

“কিন্তু লালমোহন বাবু তো বললেন বিকেলে আসবেন। এখুনি তো প্রায় চারটে বাজে!”

ফেলুদা পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে বল, “জটায়ু সন্ধ্যের আগে আসতে পারবেন না, দেখে নিস!”

আমার আর কোন কাজ ছিল না, তাই পুরনো কাগজের ঢাই থেকে তারিণী বাবুর লেখাটা খুঁজতে শুরু করলাম, কিন্তু পেলাম না। এতো পুরনো কাগজ...

সন্ধ্যে সাতটায় লালমোহন বাবু এলেন, হাতে এক ঠোঙা ডালমুট। ঢুকেই বললেন,”ইস, অনেক দেরী হয়ে গেল। তপেশ ভায়া, শ্রীনাথ কে বল চায়ের জল চাপাতে। দারুন খবর আছে।”

আমি হেসে বলাম, “শ্রীনাথ আপনার গাড়ীর হর্ন শুনেই রান্নাঘরে চলে গেছে! ভালো খবরটা কি? নতুন গল্পের প্লট পেয়েছেন বুঝি?”

জটায়ু চোখ কপালে তুলে বলেন, “ওরে বাবা, তোমার সাথে সাথে শ্রীনাথও বেশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে দিন-দিন! আমি হলপ করে বলতে পারি ব্যোমকেশের পুঁটিরাম এতো বুদ্ধিমান ছিল না। একেই বলে,সৎসংঘে স্বর্গবাস!”

“কথাটা সংঘে নয় লালমোহন বাবু, সঙ্গে, মানে COMPANY.”

লালমোহন বাবু থতমত খেয়ে বললেন, "ওহ তাই বুঝি? তা তোমার দাদা কোথায়? মানে প্লটটা একবার ওঁকে শোনাতাম আর কি, হে হে..."

"ফেলুদা একটু বেরিয়েছে। এক্ষুনি ফিরবে। আপনাকে বসতে বলেছে।"

লালমোহন বাবু গলা নামিয়ে বললেন, "তোমার দাদা বুঝি তারিণী বাবুর কেসটা নিয়েছেন? আমি জানতাম নেবেন।"

"আপনি কি করে জানলেন? তারিণী বাবু আসলে আমাদের কেন ডেকেছিলেন আপনি জানেন?"

"ওই যে বললাম, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস! আরে বাবা, আমারও তো গ্রে ম্যাটার বাড়ছে। আসলে কি যান তপেশ ভায়া, ফেলুবাবু যেখানে, রহস্য সেখানে! আরে বাবা, নয় নয় করে তো এতগুলো বছর হয়ে গেল তোমার দাদাটিকে দেখছি।"

ফেলুদা এল সাড়ে সাতটায়। এসেই লালমোহন বাবুকে বলল, " কি মিস্টার জটায়ু, নতুন গল্পের নামকরণ হল?"

জটায়ু এক গাল হেসে বলেন, "ইয়ে, মানে , একটা নাম ভেবেছি, 'পর্যটকের বিপর্যয়'। মানে একজন ভূপর্যটককে নিয়ে এবারের গল্পটা ভেবেছি। বিপদে পড়ে এই ভূ-পর্যটক প্রখর রুদ্রের কাছে সাহায্য চাইতে আসবেন..."

"তা ইনি কোন দেশীয়? এস্কিমো না সুইডিশ?

"না না, খাঁটি বাঙালি, আমাদের তারিণী চরণ বাবুর মত। এবারে পুরো গ্লোবটাই কভার করছি। ফ্রম নর্থ পোল টু সাউথ পোল। এভারেস্টের চুড়ো থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ অবধি।"

"বাহ বেশ জমজমাট ব্যাপার তো! এবার আবার তথ্যে কোন গলদ নেই তো?"

"সেটা ভেরিফাই করতেই তো আপনার কাছে আসা। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন আপনার নতুন কেসটার ডিটেল। আমি তো মশাই এখনও অথৈ জলে।" লালমোহন বাবু বেশ আয়েস করে বসলেন গল্প শোনার জন্য।

আরেক রাউন্ড চা খেতে খেতে ফেলুদা জটায়ুকে পুরো ঘটনার বিবরণ দিল। এও বলল যে, স্মাগলাররা এবং এক অ্যান্টিক কালেক্টার তারিণী বাবুর সম্পদগুলো হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এই কথা শুনে লালমোহন বাবু এমন জোরে বিষম খেলেন যে চায়ের কাপ থেকে ছলকে কিছুটা চা পাঞ্জাবীতে পড়ে গেল।

আমি, ফেলুদা দুজনই অবাক! লালমোহন বাবুর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। খানিকটা স্বাভাবিক হওয়ার পর লালমোহন বাবু খসখসে গলায় বললেন, "এরা কি মগনলালের লোক? তাহলে আমি আর এর মধ্যে নেই ফেলুবাবু..."

ফেলুদা বলল,"সেটা অবশ্যই হতে পারে লালমোহন বাবু! তবে আমার ধারণা এরা অন্য লোক এবং এরা মগনলাল মেঘরাজের থেকেও ভয়ঙ্কর। লালবাজারের ইন্সপেক্টর মল্লিক কথা দিয়েছেন যে, ওঁর লোক মিস্টার ব্যানার্জির বাড়ীর ওপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখবে।" ফেলুদা একটা চারমিনার ধরালো, "জট কিছুটা খুলেছে, কিন্তু আরো প্রমাণ দরকার।"

পরদিন সকাল আটটায় সিধু জ্যাঠার ফোন এল। সিধু জ্যাঠা কলকাতার মিউজিয়ামের ডিরেক্টর বিশ্বাস বাবুর নামে চিঠি লিখে ফেলেছেন। তাই আমরা যেন সে চিঠি নিয়ে সত্বর ওঁর সাথে যোগাযোগ করি। আমি আর ফেলুদা জ্যাঠার বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম নটা নাগাদ। উনি চেয়ারে বসে সকালের কাগজ পড়ছিলেন। প্রত্যেকটা খবর খুঁটিয়ে পড়া ওনার অভ্যেস। তাই প্রতিদিন ঝাড়া পাঁচ-ছয় ঘন্টা লাগে পুরো কাগজখানা পড়ে শেষ করতে। আমাদের দেখে চিঠিটা ফেলুদার হাতে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "পড়ে দেখো ঠিক আছে কিনা!"

ফেলুদা চিঠিটা পড়তে লাগল। সিধু জ্যাঠা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি সাকরেদ মশাই! আপনি কেমন আছেন? দেখি আপনার অব্জারভেশন ক্ষমতা কেমন বেড়েছে! একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিই?”

আমি বললাম, “নিন, আমি প্রস্তুত।”

ফেলুদা একবার আড়চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার চিঠিতে মন দিল।

সিধু জ্যাঠা একটা ছোট নোটবুক বার করে আমার হাতে দিলেন, “এটা দেখে বল তো, তুমি কি কি বুঝতে পারছো?”

আমি ভাল করে উল্টে পাল্টে দেখে বললাম, “এটা তো হিসেব লেখার ডায়রি!”

সিধু জ্যাঠা বললেন “কিসের হিসেব?”

আমি বললাম, “দাবা খেলায় হার-জিতের হিসেব। আপনি তো অজিত বাবুর সাথে রোজ রাতে দাবা খেলেন। তারই হিসেব। মানে কে কটা রাউন্ড জিতল সেটাই লেখা।”

“হুম, আর কিছু?”

“হাতের লেখা আপনার নয়, সম্ভবত অজিত বাবুর।”

“বাহ, ব্রাভো! ঠিক ধরেছ। এই ডায়রিটাও অন্যের উপহার দেওয়া। আর ওই যে পেন-স্ট্যান্ডে নতুন বিদেশি কলমটা দেখছে, ওটাও ওরই দেওয়া। দুটো কলমের একটা সেট কিনেছিলেন। একটা আমায় উপহার দিয়েছেন, আর একটা সব সময় ওনার কাছে রাখেন। উনি বলেন ওটা নাকি ফ্রেন্ডশিপ গিফট, বন্ধুত্বর প্রতীক। বিলিতি কেতা আরকি...”

ফেলুদা আমার হাত থেকে ডায়রিটা নিয়ে বলল, “এটাও তো বিদেশি দেখছি।”

“হ্যাঁ, মিস্টার পাকড়াশি কলকাতায় পড়াশোনার পাট চুকিয়ে খুব অল্প বয়সে বিদেশে চলে যান। ওখানেই ব্যবসা করতেন। কলকাতায় পূর্বপুরুষদের ছিল জাহাজের ব্যবসা। তখনকার দিনে কলকাতা শহরের বুকে পনেরো কুড়িটা অট্টালিকা ছিল। তার মানে বুঝতে পারছো? এখন অবশ্য তেমন রমরমা আর নেই। সবই প্রায় গেছে শরীকী গণ্ডগোলে। মাস পাঁচেক হল অজিত বাবু ওখানকার ব্যবসা গুটিয়ে স্থায়ী ভাবে এদেশে চলে এসেছেন। ছেলে পুলে নেই, স্ত্রী অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। তাই কোন পিছুটানও নেই। আমার বাড়ীর দুটো বাড়ীর পরেই ওদের একটা পৈতৃক বাড়ী ছিল। সেটাকেই মেরামত করে বাস করছেন|”

“ইন্টারেস্টিং!” ফেলুদা বলল, “ তা আপনার সাথে কিভাবে আলাপ হল ওনার?”

“আমার সঙ্গে একদিন হঠাৎই মর্নিংওয়াক করতে গিয়ে পার্কে আলাপ। যখন জানলাম উনিও দাবার ভক্ত, তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না। তারপর থেকে প্রায় রোজই রাতে ওনার সাথে এক দান করে দাবা খেলি। ভদ্রলোক ওস্তাদ খেলুড়ে! মাঝে মাঝে আমাকেও মাত দিয়ে দেন!”

ফেলুদা পেন স্ট্যান্ড থেকে বিদেশি কলমটা তুলে নিয়ে একটা কাগজে হিজিবিজি টেনে বলল, “চমৎকার জিনিস!” তারপর সিধু জ্যাঠার দিকে তাকিয়ে বলল, “ অজিত বাবু রোজ কখন আসেন?”

“এই ধরো সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তারপর রাত নয়টা অবধি আমাদের খেলা চলে। কাল উনি আমায় হারিয়েছেন। আজ উনি আসবেন না। আগামি কাল, আমি ওঁকে হারাবো বলে চ্যালেঞ্জ করেছি।”

“আজকের দিন বাদ গেল কেন?”

সিধু জ্যাঠা বললেন,“কি জানি, হয়তো আজ সন্ধ্যায় ওঁর কোন কাজ আছে।”

ফেলুদা চিঠিটা পকেটে পুরে বলল, " আচ্ছা জ্যাঠা, তাহলে আমরা চলি। আপনাকে পরে ফোন করে সব জানাবো।"

এরপর আমি আর ফেলুদা সোজা মিউজিয়ামে চলে গেলাম। ডিরেক্টর লোকটি খুবই অমায়িক। ফেলুদার থেকে অটোগ্রাফ নিলেন। বললেন তার ছোট ছেলেটি নাকি ফেলুদার ভীষণ ভক্ত। উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে খুব শিগগিরই হাইয়ার অথরিটির সাথে কথা বলে একটা ব্যবস্থা নেবেন। আরো চেষ্টা করবেন যাতে তারিণী বাবু এর বিনিময়ে সরকার থেকে কিছু পুরস্কার পান।

মিউজিয়াম থেকে যখন বেরোলাম, তখন দুপুর বারোটা। বাড়ী ফিরে চান করে সবে খেতে বসেছি, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। ফেলুদা এঁটো হাতে উঠে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে ফিরে এসে বলল, "মিস্টার ব্যানার্জি ফোন করেছিলেন। বললেন সেই সাহেব আজ একটু আগেই ফোন করেছিলেন। তিনি নাকি রীতিমত হুমকি দিয়েছেন যে ওই জিনিসগুলো তাঁকে না দিলে ফল ভাল হবে না। তিনি আবার বিকেলে ফোন করবেন।"

"তুমি কি বললে?"

"আমি তারিণী বাবুকে বললাম, মিস্টার স্টলিংস আবার ফোন করলে, আপনি ওনাকে বলবেন যে আপনি ওই অ্যান্টিকগুলো ওঁকে বিক্রি করতে রাজী আছেন। আজ রাত আটটায় পুরো টাকা সঙ্গে নিয়ে আপনার বাড়ী আসতে বলবেন।"

আমি আঁতকে উঠলাম, " সেকি ফেলুদা?"

"লোকটাকে হাতে নাতে ধরার এটাই সবচেয়ে মোক্ষম উপায়। মনে রাখিস আমাদের হাতে এখনও অবধি কোন সলিড প্রমাণ নেই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। আমায় এক্ষুনি বেরোতে হবে। লালবাজারে ইন্সপেক্টর মল্লিক কে একটা খবর দিতে হবে। জটায়ু আর সিধু জ্যাঠাকেও একটা খবর দিতে হবে। আজ রাতেই গল্পের যবনিকা পতন হবে বলে মনে হচ্ছে।"

আমি বললাম, " তাহলে কি মিস্টার স্টলিংসই ফোন আর চিঠিতে হুমকি দিচ্ছেন?

ফেলুদা গম্ভীর হয়ে বলল, " এখন তো তাই মনে হচ্ছে। তবে সেটা প্রমাণ করার মত ক্লু এখনও আমাদের হাতে নেই। আমার সন্দেহ যদি ঠিক হয়, তাহলে অবিশ্যি..." ফেলুদা চুপ করে গেল। জানি এখন ওঁকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। তাই আমিও চুপটি করে খাওয়ায় মন দিলাম।

ফেলুদা চারটে নাগাদ বেরিয়ে গেল। বেরোনোর সময় বলল, "আমি হয়তো আর বাড়ী ফেরার সময় পাবোনা। তুই লালমোহন বাবুকে নিয়ে সাড়ে সাতটা নাগাদ তারিণী বাবুর বাড়ী পৌঁছে যাস। ওখানেই আমি তোদের সাথে দেখা করব। জটায়ু কে সব ঠিক করে বুঝিয়ে বলিস, যেন সব গুবলেট না করে দেন।"

জটায়ু এলেন ঠিক পাঁচটায়। ওঁকে বেশ চনমনে দেখাচ্ছিল। এসেই বললেন, " আমি অ্যাকশান-এর জন্য তৈরি। তোমার দাদা ফোনে যা বললেন, তাতে তো মনে হল আজ একটা মোক্ষম ক্লাইম্যাক্স হবে। তাই আমিও আমার অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

আমি হেসে বললাম, "তা, এবারে কি নিলেন? আবার ভোজালি না বুমেরাং?"

"উঁহু, এইবার এসব কিছু না। তোমার দাদা যে অস্ত্র ব্যবহার করেন, এবারে সেই অস্ত্র..." জটায়ু মুচকি হাসলেন।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "সর্বনাশ! রিভলভার?"

"আরে না ভাই তপেশ। রিভলভার-টিভলভার নয়। ওসব আগ্নেয়াস্ত্র আমার লাগে না। স্রেফ মগজাস্ত্র!"

জটায়ু তার চকচকে টাকের মাঝখানে আঙুল দিয়ে দুটো টোকা মারলেন।

"ওহ তাই বলুন! ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন... এবার শুনুন আমাদের কি করতে হবে..."

"হ্যাঁ, বলো। ফেলুবাবু তো ফোনে ভাল করে কিছুই বললেন না, তুমি আমায় সব ভাল করে বুঝিয়ে দাও। এবারে কোন ভুল হবে না।"

"আমাদের তেমন কিছুই করতে হবে না। আমরা শুধু দর্শক। শুধু বিপদ বুঝে..."

একথা শুনে জটায়ুকে বেশ হতাশ দেখালো। আমি বললাম, "আমরা দুজন সাড়ে সাতটা নাগাদ তারিণী বাবুর ওখানে যাবো। সিধু জ্যাঠাও আসবেন। আজ সেই আমেরিকান সাহেবের আসার কথা ফাইনাল ডিল করার করার জন্য। ব্যাটা কে হাতে নাতে ধরতে হবে। পুলিশ তারিণী বাবুর বাড়ীর ওপর সবসময় নজর রাখছে। ফেলুদাও ওখানেই থাকবে। তাই সব ঠিকঠাক মত হলে, আমাদের তেমন কিছুই করার নেই।"

"আচ্ছা , ইয়ে... মানে হাতেনাতে কথাটার ইংরেজি কি হবে? মানে আমার গল্পের একটা জায়গায় আরকি..."

"আমি হেসে বললাম, " RED-HANDED... হিন্দিতে যাকে বলে 'রঙ্গে হাথো'।"

লালমোহন বাবু ঘুষি পাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। কোন পরোয়া নেই। আমরা তাও রেডি থাকব। সাহেবটাকে RANGE-HANDED ধরা চাই। বিপদ কখন কোনদিক থেকে আসে, কেউ বলতে পারেনা।"

আমরা হাতে সময় নিয়ে ছয়টা পনেরো নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। জটায়ুর গাড়ী আছে, চিন্তা নেই। ঠিক সময় পৌঁছে যাবো। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম, তাই আমাদের বেশ দেরি হয়ে গেল। আমরা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের সামনে গাড়ী থেকে নেমে, সোজা রাস্তায় না গিয়ে, কলেজ রো-এরদিক দিয়ে বেনেতলা লেনে ঢুকে পড়লাম। ফেলুদার সেরকমই আদেশ ছিল। তারিণী বাবুর বাড়ীর কড়া যখন নাড়ছি, তখন ঘড়িতে প্রায় সাতটা পঞ্চাশ বেজে গেছে। লালমোহন বাবুকে ভীষণ নার্ভাস লাগছে।

আমাদের দরজা খুলে দিলেন সেই বুড়ী মোক্ষদা। পেছনে সিধু জ্যাঠা দাঁড়িয়ে,"কি ব্যাপার আপনাদের এতো দেরি?

জটায়ু বললেন, "আর বলবেন না, কলকাতার যা রাস্তা ঘাট! ফেলু বাবু কোথায়?"

"ফেলু ওপরে। তারিণী বাবুর ঘরে। চলুন তাড়াতাড়ি। মিস্টার স্টলিংস এক্ষুনি এসে পড়বেন।"

আমার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। সিধু জ্যাঠা সিঁড়ির মাথা থেকে বুড়ীকে ইশারা করলেন দরজা খোলার জন্য। আর আমাদের বললেন, "চলো তাড়াতাড়ি, তারিণী বাবুর ঘরের ভেতরে একটা ঝুলবারান্দা আছে। সেখানেই আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে।"

আমরা তিনজন ঝড়ের বেগে তারিণী বাবুর ঘরে ঢুকলাম। উনি বিছানায় শুয়ে আছেন। বুক অবধি চাদরে ঢাকা। আমাদের দেখে মৃদু হেসে ঝুলবারান্দার দিকে ইশারা করলেন। আমরা ছুটে গিয়ে বারান্দায় করলাম আর বাইরে থেকে বারান্দার দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। শুধু এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে।

সিঁড়িতে ভারি বুটের আওয়াজ হচ্ছে। আমাদেরও বুকের ধকপকানি বেড়ে যাচ্ছে। লালমোহন বাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "কিন্তু ফেলু বাবু কোথায়?"
সিধু জ্যাঠা পেছন থেকে জটায়ুর মুখ চেপে ধরে ফিসফিস করে বললেন, "চুপ! কোন শব্দ নয়..."

অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়ে আছি। ঘরে প্রবেশ করলেন এক সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গি সাহেব। টকটকে ফরসা গায়ের রঙ, মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, লম্বা জুলপি আর চোখে সোনালি ফ্রেমের সৌখিন চশমা। বয়স মাঝারি। হাতে একটা চামড়া ব্রিফকেসে বোধহয় টাকা আছে।

"মে আই কাম ইন মিস্টার ব্যানার্জি?" গলার স্বর বেশ গম্ভীর। ইংরেজি উচ্চারণ বেশ পরিষ্কার, কাটা, কাটা।

তারিণী বাবুর মুখটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয়,মৃদু হাসলেন। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, "প্লীজ কাম ইন মিস্টার স্টলিংস। প্লীজ বি সিটেড।"

মিস্টার স্টলিংস খাটের পাশে চেয়ারে বসলেন। ভদ্রলোক সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটেন। হয়তো ডান পা-এ কোন অসুখ আছে। ব্রিফকেসটা চেয়ারের পাশে, মেঝেতে রেখে, "গুড ইভনিং মিস্টার ব্যানার্জি।"

তারিণী বাবু খুক খুক করে কাশলেন, "গুড ইভনিং, হাউ আর ইউ মিস্টার স্টলিংস?"

"আই এম ফাইন। বাট ইউ লুক সো সিক টুডে, মিস্টার ব্যানার্জি! হাউএভার, অ্যাট লাস্ট, ইউ হ্যাভ টেকেন অ্যা গুড ডিসিশন টু মেক অ্যা ডিল উইদ মি। আই মাস্ট সে, ইট ইজ অ্যা ফেয়ার অপরচ্যুনিটি ফর ইউ।"

"ডিড ইউ ব্রিং দ্য অ্যামাউন্ট ইন ক্যাশ?" তারিণী বাবু প্রশ্ন করলেন।

"ইয়েস... বাট ফার্স্ট শো মি দ্যাট ডায়মন্ড রিং অ্যান্ড দ্যা ডুয়েলিং পিস্তল!"

তারিণী বাবু কোন কথা না বলে, ঘরের ওপাশে একটা টেবিলের দিকে ইশারা করলেন। টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে সেই মেহেগনি কাঠের বাক্স আর ছোট আংটির বাক্সটা। সাহেব চেয়ার ছেড়ে আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন টেবিলের পাশে। আমরা দরজার ফাঁক থেকে সব দেখছি। এবার তিনি হাতে তুলে নিলেন আংটির বাক্সটা। আমার বুক ধুক-পুক করছে। লালমোহন বাবুর টাকে ঘাম চিকচিক করছে। আমরা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি। ফেলুদার এখনও কোন পাত্তা নেই।

আংটির বাক্স খুলতেই সাহেবের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েপিস্তলের বাক্সটা হাতে তুলে নিলেন। সেটাও খালি! রাগে কাঁপতে কাঁপতে সাহেব তারিণী বাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে উঠলেন, "ইউ চিট! হোয়ার আর দোজ অ্যান্টিক্স? আই উইল কিল ইউ... ইউ ওল্ড ফুল..."

এবারে আমাদের কিছু একটা করা উচিৎ। কারণ সাহেবের হাতে একটা রিভলভার চকচক করছে। আর তিনি ধীরে ধীরে তারিণী বাবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এখন তিনি ঠিক আমাদের সামনে। হঠাৎ জটায়ু 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলে বারান্দার ভেজানো দরজাটা বাইরে থেকে এক ধাক্কায় খুলে দিলেন আর সেটা গিয়ে লাগলো সাহেবের হাতে। হাত থেকে রিভলভার ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। সাহেব হতভম্বের মত আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা তিনজন হুমড়িয়ে ঘরে ঢুকলাম।।

তারিণী বাবু বিছানায় উঠে বসেছেন। তাঁর হাতেও চকচক করছে একটা রিভলভার। যে হাত সেদিনও চায়ের পেয়ালা ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে দেখেছি, আজ রিভলভার ধরে সেই হাত একেবারে স্তেডি। এবার তারিণী বাবু চাদর ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, কে বলবেন উনি বাতে বহুদিন শয্যাশায়ী? আশ্চর্য গম্ভীর গলায় বললেন, "এবার আপনার খেলা শেষ মিস্টার পাকড়াশি!"

আরে এ গলা তো আমার চেনা! এতো ফেলুদা! একেবারে চেনাই যাচ্ছে না। নকল গোঁফ আর পরচুলা খুলতে খুলতে ফেলুদা বলল, "শাবাশ জটায়ু! আরেকটু দেরি হলেই..."

সাহেব ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন, "আপনি মিস্টার মিটার?"

"হ্যাঁ মিস্টার পাকড়াশি। এবার আপনিও ভেকটা খুলে ফেলুন।" ফেলুদা চেঁচিয়ে বলল, "তারিণী বাবু, এবার আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, " তোপসে, রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দে তো। রাস্তায় পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।"

আমি জানালাটা খুলে দিলাম। তারিণী বাবুকে ধরে ধরে নিয়ে এল একটি ছেলে। একেই আমরা সেদিন চায়ের দোকানে দেখেছিলাম। এই বিষ্ণু, বুড়ীর বাপ-মা মরা নাতি!

অজিতবাবু নকল চুল, দাঁড়ি খুলে ফেলতে ফেলতে বললেন, "মিস্টার মিটার, আপনি কি আমায় পুলিশে দেবেন? আমার অপরাধ? আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে?" অজিত বাবুর গলা বরফের মত ঠাণ্ডা।

"অপরাধ! তার তালিকা তো বেশ লম্বা, শুনবেন? আপনার সবচেয়ে বড় অপরাধ হল, ভারতীয় সম্পদ বিদেশে পাচার করা! আপনার তো ওটাই পেশা, তাই না? বিদেশেও আপনি ওই ব্যবসাই করতেন। নেহাত ওদেশে, পুলিশের তাড়া খেয়ে, ব্যবসা গুটিয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। আর প্রমানের কথা বলছেন? তাও আছে। আপনার লেখা হুমকি চিঠিগুলো। আর তাছাড়া, আজ সকলের সামনে যে ঘটনা ঘটল, তাতে আপনাকে জেলের ঘানি টানাতে আমার বিশেষ কষ্ট হবেনা।"

সিঁড়ির দিয়ে গটমট করে উঠে এলেন ইন্সপেক্টর মল্লিক, সঙ্গে আরো তিনজন পুলিশ। ফেলুদার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "তাহলে মিস্টার মিটার, এবার আসামীকে নিয়ে যেতে পারি?"

ফেলুদা হেসে বলল, "স্বচ্ছন্দে! আমি কাল সকালে আপনার সাথে দেখা করব।"

"ওকে মিস্টার মিটার! আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন, ওয়েল ডান!চলি।" পুলিশ অজিতবাবু কে নিয়ে চলে গেল।

তারিণী বাবু ফেলুদার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি সত্যি বিষ্ণু কে ভুল ভেবেছিলাম। আপনি না থাকলে...জীবনের শেষ সময়ে এসে এমন একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে, আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।"

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে বলল, "আপনি বরং ধন্যবাদটা ওঁকে দিন," ফেলুদা জটায়ুর দিকে তাকাল, "উনি ঠিক সময় না এসে পড়লে হয়তো আরো বিপদ হতো।"

লালমোহন বাবু তো লজ্জায় লাল হয়ে গেছেন। মিটিমিটি হেসে বললেন, "কি যে বলেন ফেলুবাবু! সবই আপনার কাছে শেখা!"

আমি পাশ থেকে বললাম, "মগজাস্ত্র"।

তারিণী বাবু বললেন, "কাল আপনারা সকলে আমার বাড়ী একটু পায়ের ধুলো দেবেন।"

পরদিন সকালে আমরা সকলে তারিণী বাবুর বাড়ী জমায়েত হলাম। আমি, ফেলুদা, জটায়ু আর সিধু জ্যাঠা ছাড়া আছেন ইন্সপেক্টর মল্লিক আর বিষ্ণু।

একপ্রস্থ চা খেয়ে সিধু জ্যাঠা বললেন, "এবার শুরু কর ফেলু। আমার কাছে অনেক কিছুই এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। মিস্টার পাকড়াশি যে দোষী, সেটা তুমি কি করে বুঝলে? গত কয়েকমাস ধরে ওনার সাথে আলাপ, কখনো তো সন্দেহ হয়নি!"

ফেলুদা শুরু করল, "আমার সবার প্রথম খটকা লাগে আপনার চিঠি পড়ে। আপনার চিঠির একটি বিশেষ অংশ খুব ভালো করে কলম দিয়ে কাটা ছিল, যাতে কি

লেখা আছে, তা যেন আর বোঝা না যায়। এই দেখুন আপনার চিঠি।"

সিধু জ্যাঠা চিঠিটা দেখে বললেন, "আরে, এই তো... এখানেই তো আমি তারিণী বাবুর পুরো ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলাম। এটা কাটল কে?"

"খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন, চিঠিটা যে কালি দিয়ে লেখা হয়েছে এবং যেটা দিয়ে কাটা হয়েছে, দুটোই নীল। কিন্তু প্রথমটা ভোঁতা মুখ আর পরেরটা সরু মুখের কলম দিয়ে লেখা। তাছাড়াও সামান্য শেডের তফাত আছে!"

মল্লিক চিঠিটা হাতে নিয়ে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "অ্যাবসোলুটলি কারেক্ট! দুটো কলম আলাদা।আশ্চর্য অব্জারভেশন আপনার!"

ফেলুদা মৃদু হেসে বলল, "আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করুন। চিঠির খামের ওপর যে নামটা লেখা আছে, সেটাও সিধু জ্যাঠার হাতের লেখা নয়। জ্যাঠার হাতের লেখা আমি চিনি। তার মানে এই দাঁড়াল, কেউ খামটা ছিঁড়ে, চিঠিটা পড়ে আবার অন্য খামে ভরে, আমার নাম লিখে দেয়। তাই কালির শেডেও তফাত হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহটা যায় মিস্টার পাকড়াশির ওপর।"

"সত্যি, লোকটা কি শয়তান!" সিধু জ্যাঠা বলে উঠলেন।

"অবশ্য প্রথম দিকে আমি ব্যাপারটাকে এতটা গুরুত্ব দিইনি। যাইহোক, এরপর দ্বিতীয় সন্দেহের তালিকায় ছিল আমেরিকান সাহেব। এনার সম্পর্কে প্রায় কোন তথ্যই হাতে ছিল না। তাই সেদিন বিকেলে আমি ফের তারিণী বাবুর বাড়ী আসি। ওনার কাছ থেকে সেদিন দুটো তথ্য পাই। এক, সেই সাহেবের চেহারার বর্ণনা। দুই, সাহেব একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। ভদ্রলোক মিস্টার ব্যানার্জিকে না দিয়েছেন নিজের কোন ঠিকানা না কোন ফোন নাম্বার! সবচেয়ে যেটা অবাক লাগলো, সেটা হল, এতো বড় একজন ধনকুবের, তার না আছে সেক্রেটারি না আছে ভিজিটিং কার্ড!।

তারিণী বাবু বললেন, "আমারও সেটাই খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তবে সাহেবের পোশাক দেখে আর ইংরেজি উচ্চারণ শুনে বোঝার উপায় ছিল না যে উনি আসলে একজন বাঙালি।"

ফেলুদা বলল, " তা তো হবেই তারিণী বাবু। ভুলে যাবেন না, যে অজিত পাকড়াশি বহু বছর বিদেশে ছিলেন, তাই সাহেবি উচ্চারণ আর আদবকায়দা রপ্ত করতে উনার অসুবিধে হয়নি। উনি ওখানে একটা স্মাগ্লিং ব্যাকেট চালাতেন, যার কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের মুল্যবান সম্পদ পাচার করা।
যাইহোক, এরপর আমি বুড়ী মোক্ষদার সাথে কথা বলি। ওনার কাছ থেকেই বিষ্ণুর শিয়ালদার ঠিকানাটা পাই। সেখানে গিয়ে দেখি, এই হল সেই ছেলে যে সেদিন আমাদের ফলো করছিল। বিষ্ণুকে চেপে ধরতেই সে সবকিছু উগরে দেয়।
বিষ্ণু মাথা নিচু করে বসে আছে তারিণী বাবুর পাশে। ফেলুদা একবার সেদিকে তাকিয়েভ বলতে লাগলো, "বিষ্ণুর কাছ থেকে যা জানতে পারলাম, তাহল এই, ... সে গত মাস খানেক ধরে তারিণী বাবুর বাড়ীর ওপর নজর রাখছিল। তার কারণ সে জানতে পেরেছিল, কেউ বা কারা সম্পত্তির লোভে তারিণী বাবুর ক্ষতি করতে চাইছে। মোক্ষদার সাথে তার যোগাযোগ ছিল, গোপনে সে এই বাড়ীতেও আসতো। কিন্তু তারিণী বাবুর সামনে সে আসতো না। বিষ্ণুই মোক্ষদা কে বলেছিল, বাড়ীর ভেতর কি কথা হচ্ছে, আড়ি পেতে শুনতে। আসলে তারিণী বাবুর কোন ক্ষতি হোক সে চাইতো না। বিষ্ণু ওঁকে এ ব্যাপারে সাবধানও করেছিল কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি ওকে ভুল বোঝেন। ভাবলেন সেই হয়তো ওই হুমকিগুলো দিচ্ছিল। আসলে, বিষ্ণু তারিণী বাবুর কাছেই খেয়ে পড়ে মানুষ, সে কথাটি সেভুলেনি, নেহাত বদসঙ্গে পড়ে, জুয়া আর মদের নেশা ধরেছিল। কিন্তু আসলে সে তারিণী বাবুর শুভাকাঙ্ক্ষী!" তারিণীবাবু বিষ্ণুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "সত্যি, এ ছেলেটিকে অনেক ভুল বুঝেছি।"

ফেলুদা আবার বলতে শুরু করল, “বিষ্ণুর কাছ থেকেই জানতে পারি যে এক সাহেব এসেছিলেন তারিণী বাবুর বাড়ী। ভদ্রলোক ট্যাক্সি তে আসেন, আবার ট্যাক্সিতেই ফিরে যান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “সাহেব কি ডান পা খুঁড়িয়ে হাঁটেন?” বিষ্ণু বলল যে সাহেব স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটেন। এতেই আমার ধারণা হয়ে যায় যে সাহেব যেই হোন, ধনকুবের নন। এবং উনি নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করছেন। তাই তারিণী বাবুর সামনে খোঁড়া হওয়ার অভিনয় করেছেন, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই হেঁটেছেন।”

“কিন্তু সাহেব যে মিস্টার পাকড়াশি, সেটা কিভাবে বুঝলে ফেলু?”

হ্যাঁ, এবার সেটাই বলছি। আমি বিষ্ণুর হাতের লেখার সাথে ওই হুমকি চিঠিগুলোর লেখা মিলিয়ে দেখেছি। দুটো আলাদা হাতের লেখা। কিন্তু কাল আপনার বাড়ী গিয়ে নোটবুকে মিস্টার পাকড়াশির হাতের লেখা দেখে আমার খটকা লাগে। এই হাতের লেখাই ছিল উড়ো চিঠিগুলোতে এবং আপনার আমায় লেখা সেই চিঠির খামের ওপরেও। তারপর আপনার পেন স্ট্যান্ড থেকে অজিতবাবুর দেওয়া কলমটির কালি পরীক্ষা করে দেখি, সেটার শেড টা উড়ো চিঠি আর আপনার লেখা চিঠির খামের কালির সাথে মিলে যাচ্ছে। তখন আমার কাছে সব দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়।কারণ ওই রকমের আরেকটা কলম মিস্টার পাকড়াশি নিজের কাছে রাখেন, এটা আপনি আমায় বলেছিলেন।”

“হুম, বুঝলাম!” সিধু জ্যাঠা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “কিন্তু পাকড়াশির উড়ো চিঠি দিয়ে লাভ কি?” “যখন মিস্টার পাকড়াশি দেখলেন তারিণী বাবু জিনিসগুলো বিক্রি করতে আগ্রহী নন, তখন তিনি অন্য পথ ধরলেন। আসলে উনি তারিণী বাবুর ওপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

“মানে, কি রকম?” জটায়ু এতক্ষনে একটা প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন।

“ মিস্টার পাকড়াশি যখন দেখলেন যে তারিণী বাবুকে টাকার লোভ দেখিয়ে লাভ হবেনা, তখন তিনি বুঝলেন যে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। যদি ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, তারিণী বাবুকে মানসিক ভাবে দুর্বল করা যায়, তাহলে হয়তো তিনি ঝামেলা এড়ানোর জন্য স্টলিংস সাহেব কে অ্যান্টিকগুলো বিক্রি করতে রাজী হয়ে যেতে পারেন। পাচারকারীদের সাথে ডিল করার চেয়ে একজন অ্যান্টিক-লাভার কে এগুলো দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! এটাই ছিল অজিত পাকড়াশির প্ল্যান।” একটু থেমে ফেলুদা আবার বলল, “কিন্তু আমার হাতে কোন জোরালো প্রমাণ ছিল না যার ভিত্তিতে পাকড়াশিকে ধরা যায়। প্রমানাভাবে উনি ‘বেনিফিট অব ডাউটে’ ছাড়া পেয়ে যেতেন। তাই যখন শুনলাম যে উনি আবার তারিণী বাবুর সাথে যোগাযোগ করেছেন, তখন ভাবলাম এই নাটকটা করা ছাড়া উপায় নেই। তাহলেই একমাত্র ওঁকে হাতে নাতে গ্রেফতার করা যাবে।”

তারিণী বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “সবই আপনার জন্য হল মিস্টার মিটার। আমার এই সংগ্রহ যে দেশের মানুষের জন্য রেখে যেতে পারছি, এটাই আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া। আর জীবনের এই প্রান্তে এসে এরকম অভিজ্ঞতা লাভ, সেটা আরো বড় পাওনা।”

সিধু জ্যাঠা তারিণী বাবুর হাত দুটো জড়িয়ে বললেন, “না তারিণী বাবু, আপনাকে এখনও আরো অনেকদিন বাঁচতে হবে। আপনার এখন অনেক কাজ। কেন্দ্রীয় সরকার আপনার আর্জি মঞ্জুর করেছেন, আর আপনার সমস্ত সংগ্রহ ‘ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম’ অধিগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে। মহাজাতি সদনে আপনাকে সংবর্ধনা জানানো হবে। স্বয়ং রাজ্যপাল উপস্থিত থাকবেন। সেখানেই আনুষ্ঠানিক ভাবে সবকিছু ঘোষণা করা হবে। আর আপনারও কিছু প্রাপ্তি আছে।”

তারিণী বাবুর চোখে কোনে জল চিকচিক করে উঠলো। ফেলুদাকে বললেন, “সবই তো হল, কিন্তু মিত্তিরবাবু, আবার আপনার প্রাপ্তিটাও আপনাকে দিয়ে দেওয়া উচিৎ। নিঃসঙ্কোচে বলুন আপনার ফী কত?

মিস্টার মিটার তাঁর একপেশে হাসি হেসে বললেন, “আমি শুধু একটা জিনিসই চাইছি...”

তারিণী বাবু বললেন, “বলুন, সঙ্কোচ করবেন না।”
“আপনার ভ্রমন কাহিনী নিয়ে যে লেখাটা আপনি লিখছেন, তার সম্পাদক হিসেবে আমায় নিন।”

তারিণী বাবু উঠে দাঁড়িয়ে ফেলুদাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

লালমোহন বাবু আমার কানে ফিস ফিস করে বললেন, “দেখেছো ভাই তপেশ, ফেলু বাবুকে এক্কেবারে হাতেনাতে ধরেছেন... যাকে বলে ‘RED HANDED’!”

আলোর চিত্র রেখা ৫
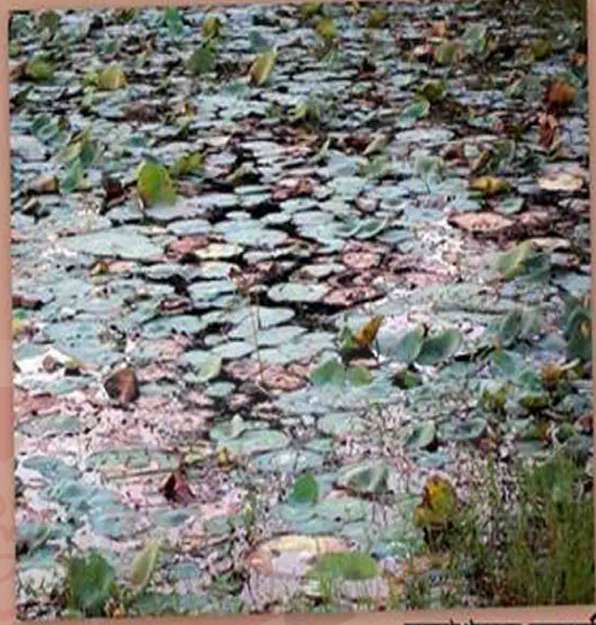
জলাশয়ের জলছবি
-সৌমী মল্লিক

শাখা প্রশাখা
-সৌমী মল্লিক

যে দিকে যায় রাস্তা
-রিজু পল

স্বপ্নের পালাবদল

সম্পায়ন চক্রবর্তী

সাম্রাজ্যবাদ , তুমি রোজ আসতে আমার স্বপ্নে ,
ঘুম ভাঙ্গাতে , রেখে যেতে তোমার স্বপ্নের রেশ।
যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম স্বপ্ন দেখতে দেখতে ,
মনটা হত আনন্দময় , ভালই লাগত ,
নিজেকে ফিরিয়ে দিতাম স্মৃতির আবেশ।
কিন্তু যেদিন হারালাম ভোরের সূর্য
মুছে গেলো স্বপ্ন শেষের ভোর ,
আমি আবার ফিরলাম বাস্তবে
আমার চোখে নতুন একটা শহর।
আমি তখন স্বপ্ন দেখি 'এল ডোরাডো'
স্বপ্ন দেখি জয় করবো স্বর্ণখনির পথ।
হঠাৎ মনে জাগে সাম্যবাদী চিন্তা ,
আলোর দিশারীকে দেখার জন্য ছটফট করি ,
বদলে যায় আমার স্বপ্নের পথ।
আমার স্বপ্নে ফিরে আসে রক্তমাখা হাত ,
ডেকে যেন কি এক বলতে চায় আমায়।
হঠাৎ বলে উঠি আমি বিদ্রোহী ,
সবাই হেসে উঠে, বলে, আমি নাকি আবেগময়।
আমি মুখ বুজে সব সই ,
মনের মধ্যে গর্জে উঠে প্রতিবাদ।
মনে আশা একদিন সকাল হবে রঙিন ,
ভেঙ্গে যাবে ওই মুষ্ঠিবদ্ধ কালোহাত।
আবার জেগে উঠি হঠাৎ করে
ঘুম ভাঙ্গে সেই পালাবদলের আহ্বানে ,
সত্যই কী – আমার স্বপ্ন সত্যি ?
যেভাবে পুঁজিবাদ কালোহাত বাড়ায় ,
যেভাবে সাম্যবাদ পথ হারায়।

মৃত্যু দূত

- উজ্জ্বল দত্ত

(১)

সময়টা হলো ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখের গভীর রাত। হালকা শীত পড়তে শুরু করেছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে একটি যাত্রীবাহী প্যাসেঞ্জার ট্রেন পুনা থেকে বোম্বাই -এর দিকে।

১৩ নভেম্বর সকল ৫. ১৫ এ লৌহশকট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রবেশ করে বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া ট্যার্মিনাস স্টেশনে। ধীরে ধীরে যাত্রীরা সব নেমে যায়। গন্তব্যস্থল এসে গিয়েছে। ফাঁকা হয়ে যায় ট্রেন। শুধু মাত্র একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওই কামরায় যাত্রীরা দেখে যে এক ভদ্রমহিলা অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছেন। নারী চলছে ধীর গতিতে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও খুব ক্ষীণ।

উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীরা স্টেশন মাস্টারকে খবর দেয়। তিনি এসে হাজির হন সদলবলে।এমন সময় এক সাহেবী পোশাক পরা সুদর্শন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে এক ঝলক ভদ্রমহিলাকে দেখেন। তার মুখ দিয়ে বের হয়, “আরে এ যে শ্রীমতি ইন্দুমতী।এর এই অবস্থা কি করে হলো?” স্টেশন মাস্টার ভদ্রলোককে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং জানতে চান যে ওই ভদ্রমহিলাকে তিনি চেনেন কিনা। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দেন। তিনি পুনা শহরের একজন নামকরা চিকিৎসক। নাম তার ডাঃ অনন্ত চিন্তামন লাগু। এই ট্রেনে তিনি পুনা থেকে বোম্বাই এসেছেন বিশেষ কাজে। তবে তিনি অন্য কম্পার্টমেন্টে ছিলেন। ট্রেন থেকে নেমে তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই কামরাটার সামনে ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে এখানে এসেছেন। হ্যাঁ, তিনি শ্রীমতি ইন্দুমতী দেবীকেও বিলক্ষণ চেনেন। তিনিও পুনাতে থাকেন এবং ওনার ছোট খাটো কিছু অসুখের চিকিৎসাও তিনি করেছেন।

তারপর ডাঃ লাগু স্টেশন মাস্টারকে পরামর্শ দেন যে রোগিণীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তাকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার। জি.টি.হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার ডাঃ মৌস্কার তার পূর্ব পরিচিত। অতএব সেখানে নিয়ে গেলে ভদ্রমহিলা পুরো যত্ন-আত্তি পাবেন।

স্টেশন মাস্টার আর দেরী না করে কয়েকজন লোককে ডাঃ লাগুর সঙ্গে দিয়ে দেন। শ্রীমতি ইন্দুমতীকে জি.টি. হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে, ডাঃ মৌস্কারকে শ্রীমতি ইন্দুমতীর সুচিকিৎসার জন্য

অনুরোধ করে ও নিজের নাম ঠিকানা লিখিয়ে ডাঃ লাগু নিজের কাজে চলে যান।

(২)

ওদিকে হাসপাতালে ইন্দুমতীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। ডাক্তাররা নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পার সিদ্ধান্তে আসেন যে ইন্দুমতী বহুমুত্র জনিত কোমাতে আক্রান্ত হয়েছেন। বেলা ১০টায় ডাক্তাররা ইন্দুমতীকে ইন্সুলিন ইনজেকশন দেন। কিন্তু অবস্থার কোনরকম উন্নতি হয় না। ডাক্তারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ইন্দুমতীর মৃত্যু ঘটে ১৩ নভেম্বর বেলা ১১.৩০-এ। ডাঃ মুস্কার ১৩ নভেম্বর বিকেলেই পুনাতে ডাক্তার লাগুকে টেলিগ্রাম পাঠান যে ইন্দুমতী মারা গেছেন। তাই ডাঃ লাগু যেন পুনাতে ইন্দুমতীর পরিবারের লোকেদের এই খবর জানিয়ে দিয়ে সত্বর মৃতদেহ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

যেহেতু জি.টি. হাসপাতালে মৃতদেহ সংরক্ষণ করার মতো কোল্ড স্টোরেজ ছিল না, তাই ডাক্তার মুস্কার ইন্দুমতীর মৃতদেহ জে.জে.হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলেন যেখানে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা ছিল। টেলিগ্রামের উত্তরে, ডাঃ মুস্কার, ডাঃ লাগুর কাছ থেকে ১৫ নভেম্বর অর্থাৎ ইন্দুমতীর মৃত্যুর দুদিন পরে একটি পত্র পেলেন। তাতে ডাঃ লাগু লিখেছিলেন যে ইন্দুমতীর ভাই গোবিন্দ কলকাতাতে থাকে। তাকে তিনি সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। অতঃপর গোবিন্দ বাকি সব ব্যবস্থা করবে।

তারপর আরো দুদিন কেটে যায়। মৃতদেহ আবার জি.টি. হাসপাতালে ফেরত পাঠানো হয়। এবারে হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মৃতদেহটিকে বেওয়ারিশ ঘোষণা করে। মৃতদেহের ছবি তুলে রেখে মৃতদেহটিকে মেডিকেল ছাত্রদের এনাটমি ক্লাসের শব ব্যবচ্ছেদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়। হঠাৎ জি.টি. হাসপাতালের জনৈক কর্মচারীর নজরে পরে যে মৃতদেহের ঘাড়ের কাছে একটা কালো দাগ। সে এই ব্যপারটার উপরওয়ালাদের জানায়। দাগটি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমের আদেশ দেন।

যথারীতি পোস্ট মর্টেম হয়। পাকস্থলী রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু শরীরে বিষ জাতীয় কিছুই পাওয়া যায় না। কোনওরকম আঘাতের চিহ্নও শরীরে নেই, তাই তারা মনে করেন যে ঘাড়ের দাগটিকে ভুলবশত সন্দেহ করা হয়েছিল। তাই পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টেও লেখা হয় যে বহুমুত্র জনিত কোমাতেই মৃত্যু হয়েছে।

নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখ পুনার পুলিশ ডাঃ লাগুর ক্লিনিকে ইন্দুমতী সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে যায়। ডাক্তার লাগু বলেন যে ইন্দুমতী দু'চার বার তার ক্লিনিকে কয়েকটা ছোট খাটো অসুখের চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তার বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি ডাক্তার লাগু জানেন না। তবে ইন্দুমতী একবার কথায় কথায় উল্লেখ করেছিলেন যে তার ভাই গোবিন্দ কলকাতায় থাকে। তাই ডাঃ লাগু একটা আন্দাজি ঠিকানায় ইন্দুমতীর মৃত্যুর খবর জানিয়ে কলকাতায় চিঠি দিয়েছিলেন। তবে সে চিঠি ইন্দুমতীর ভাই পেয়েছে কিনা তা তিনি বলতে পারবেন না। কেননা তার ভাইয়ের সম্পূর্ণ ঠিকানা ইন্দুমতী তাকে কখনো বলেননি। ডাক্তার লাগুও কখনও ইন্দুমতীর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেননি। কেননা উভয়ের সম্পর্কটা ছিল ডাক্তার আর রোগিণীর। সেদিন একরকম আকস্মিক ভাবেই তিনি ইন্দুমতীকে অজ্ঞান অবস্থায় ট্রেনের কামরায় দেখতে পান। তাই নিতান্ত কর্তব্য বোধেই তাকে তিনি জি.টি. হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। ডাক্তার লাগুর কাছ থেকে এই কথা শুনে পুলিশ ফিরে যায়। সত্যিই তো,

একজন ব্যস্ত ডাক্তারের কাছে রোজ কত রুগী আসে। সবার ঠিকানা মুখস্থ করে রাখা স্বাভাবিক ভাবেই কোনও ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব ইন্দুমতীর মৃত্যুকে একটা সাধারণ ঘটনা বলে ধরে নেওয়া হয়, যার মধ্যে কেউ কোনও রহস্যের গন্ধ পায়নি। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর প্রায় এক বছর কেটে যায়।

(৩)

পুনা শহরে এক সঙ্গতি সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত বিধবা ভদ্রমহিলা থাকতেন। তার নাম ছিল লক্ষ্মীবাঈ কার্ভে। তার বসত বাড়ি ছিল প্রকান্ড। সেই বাড়ির ই এক অংশে ডাঃ লাগু থাকতেন এবং সেই বাড়িরই নিচের তলায় ছিল ডাঃ লাগুর ক্লিনিক। লক্ষ্মীবাঈ -এর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তার চিকিৎসা ডাঃ লাগু-ই করতেন। সেই সুবাদে লক্ষ্মীবাঈ ও ডাঃ লাগুর কাছ থেকে নাম মাত্র ভাড়া নিতেন এবং ডাঃ লাগু কে যথেস্থ মান্য গণ্য করতেন। পাড়া প্রতিবেশীরা এক সময় ধীরে ধীরে অনুভব করলেন যে লক্ষ্মীবাঈ কে বেশ কিছুদিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে না। বাড়ির যে অংশে তিনি বাস করতেন সেখানে তালা লাগানো। পুরনো ঝি-চাকরদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ লাগুর যেহেতু লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে ওঠা বসা ছিল তাই পাড়া প্রতিবেশীরা কৌতুহলী হয়ে ডাঃ লাগু-র কাছে এই সম্বন্ধে খোঁজ নিল। পুনাতে লক্ষ্মীবাঈ-এর কিছু দূর- সম্পর্কের আত্মীয়রাও ছিল। তারাও লক্ষ্মীবাঈ এর আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য হলো। কিন্তু ডাঃ লাগু সবাইকে বললেন যে তিনি জানেন না যে লক্ষ্মীবাঈ কোথায় গেছেন। তার অন্তর্ধানে ডাক্তার নিজেও হতচকিত হয়েছেন।

এর কিছুদিন পরেই লক্ষ্মীবাঈ-এর আত্মীয়দের কাছে অজ্ঞাতনামা লোকেদের লেখা চিঠিপত্র আসতে শুরু করল। কোনও চিঠিতে লেখা যে তিনি তীর্থ ভ্রমণ করতে গিয়ে সন্যাসিনী হয়ে গেছেন। তার আর সংসারে ফেরার বাসনা নেই। আবার কোনও চিঠি তে লেখা যে, তিনি কোনও এক ডাঃ জোশীকে বিবাহ করে রাজস্থান এর জয়পুরে আছেন।

এইসব অযাচিত ও অদ্ভুত চিঠিপত্র ও দীর্ঘ সময় ধরে কোনও খবর না দিয়ে লক্ষ্মীবাঈ-এর অনুপস্থিতি সবাই কে সন্দিহান করে তুলল। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জি.ডি.ভাভে নামে পুনার এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ওই বেপারে পত্র দিলেন। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডাঃ জি.এন.ডাটার নামের আরেক ভদ্রলোক সরাসরি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কে এই ব্যাপারে চিঠি দিয়ে গোপন তদন্তের অনুরোধ জানালেন।

(৪)

এর পর পুনার পুলিশ গোপনে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করে এবং লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে নানা খবরাখবর জোগাড় করে। ১৯২২-এ পুনার এক সচ্ছল মৃতদার ব্যবসায়ী অনন্ত রামচন্দ্র কার্ভের সাথে লক্ষ্মীবাঈ-এর বিবাহ হয়। তার স্বামীর আগের পক্ষের একটি ছেলে ছিল। তার নাম বিষ্ণু। লক্ষ্মীবাঈ-এর স্বামী প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। লক্ষ্মীবাঈয়ের বাপের বাড়ির অবস্থাও ভালো ছিল। তার দুই পুত্র সন্তান হয়। Pleurisy রোগে আক্রান্ত হয়ে লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বামী ১৯৪৫ সালে মারা যান। লক্ষ্মীবাঈ-এর বড় ছেলের নাম রামচন্দ্র ও ছোট ছেলের নাম পুরুষোত্তম। দুর্ভাগ্যক্রমে পুরুষোত্তমও অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায় ১৯৫৪ সালে।

লক্ষ্মীবাঈ-এর স্বামী ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উইল তৈরী করেন। উইলে তিনি বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন ৩০০০০ টাকা। স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈকে দিয়েছিলেন ২৫০০০ টাকা ও অনেকগুলি কোম্পানির শেয়ার ও debenture এবং ২০০০০ টাকার গহনা পত্র । বসতবাড়িটি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি রামচন্দ্র ও পুরুষোত্তমকে সমান ভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে পুরুষোত্তমের অসময়ে মৃত্যু হলে উইল অনুসারে বসতবাড়ির অর্ধেক মালিকানা পেলেন লক্ষ্মীবাঈ । এছাড়াও নিজের পিত্রালয় থেকেও লক্ষ্মীবাঈ পেয়েছিলেন ৩০০০০ টাকা।

স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই বড় ছেলে রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈয়ের বনিবনা হচ্ছিল না। ১৯৪৬ সালে রামচন্দ্র মায়ের থেকে আলাদা ভাবে বাস করতে থাকে। পরে ১৯৫১ সালে ব্যবসা বন্ধ করে সামরিক বিভাগে চাকরি নেয়। এই চাকরিতে তার ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে থাকে। ডাক্তার অনন্ত চিন্তামন লাগু ছিলেন লক্ষ্মীবাঈ-এর পারিবারিক চিকিৎসক। দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ফলে তাদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল । বড় ছেলে রামচন্দ্র পৃথক হওয়ার পর থেকে ডাক্তার লাগুই লক্ষ্মীবাঈ-এর দেখাশোনা করতেন । লক্ষ্মীবাঈ-এর স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ ছিল। ১৯৩৬ সালে তিনি TB রোগে আক্রান্ত হন। তার স্বামী তার চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচা করেন। সাময়িক ভাবে লক্ষ্মীবাঈ আরোগ্য লাভ করেন। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি সুস্থ ছিলেন।

১৯৪৬ সালে তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পরেন এবং সেসময় ডাঃ লাগুই তাকে সারিয়ে তোলেন। কিছুদিন ভালো থকার পার ১৯৫০ সালে আবার পুরনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তার লাগু সেসময় বোম্বাই-এর একজন বিখ্যাত TB রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে দীর্ঘ ৪ মাস চিকিৎসা চালিয়ে লক্ষ্মীবাঈকে আরোগ্য করেন। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ-এর দুর্ভাগ্য যে আবার ১৯৫৬ সালে তার মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। তার পুনরায় অসুস্থ হবার কথা আত্মীয় স্বজন, পারা প্রতিবেশীরা সবাই জানত। এবারও ডাক্তার লাগু তার চিকিৎসা করতে থাকেন । বাড়ির অন্য একজন ভাড়াটিয়া, দাত্তাত্রেয়া বিষ্ণু ভিরকার, পুলিশকে গোপনে জানায় যে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ দিনের বেলায় তার সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈ-এর দেখা হয়। লক্ষ্মীবাঈ তাকে বলেন যে, তিনি সেদিন রাত্রে ডাক্তার লাগুর সাথে বোম্বাই যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। ভিরকার সেইদিনের পর থেকে গৃহকর্ত্রীকে আর কোনদিন দেখেননি। প্রতিবেশী আরেক ভদ্রমহিলা, প্রমিলাবাঈ সাপ্রে, পুলিশকে জানান যে ওই বিশেষ দিনে সন্ধ্যা বেলা তিনি লক্ষ্মীবাঈকে ডাঃ লাগুর সাথে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছেন। লক্ষ্মীবাঈ যে অসুস্থ ছিলেন এবং বোম্বাইতে সেদিন রাত্রের ট্রেনে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন তা ওই প্রতিবেশী ভদ্রামাহিলাও জানতেন।

এসব তথ্য পুলিশের হাতে এলে তাদের সন্দেহ সোজা গিয়ে পরে ডাঃ লাগুর উপর। পুলিশ সন্দেহ করে যে লক্ষ্মীবাঈ আর বেঁচে নেই। ১৯৫৮ সালের ১২ মার্চ পুলিশ ডাঃ লাগুকে গ্রেপ্তার করে। লক্ষ্মীবাঈকে হত্যার অভিযোগে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ধারায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়।

(৫)

ওদিকে বোম্বাই শহরে যিনি মারা গিয়েছিলেন সেই ইন্দুমতী কে ছিলেন ? পুনা পুলিশ খোঁজ খবর করতে করতে বোম্বাই-এর জি.টি.হাসপাতালে পৌঁছায় ও সেখান থেকে ইন্দুমতীর ছবি ও চিকিৎসার রেকর্ড পুনাতে নিয়ে আসে। ইন্দুমতী র মৃতদেহের ছবি দেখে রামচন্দ্র তাকে নিজের মা

লক্ষ্মীবাঈ বলে সনাক্ত করে। ব্যস এবার সব কিছু পুলিশের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়৷ মিথ্যে পরিচয় দিয়ে লক্ষ্মীবাঈকে হাসপাতালে ভর্তি করানো এবং তার মৃত্যুর খবর পেয়ে সবকিছু গোপন করে যাবার চেষ্টা , পুলিশকে ভুল পথে চালিত করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে খুব স্বভাবিক ভাবেই এটা বোঝা যায় যে এই হত্যা কান্দে ডাঃ লাগুর হাত ছিল। পুলিশ সন্দেহ করে যে কোনও প্রকার বিষ প্রয়োগ করে ইন্দুমতীকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পুলিশ কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা ডাইরেক্ট এভিডেন্স সংগ্রহ করতে পারে না। দীর্ঘ এক বছর ধরে ডাঃ লাগুকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার কার্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে পুলিশ তার বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চার্জশীট দাখিল করে।

আসামী ডাঃ লাগুর সন্দেহজনক গতিবিধি , মৃতের পরিচয় ও মৃত্যুসংবাদ গোপন করা ,মৃতের ভাইকে কলকাতাতে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে ভুল সংবাদ দিয়ে পুলিশকে বিপথে চালিত করা , এই সমস্ত অভিযোগ ডাঃ লাগুর বিরুদ্ধে আনা হয়। এছাড়াও লক্ষ্মীবাঈ ডাঃ লাগুকে বিশ্বাস করে নিজের সই করা চেকবুকও ডাঃ লাগুকে রাখতে দিয়েছিলেন। সেই সুযোগে লক্ষ্মীবাঈ -এর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আসামী ডাঃ লাগু ব্যাঙ্ক থেকে ২৭০০০ টাকা তুলে নিয়েছিল। এছাড়াও একটা জাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বানিয়ে তার জোরে ডাঃ লাগু অন্য ভাড়াটেদের কাছ থেকে বাড়ি ভার আদায় করছিল এবং কয়েকটি কোম্পানির শেয়ারের লাভ্যাংশ ও আত্মসাৎ করেছিল। পুলিশ এই সমস্ত তথ্য ও চার্জশীট এ প্রামাণসহ উল্লেখ করে।

(৬)

ডাঃ লাগুর বিচার প্রথম শুরু হয় পুনার সেশন কোর্টে । সেখানে সেশন জজ জাস্টিস ভি.এ.নায়ক আসামীকে মৃত্যুদন্ড দেন।

এরপর আসামী বোম্বাই হাই কোর্টে আপিল করে। ডাক্তার অনন্ত চিন্তামন লাগুর বিচার বোম্বাই হাই কোর্টের এক স্মরনীয় ও বিচিত্র মামলা। এই মামলার আসামী শুধু উচ্চশিক্ষিতই নন, তিনি এক পবিত্র পেশার সঙ্গে জড়িত। এই মামলায় কমবেশি ৭০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়।

লক্ষ্মিবাঈ-এর প্রতিবেশীরা এবং অন্য ভাড়াটেরা অনেকেই সাক্ষী দিতে গিয়ে বললেন যে ১৯৫৬ সালের ১২ নভেম্বর তারিখে লক্ষ্মীবাঈ ডাক্তার লাগুর সঙ্গে বোম্বাই রওনা হয়েছিলেন।

লক্ষ্মিবাঈয়ের পুত্র রামচন্দ্র ছিল প্রধান সাক্ষী। সে আদালতে বলে, তার মা রুগ্ন ছিলেন কিন্তু তার বহুমুত্র রোগ ছিল না । মায়ের সঙ্গে তার অবনিবনা অনেক দিনের এবং তার মূলেও আছে আসামী । আসামীই রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈকে ভরকাতো । আসামী নিজের বাকপটুতা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা তার মা লক্ষ্মীবাঈয়ের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তার ফলে মা লক্ষ্মীবাঈ পুত্র রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে চলে যান। চাকরি সূত্রে দূর প্রবাসে থাকলেও রামচন্দ্র বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের ও পরিচিতদের মাধ্যমে মায়ের খবর রাখত । রামচন্দ্র শেষবার তার মাকে দেখেছে ১৯৫৪ সালে, যখন সে নিজের বিবাহ উপলক্ষে নিজের মায়ের কাছে এসেছিল । আসামীর কাছে রামচন্দ্রের ঠিকানা ছিল কিন্তু তবুও সে পুত্রকে তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ দেয়নি । জি.টি.হাসপাতালে ইন্দুমতী নামের যে মহিলাকে আসামী ভর্তি করিয়ে ছিল সে তার মা লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া আর কেউ নয়।

লক্ষ্মীবাঈকে যে সব অন্য ডাক্তাররা চিকিৎসা করেছিলেন তাদের সবারই সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সবাই একবাক্যে বলেন যে লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যুটা আকস্মিক ও অস্বাবাভিক। বহুমুত্র রোগ তার কখনো ছিল না। অবশ্য বহুমুত্র জনিত কোমায় আক্রান্ত হলে আকস্মিক মৃত্যু হওয়া সম্ভব, এই বিষয় অবশ্য সকলে একমত হলেন।

কিন্তু এর পরেও পুলিশের অভিযোগ, যে লক্ষ্মীবাঈকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে তা কিন্তু সরাসরি প্রমানিত হলো না। তাই কোর্ট এরপর বেশ কয়েকজন ডাক্তারি শাস্ত্র ও বিষ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহন করে। অবশেষে এটা প্রমানিত হয় যে এমন কিছু কিছু বিষ আছে যার প্রয়োগ সাধারণ পোস্ট মর্টেমে ধরা পরে না। পাকস্থলীতে সে বিষ আবিষ্কার করা কোনও সাধারণ রাসায়ানবিদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না তিনি সেই বিষের ব্যাপারে স্পেশালিস্ট হন। তাছাড়াও এমন কিছু বিষ আছে যা কিনা মৃত্যুর পর দু'চার দিন কেটে গেলে পাকস্থলীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আদালত সিদ্ধান্তে আসে যে, ডাক্তারি শাস্ত্রে পণ্ডিত, চিকিৎসক আসামীর পক্ষে এমন কোনও বিষের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা মোটেই অসম্ভব ছিল না। একথাও প্রমানিত হয় যে, আর্থিক লাভের জন্যই আসামী লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছিল সবার কাছ থেকে। পাবলিক প্রসিকিউটর সাক্ষীদের জবানবন্দীর উপর নির্ভর করে আসামীর অপরাধ প্রমাণের জন্য সব যুক্তিই দেখিয়েছিলেন।

আসামীকে মৃতা নিজের পরম আত্মীয়ের মতো বিশ্বাস করতেন। ত্রিসংসারে মৃতার কেউ ছিল না। তিনি ধনী মহিলা ছিলেন। আসামী তাই লোভের বশবর্তী হয়ে এই অসহায় মহিলাকে খুন করে তার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী হবার চেষ্টা করেছে। অতএব আসামী সভ্য সমাজের পক্ষে একজন বিপজ্জনক মানুষ।

অন্যভাবে বিচার করে দেখলে মনে হয় যে, লক্ষ্মীবাঈকে হত্যাই করা হয়েছে। যদি সত্যিই তার স্বাভাবিক মৃত্যু হত এবং আসামীর মনে কোনও দুরভিসন্ধি না থাকত তাহলে সে ভুল নামে লক্ষ্মীবাঈকে হাসপাতালে ভর্তি করত না এবং পুনাতে মৃতার আত্মীয় স্বজনদের এই খবর সে নিশ্চই জানাতো। লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যুর পরেও আসামী অনেক সময় নষ্ট করেছে। ডাক্তার মুস্কারের টেলিগ্রামের উত্তরে টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে আসামী চিঠি লেখে। এর ফলে দুদিন সময় নষ্ট হয়।তারপর লক্ষ্মীবাঈয়ের ভাইকে খবর দেওয়ার অছিলায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পোস্ট মর্টেম করতে দেরী হয়। এসবই আসামী ইচ্ছাকৃত ভাবে সময় নষ্ট করার জন্য করেছিল। কেননা সে জানত যে যত বেশি সময় নষ্ট হবে ততই বিষ প্রয়োগের প্রমান সংগ্রহ করা কঠিন হবে। এছাড়াও আসামী মৃতাকে তার অন্তিম সময়ে হাসপাতালের দয়ার উপর ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, মৃতার পারিবারিক চিকিৎসক এবং পরামর্শদাতা হওয়া সত্ত্বেও আসামী বিপদের সময় লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে থাকা বা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তার কর্তব্য বলে মনে করেনি। অতএব সবদিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে খুনের প্রত্যক্ষ প্রমান বা ডাইরেক্ট এভিডেন্স না থাকলেও আসামী লক্ষ্মীবাঈকে খুন করেছে ঠান্ডা মাথায়,তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। পাবলিক প্রসিকিউটরের এই সব যুক্তি কোর্ট মেনে নেয়।

(৭)

আসামী ডাঃ লাগুর উকিল প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন আনীত অভিযোগ খন্ডনের প্রয়াসে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা ডাইরেক্ট এভিডেন্স-এর অভাব

ছিল ,তাই বেনিফিট অফ ডাউট এর যুক্তিতে আসামির অপরাধকে লঘু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জুরিগন একমত হয়ে সব রকম যুক্তি বিচার করে , ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ধারায় আসামীকে দোষী সব্ব্যস্ত করলেন।

বোম্বাই হাই কোর্টের দুই দায়রা জজ সাহেব , জাস্টিস জে.সি. শাহ ও জাস্টিস ভি.এস. দেসাই , জুরিদের মতামত মেনে নিয়ে সে সময়ের পুনা শহর এর লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও বর্তমান আসামী ডাঃ লাগুর প্রাণ দন্ডের সাজা বহাল রাখেন।

আসামী হাই কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়া সুপ্রিম কোর্টে আপীল করে । ১৪ ই ডিসেম্বর ১৯৫৯-এ সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারকের বেঞ্চ – জাস্টিস এম.হিদায়াতুল্লাহ , জাস্টিস এস.কে. দাস , জাস্টিস এ.কে.সরকার আসামীর আপীল খারিজ করে দেন ও প্রাণদন্ডের আদেশই বহাল রাখেন।

জাস্টিস এম.হিদায়াতুল্লাহ পরে সুপ্রিম কোর্ট এর চিফ জাস্টিস হন ও ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্টও হন।

স্বাধীন ভারতে এইটাই প্রথম কেস যেখানে খুন এর প্রত্যক্ষ প্রমান না থাকা সত্ত্বেও , ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স ও circumstantial এভিডেন্স -এর উপর ভরসা করে প্রাণদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল৷

নির্দিষ্ট দিনে ডাঃ অনন্ত চিন্তামন লাগু ফাঁসির দড়িতে ঝুলে নিজের পাপের শাস্তি গ্রহন করে।

লোভ মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নামাতে পারে .... এই ঘটনা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

এক বৃষ্টি মুখর রাত্রি

নীহারেন্দু নন্দী
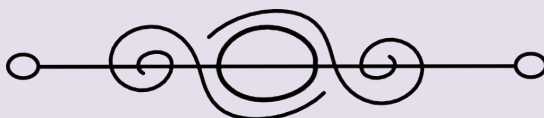
ঝম্ ঝম্ ঝম্ - নদী - কুল কুল কুল
ব্যাঙ - কাঁন্দুনি - দলবল
খিচুরি - ইলিশ - উচ্ছাস
ছম্ ছম্ ছম্ - গভীর - ঘুম ঘুম ঘুম ।।

সাহিত্যের দুনিয়ার কিছু বিখ্যাত তথ্য

মূললেখা: শুভোদীপ ভট্টাচার্য

সম্পাদনা: অঙ্গনা সেনগুপ্ত

পৃথিবীতে এমন অনেক অত্যাশ্চর্য অজানা তথ্য আছে যা আমাদের কল্পনাতীত। সারা বিশ্বের এই সকল তথ্যের মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের দুনিয়ারও কিছু বিখ্যাত সত্য ঘটনা। সেই পৃথিবী বিখ্যাত কিছু তথ্যই আজ তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১. আর্নেস্ট ভিন্সেন্ট তাঁর "গ্যাটস্‌বি" উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন ১৯৩৯ সালে। এই বইটির বিশেষত্ব এই যে ৫০,০০০ শব্দের এই উপন্যাসটিতে একটিও "ই" (E) অক্ষর ব্যাবহৃত হয়নি। মুলকাহিনী একটি কাল্পনিক শহর "ব্র্যান্টন হিলস্"কে ঘিরে যার মূল চরিত্রে রয়েছে জন গ্যাটস্‌বি। গ্যাটস্‌বি এবং তার কিছু বন্ধু মিলে মৃতপ্রায় সেই শহরকে ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। আজ প্রায় সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে এই উপন্যাস বইপ্রেমীদের আকৃষ্ট করে। পরবর্তী সংস্করণে এই বইটি "ফিফটি থাউস্যান্ড ওয়ার্ড নভেল উইদাউট দ্য লেটার 'ই'" শিরনামেও কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়।

২. নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর বইয়ের সমস্ত তাকগুলিকে যদি সজা টানা যায় তবে তা ১২৮ কিলোমিটার লম্বা হয়ে যাবে। এই লাইব্রেরীর বেশীরভাগ বইই জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং শেক্সপীয়র।

৩. লিও টলস্টয়ের লেখা "ওয়ার এন্ড পিস্" বইটি উনবিংশ শাতাব্দীতে লেখা পৃথিবীর দীর্ঘতম বই। তখনো কম্পিউটার বা কপিং মেশিনের আবিষ্কার হয়নি, তাই তাঁর স্ত্রীকে পাণ্ডুলীপিটি সাতবার হাতে লিখতে হয়।

৪. বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমসের সৃষ্টিকর্তা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ছিলেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা চক্ষুবিশারদ। যদিও সেই সময় তাঁর কোনো ক্লিনিক খুলে তা চালাবার সামর্থ ছিলনা, তাই তিনি গল্প লেখার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনীর রচয়িতা হয়ে ওঠেন।

৫. চার্লস্ ডিকেন্স ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যান্ডের সবথেকে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। তাঁর চার বছরের পড়ুয়া জীবনে সতেরোটি নভেল লেখেন যা শুধু ব্রিটেনই নয় পুরো বিশ্বে খ্যাতি পেয়েছিল। বাইশ বছর বয়েসে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় যদিও প্রকাশকেরা তাঁকে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক দেয়নি এবং তাঁর পরবর্তী আটটি গল্পের জন্যও তিনি কোনো পারিশ্রমিক পাননি। যদিও তিনি সর্বসামর্থ দিয়ে লেখা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশ্য কিছুকাল পর থেকে তিনি তাঁর সাব গল্পের জন্য উপযুক্ত টাকা পেতে শুরু করেন। এমনকি আরও পরে তিনি প্রতিটি গল্পের জন্য ১ পাউন্ড করে

পান। পরবর্তীকালে তাঁর লেখার জন্য তাঁকে ৩ পাউন্ড পারিশ্রমিকও দেওয়া হয় যা কিনা গল্প রচনার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী।

৬. বিখ্যাত ইংরেজ রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পনেরো বছরে পা দেওয়ার আগেই নিজের পিতামাতাকে হারান। শোনা যায় তিনি তাঁর পোষা কুকুরকে নিজের কবিতা পড়ে শোনাতেন। যদি সেই কুকুরটি জোরে চিৎকার করে উঠতো বা যদি কবিতা শুনে তার মন খারাপ হয়ে যেত তখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজের কবিতাকে সংশোধন করতেন।

৭. বিখ্যাত আমেরিকান লেখক স্টিফেন কিং, যার ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশী বইয়ের কপি বিক্রি হয়েছে, তিনি প্রতিদিন দুহাজার শব্দ লেখেন। এর কোনো হেরফের কাখোনোই হয়না। তাঁর মতে কেউ যদি প্রতিদিন চার থেকে ছ'ঘন্টা লেখা এবং পড়ার সময় না পায় তবে সে কোনোদিনই ভাল লেখক হয়ে উথতে পারবেনা।

৮. চার্লস্‌ হ্যামিল্টন তাঁর লেখক জীবনের শীর্ষকালে প্রতি বছর ১.৫ মিলিয়ন শব্দ লিখতেন। অনুমান কারা হয় তিনি তার জীবনে ১০০ মিলিয়ন শব্দ লিখেছিলেন।

৯. বিখ্যাত আমেরিকান রহস্য রোমাঞ্চ ও আডভেঞ্চার লেখক ড্যান ব্রাউন সপ্তাহে সাত দিনই সকাল ৪টে থেকে কাজ করেন। এই ভূতপূর্ব ইংরেজি শিক্ষক তাঁর "দ্য ডা ভিঞ্চি কোড" দিয়েই সবচেয়ে পরিচিত।

১০. আমেরিকান লেখক সিডনি শেলডন্‌ পৃথিবীর ষষ্ঠ সর্বকালের "বেস্ট সেলিং" লেখক। তাঁর প্রথম কবিতা বিক্রি হয় তাঁর ১১ বছর বয়েসে। সিডনি শেলডন্‌ প্রতিদিন সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত কাজ করতেন।

১১. "গীনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস" এর মতে ব্রিটিশ লেখিকা আগাথা ক্রিস্টি ছিলেন সর্বকালের সর্বসেরা "বেস্ট সেলিং" ঔপন্যাসিক। তিনি নিজে নিজেই ৪ বছর বয়েস থেকেই লেখাপড়া শেখেন যদিও তাঁর মা মনে করতেন ৮ বছরের আগে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখা উচিৎ নয়।

১২. ১৯৫৪ সালে নোবেল পিস প্রাইস অফ লিটারেচার জয়ী লেখক আর্‌নেস্ট হ্যামিংওয়ে প্রতিদিন মাত্র ৫০০ শব্দ লিখতেন।

১৩. ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার ভিক্টর হুগো নগ্ন অবস্থায় লেখার কাজ করতে পছন্দ করতেন।

১৪. মঁপাসাঁ শেষ বয়েসে লেখার জন্য নতুন ভাবচিন্তা করার জন্য নিজের হাতে রক্তচোষা জোঁক রাখতেন। কারণ তিনি পরবর্তীকালে স্নায়ুজনিত অসুখে ভোগেন, যার জন্য তিনি নিজের কাজে মনোনিবেশ করতে পারতেননা।
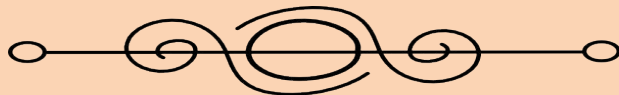
ইতি...জীবনের ইতিহাস

অ নি র্বা ণ মু খা র্জী

হারিয়েছ তুমি অনেক কিছুই -
সবুজ সে ছেলেবেলা ,
হারিয়ে ফেলেছ খেলাঘরে বসে -
পুতুল পুতুল খেলা ।
বুড়ো বট গাছে দোলনার দল -
হারালে সেসব কিছু ,
রাত পরীদের গল্প হারাল -
সময়ের পিছু পিছু ।
ঘুমের দেশের পথে মায়ের ঘুমপাড়ানি সে গান ,
কোথায় হারালে স্বপ্নের মাঝে হাজারো অভিযান ।
সময়ের সাথে হারালে সময় ,
দিনের পরেতে দিন ,
হারিয়েছে রং স্বপ্নের ছবি -
হাসি অন্তহীন ।
শৈশব ছেড়ে কৈশোরে হেঁটে পৌঁছলে যৌবনে ,
নতুন রঙের নতুন স্বপ্ন আঁকলে মনের কোণে ।
না বলা কথায় যা বলার ছিল -
হারালে সুযোগ বলার ,
মুছলো স্বপ্ন হাত ধরাধরি -
নতুন এক পথ চলার ।
এতদিন এত হারিয়েও শেষে মনের কথাই শুনে ,
সেই মন হারিয়েও মেতে আছো শুধু মনের আন্দোলনে ।
স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন যা ছিল মনের রঙিন কোণে ,
হারিয়েছ -
তবু চলেছ নতুন স্বপ্ন অন্বেষণে ।

আলোর চিত্র রেখা ৬

ছায়াশীতল বন
-সোমা মজুমদার

সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী
-ধীমান সাহা
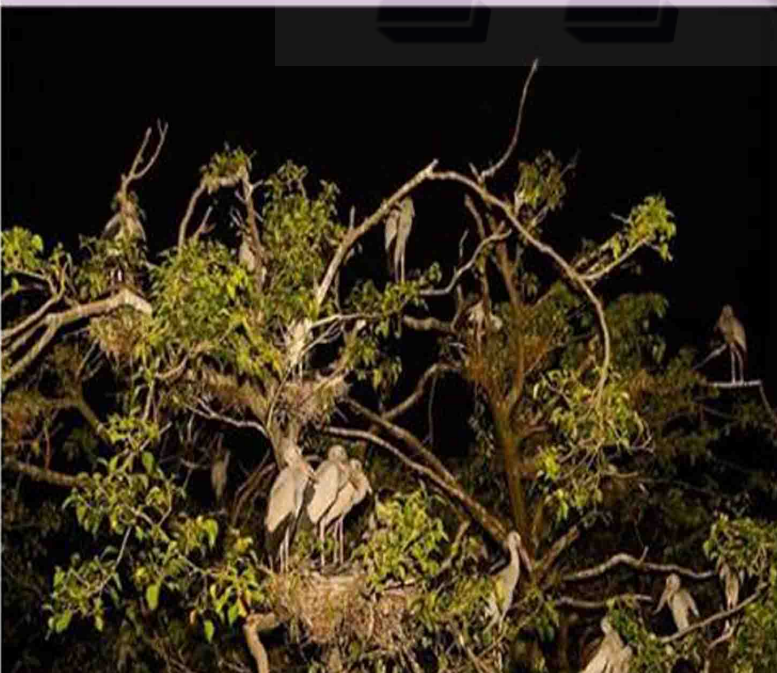
পেলিকানস
-বিশ্বজিত বিশ্বাস

চোরাবালির অভিশপ্ত শহর “তালাক্কাড়”

অদিতি মুখার্জী চক্রবর্তী

বাংলা অনুবাদ অঙ্গনা সেনগুপ্ত

কাবেরী নদীর তীরে ছোট্ট ঐতিহাসিক মরুশহর তালাক্কাড়। প্রাচীন কালে এই ছোট শহরেই ছিল তিরিশটিরও বেশি মন্দির। এই মন্দিরগুলির বিশেষত্ব হল এগুলি সবই চোরাবালির মধ্যে প্রোথিত। আজ আমরা সেই অদ্ভুত গল্পই শুনবো।

এই শহরের নামকরণের উৎস খুঁজতে হলে জানা যায় তালা আর কাদু নামে দুই যমজ ভাইয়ের এক অদ্ভুত গল্প। তালা আর কাদু, দুই ভাই একদিন বনে যায় কাঠ কাটতে। সেখানে তারা একটি গাছ কাটতে গিয়ে দেখে তার মধ্যে থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। তখন দুই ভাই মহাদেবের নাম স্মরণ করতে করতে ওই গাছেরই পাতা সেই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয় আর রক্তপাতও বন্ধ হয়। এর থেকেই শহরের নাম তালাক্কাড়। যদিও এই অদ্ভুত গল্পটি খুব শীঘ্রই আলামেলাম্মা নামে এক সাধ্বী শাপে অভিশপ্ত সেই মরুশহরের সাথেই ঢাকা পরে যায় চোরাবালির গভীরে।

কে এই সাধ্বী আলামেলাম্মা? প্রায় চারহাজার বছর পুর্বে ইনি ছিলেন বিজয়নগর রাজত্বের শেষ রাজা তিরুমলারাজার দ্বিতীয় রানী। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রধান খুঁটি মাইসোরের তৎকালীন রাজা সুযোগসন্ধানী উদেইয়াররা সুযোগ খুঁজছিলেন পতনশীল দুর্বল রাজাকে সরিয়ে সিংহাসন আরোহণ করার। ফলে রাজা তিরুমলারাজা আলামেলাম্মাকে প্রাসাদে রেখে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সাথে তালাক্কাড়ে প্রস্থান করেন।

তালাক্কাড় পৌছানোর কিছুদিনের মধ্যেই রাজা অসুস্থ হয়ে পরেন এবং তাঁর জীবনাবশান হয়। সংবাদ শোনামাত্রই আলামেলাম্মা তালাক্কাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু সুযোগের সৎব্যাবহার করে উদেইয়াররা নিজেদের বিজয়নগরের রাজা হিসেবে ঘোষণা করে এবং আলামেলাম্মাকে গৃহবন্দী করে রাখে তালাক্কাড়ের প্রতিবেশী শহর মালাঙ্গীতে। আলামেলাম্মা ছিলেন বিষ্ণুর পূজারিণী। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে নিজের অলঙ্কার উৎসর্গ করতেন। এমতাবস্থায় রাজা উদেইয়ারের নজর গেল সেই অলঙ্কারের দিকে এবং তিনি সেই অলঙ্কার মন্দিরেই রাখতে চাইলেন। রাজার আদেশে আলামেলাম্মার কাছে সৈন্য যায়, কিন্তু তিনি কোনো অলঙ্কার তাদের কাছে সমর্পণ করতে রাজি হন না। এরপর রাজা দ্বিতীয়বার আলামেলাম্মার কাছে সৈন্য পাঠান আর আদেশ করেন যেন সৈন্যরা খালি হাতে না ফিরে আসে। কিন্তু এইবারও একটি মুক্তোর নাকের দুল ছাড়া আর কোনোকিছুই দিতে রাজি হননা।

কিন্তু রাজারোষের ভয় সৈন্যরা খালিহাতে ফিরে যেতে নারাজ হয়। গতিক ভাল না দেখে রানী আলামেলাম্মা তাঁর গয়নার বাক্স তুলে নিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যান। সৈন্যরা তাঁকে বনের মধ্যে ধাওয়া করে এবং প্রায় ধরেও ফেলে। কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে নারাজ রানী আলামেলাম্মা উঁচু পাহাড় থেকে কাবেরী নদীতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু তার আগে তিনি তালাক্কাড় শহরকে অভিশাপ দিয়ে যান।

তালাক্কাড়ুমারালাগি, মালাঙ্গীমাদুভাগালী,

মাইসুরুআরাসারিগেমাক্কালাগাড়িরালি।

অর্থাৎ তালাক্কাড় বালির তলায় তলিয়ে যাক, মালাঙ্গী ঘূর্ণিজলে ডুবে যাক, এবং মাইসোর সন্তানহারা হোক।

আশ্চর্যজনকভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে তালাক্কাড় সত্যিই বালির নিচে ডুবে যেতে শুরু করে। আলামেলাম্মার দেওয়া সেই অভিশাপের সাথে এই ঘটনার অদ্ভুত মিল থাকায় এই জায়গাটি পর্যটকদের বিশেষ আগ্রহের কারণ যেখানে আজও প্রায় তিরিশটি মন্দির বালির তলায় ডুবে রয়েছে। এই অদ্ভুত কাকতালীয় যোগাযোগ আধুনিক কালের পণ্ডিত ব্যাক্তিদেরও বিস্মিত করে।

তালাক্কাড়ে পাথুরে স্তম্ভ ও চতুর্ভুজাকৃতি ভিত্তির উপর বসানো চাকালাগানো এই মন্দিরগুলি বালির তলায় বিক্ষিপ্তভাবে সুপ্ত আছে। তালাক্কাড়ের এই মন্দিরগুলির মধ্যে পাতালেশ্বর, মরুলেশ্বর, আর্কেশ্বর, বৈদ্যনাথেশ্বর ও মল্লিকার্জুন এই পাঁচটি লিঙ্গ হলো মহাদেবের প্রতীক। এই পাঁচটি লিঙ্গ একত্রে পঞ্চপতি নামে বিখ্যাত। এই পাঁচটি শিব মন্দিরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বারো বছরে এই জায়গায় ‘‘পঞ্চলিঙ্গ দর্শন’’ মেলা বসে, যা শেষবার ২০০৯ সালে পালন হয়েছিলো। এই ‘‘পঞ্চলিঙ্গ দর্শন’’ কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিনে পালিত হয় যেদিন কুশযোগ এবং বিশাখা এই দুই নক্ষত্র একত্রিত হয়।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এইদিনে দর্শনার্থীকে গোকর্ণতীর্থমে স্নান করে গোকর্ণেশ্বর এবং চণ্ডিকাদেবীর পুজা করতে হবে। তারপর বৈদ্যেশ্বরের পুজা সেরে কাবেরী নদীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, এই চারদিকের স্রোতে স্নান করে আর্কেশ্বর, পাতালেশ্বর, মরুলেশ্বর এবং মল্লিকার্জুনে পুজা অর্পিত করতে হবে। প্রতিটি মন্দিরে পুজা দেওয়ার আগে দর্শনার্থীকে বৈদ্যেশ্বরে ফিরতে হবে। সবশেষে কীর্তিনারায়ণের পুজা দিয়ে তীর্থযাত্রা শেষ হবে।

স্থানীয় কাহিনী হিসেবে, রামানুজাচার্য তার কর্ণাটক ভ্রমণকালে এইখানে পাঁচটি বিষ্ণু মন্দিরের স্থাপনা করেন যা আজ পঞ্চনারায়নক্ষেত্রম নামে পরিচিত, যেখানে কীর্তিনারায়ণের মন্দিরও অবস্থিত। এই প্রাচীন মরুশহরের এই অদ্ভুত ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে তার বালির উপর দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতাই আলাদা। আর এর সবচেয়ে উপভোগ্য আনন্দ হয়তো এই তালাক্কাড়ের আশেপাশের শান্ত স্নিগ্ধ কাবেরী নদীর শীতল স্রোত যার বুকে নৌকোয় চড়ে এক রানী ও তাঁর অভিশাপের রহস্যে হারিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সত্যিই উপভোগ করার মতো।

ক বি তা

ক্লাস সেভেন - এ

আরুশি চক্রবর্তী

সত্যিই বড় অদ্ভুত এই ক্লাস
সারা স্কুলের ত্রাস।
কেননা তারা করে না কোনও কাজ
যা তাদের বলা হয়।
দিন রাত শুধু চ্যাঁচামেচি
হই হট্টগোল।
ক্লাসের দেওয়ালে আঁকা চলে
নানা রকম ছবি ও ডিজাইন
ক্লাসের ক্যাপ্টেনরা সবসময় ব্যাতিব্যাস্ত।
তারা করতে চায় রিজাইন।
যখন টিচাররা বলেন , সিট ডাউন
তখন তারা বসে পড়ে যদিও
কেউ দেখায় দাঁত , কেউ জিভ , কেউ বা
বিরক্ত হয়
কারুর ভ্রূ কুঁচকে যায় তবুও।
আবার যখন টিচার বলেন :
তোমাদের একটা ভাল খবর দিতে চাই
তোমরা সবাই ভাল করেছ পরীক্ষায়
আগের থেকে...
অমনি ডাকে আনন্দের বান – থ্রি চিয়ার্স
কেন না সবাই ভেবেছিল যে
ইতিহাস বা ভূগোল
এবার নিশ্চয়ই পাকাবে গণ্ডগোল।
তারপর টিফিন টাইমে শুরু হয় নানা গল্প গাছা।
কে , কি সিনেমা দেখল বা গান শুনল
বা কোথায় যাবে বেড়াতে সামনের ছুটিতে
এই সব নানা আজে বাজে কথা।
আবার কিছু বোকাও আছে ক্লাসে
যারা সবসময় বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থাকে
যাদের সঙ্গে কথা বললেই – চশমাটা খুলে
তারা ঢুলু ঢুলু চোখে বলে
সময় নেই ভাই
পরের এক্সামের জন্য তৈরি করছি পড়া।
হে...হে...হে...এত পড়েও তাদের
পড়ার শখ মেটেনা
এরা কারুর সাথেও মেশেনা
চুপচাপ থাকে একা একা।
তো এই সব নিয়েই হল দুষ্টুমিতে সেরা
আমার ক্লাস সেভেন - এ।
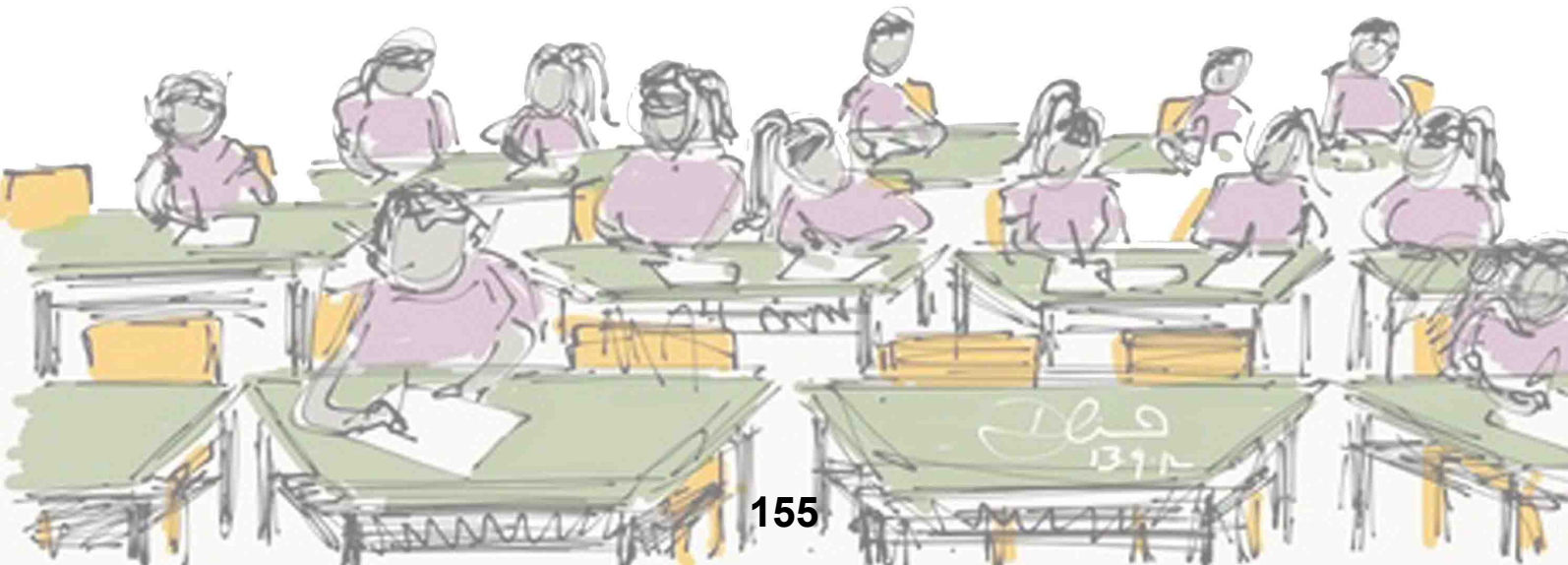
ধাঁধার গভীর খাদে আখর-রুদ্র

- আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

Akhar-Rudra Logo: Arko Chakraborty

আমি আখর। অ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্য, এই দুটো জিনিস আমার খুবই প্রিয়। ফাঁক পেলেই রহস্য গপ্প বা অ্যাডভেঞ্চারের গপ্প পড়ি। ও দুটো আমার নেশাই বলতে পারেন।

এটা ৪ দিন আগের ঘটনা। দিনটা রবিবার। ঘড়িতে সবে বেলা ১১ : ০০ টা। আমার ভাই (বা সহকারী বলতে পারেন) রুদ্র এসে আমার হাতে একটা ছেঁড়া পুরনো খাতা ধরিয়ে দিয়ে হেসে হেসে বলল,

---“ আখরদাদা, এর ভেতরে কিছু অদ্ভুত ধাঁধা আছে। মাথায় বুদ্ধি থাকলে উদ্ধার করবার চেষ্টা কর। আমি তো হাঁপিয়ে গেলুম, পারলামই নাঃ ” !

পরে খাতাটা খুলতেই দেখলুম যে আসলে ওটা একটা পুরনো ডায়েরি … বিচ্ছিরি অবস্থা … । ছেঁড়া খোঁড়া কয়েকটা পাতা তাও অক্ষত আছে। যেসব ওতে লেখা রয়েছে, সেগুলোকে রুদ্র ধাঁধা বললেও আমার জানি কেন ওগুলো তার থেকেও বেশি রহস্য জনক মনে হল। কি লেখা ওগুলো হিজিবিজি? ইংরিজি কি? নাঃ তো! কিরকম অদ্ভুত...সাংকেতিক চিন্হ? সাহায্যের জন্য আমি আমার মাইক্রফট হোমস টুবাই - দাদার কাছে গেলুম। ও খাতাটা খানিক নেড়েচেড়ে দেখে বলল, “ ওঃ বাব্বা! কি অবস্থা! স্ক্যান করে এক্ষুনি তুলে না ফেললে …. এই, আখর, তুই বরং এক কাজ কর! তোদের যে ই - ম্যাগাজিনটা বেরোচ্ছে, ওই আমরা ও ফেলুদা, ওটাতে এগুলো ধাঁধা বিভাগে দিয়ে দে। বলা তো যায়না, হয়ত তুইই এর সমধান করে ফেলতে পারবি ” !

টুবাই দাদা খুব জোরে হেসে উঠলো। আমি বললাম,

--“ তবে এখন কি কাজ ” ?

টুবাই দাদা খুব সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বলল, “ তুই ওগুলোকে স্ক্যান করে ফ্যাল। তারপর ঐসব ছেঁড়া খোঁড়া অংশগুলো ফটোশপের সাহায্যে মুছে ফেল … !

আমি টুবুদার কথা মতই কাজ করলাম। অনেক কষ্টে ওগুলোকে ঠিকঠাক করলাম, তারপর এখানে পরপর পেস্ট করে দিচ্ছি। এবার তোমরাই দেখ, এইসব “ হিজিবিজবিজ ” লেখার সমাধান করতে পার কিনা ” !

1. “EKKHηYυ-BβHηYυ-ΣσςllAaPP!”

2.

"Yυ Oo Yυ Pp Σσς Oo Nν Mμ Aα Yυ Bβ Eε
Iι Σσς Aα Σσς Iι Kκ Mμ Oo Nν Σσς-
-Tτ Eε Pp...... ...Ππ Pp Iι Tτ Eε Xχ!"

3.

"Mμ Pp Oo Hη Oo Yυ Bβ Yυ Pp Oo Γγ Aα-
-Θθ, ~~[struck out]~~ Hη Aα Tτ Γγ Oo Nν Bβ Hη Aα Tτ
Ππ Aα Nν Θθ, Δδ Iι Kκ Ππ Aα Oo Θθ Iι
-Kκ Θθ Iι Kκ Zζ Aα Bβ Aα Bβ Eε Iι
Φφ Aα Aλ Γγ Yυ Nν Tτ Aα Λλ Zζ, Δδ Yυ-
-Iι Mμ Aα Zζ Eε Bβ Hη Yυ Iι Φφ Oo Pp,
Σσς Oo Nν Δδ Hη Aα Nν Eε Δδ Hη-
-Oo Nν Δδ Hν Aα Nν Oo Bβ Aα Bβ Eε!"

4.

"Tτ Pp Iι Nν Oo Yυ Oo Nν, Oo Tτ Pp Iι Nν Oo
Yυ Oo Nν, Eε Kκ Tτ Yυ Zζ Eε Pp Oo!"
Aα Nν Δδ
"Δδ Aα Pp Aα Zζ Aα Bβ Aα Nν Δδ Hη
Kκ Aα Pp Oo!"

BP/∑σς, aδa, ∑σςNVBP, Φ-
-ΦOoPP, YυΓY, BβIlKκTτOoPPll-
-Aa & Ππ. Kκ. (δδ?)
PpEε BβIlKκTτOoPpIlAa' ∑σςΛλ-
-EεTτTτEεPp∑σς TτPpYυ,
Mμ, OoYυ, ΓYAaAa, ∑σςZζ,
YυNv.

5.

"∑σς Oo, Δδ Oo, NVAaΔδOo,
NVHη Eε, AaKκΛλOo? Aa
TτBβBβ, BβBβ∑σςOo. AaΔδKκ-
-∑σςOo. PpOoAaΔδKκ∑σςOo.
AaTτAaKκΛλOo? Ππ"C"ΛλOo.
PpOoTτOoTτΔδΔδ. OoKκOoZζ-
-TτPpOo, OoΓY."

6.

এক - এক করে নম্বর অনুযায়ী দেখ, তারপরে বোঝবার চেষ্টা কর| জানো, আমি না খুব বিপদে পড়েছি, রুদ্র বলেছে যে আমি যদি এগুলোর সমাধান করতে না পারি, তাহলে ও আর আমার সহকারী থাকবে না! তবে আমার বাবা ওই ডায়েরিটা দেখে শুধু বলল, " আচার্য সুনীতি কুমার চট্ট্যপাধ্যায় যেভাবে ডায়েরি লিখতেন, ঠিক সেইভাবেই সত্যজিৎ রায় তার নায়কের ডায়েরিটা সাজিয়ে নিয়েছিলেন| এটাই তার একমাত্র ক্লু" !

আমি তো মাথা-মুন্ডু কিসুই বুঝলুম নাঃ| তবে এটুকু বুঝতে পারলাম, যে এই রহস্যের সমাধান করতে আমাকে আর রুদ্রকে এখনো অনেক নাকানি চোবানি খেতে হবে| যাই হোক, তোমরা তো পাশে আছই!
United We Stand··· Divided we fall···.. :) :)

সমাধান শেষের পাতায়......

প্রচেষ্টা

– রিজু পাল

বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ঘরবন্দী হয়ে থাকতে সৌরভের আর একটুও ভালো লাগছে না। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সায়ন , রাহুল আরো অনেকে কাদার মধ্যে মাঠে ফুটবল খেলছে। কি যে আনন্দ হচ্ছে ওদের সেটা ওদের চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সৌরভের আজ বাইরে ছুটে যেতে খুব ইচ্ছা করছে , ওদের সাথে খেলতে মন চাইছে। কিন্তু মার কড়া হুকুম ; সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা , এই সময় বাইরে বেরোনো চলবেনা। মার আদেশকে উপেক্ষা করার মানসিকতা সৌরভের নেই। তাই , মনের সমস্ত আবেগকে চেপে রেখে সে বসে পড়ল বাংলা বই খুলে। সামনেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা , এতে সফল তাকে হতেই হবে। এটা ঠিকই যে , সে ক্লাসের সেরা ছাত্রদের মধ্যে একজন , কিন্তু অনেক বাধা বিপত্তি তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে এই ভালো রেজাল্ট করার জন্য। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে , বাবার সামান্য ব্যবসা , সারা বছর ভালো ভাবে চলে না। অগত্যা মাকেই ছোট ছোট বাচ্চাদের টিউশন পড়িয়েই সংসারের খরচ , তার লেখাপড়ার খরচ সব যোগাড় করতে হয়। এত কিছুর মধ্যেও সৌরভের সব

থেকে বড় গুণ হলো , সে খুব ভদ্র , বিনয়ী , নম্র , সবার সাথে ভালো ভাবে কথা বলে । তার ব্যবহার সবাইকে আকৃষ্ট করে। তাই স্কুলের স্যার – দিদিমণিরা সবসময় তাকে সাহায্য করেন নানাদিক থেকে । সৌরভ তাই সবার কাছেই কৃতজ্ঞ । মনে বড় স্বপ্ন দেখে সে ; একদিন সে বড় হবে , বড় চাকরি করবে , মা – বাবার দুঃখ দূর করবে । সে ছাড়াতো তার মা বাবার আর কেউ নেই । ছোট থেকেই সে দেখে এসেছে আত্মীয়স্বজনদের অবজ্ঞা , অবহেলা ; শুধুমাত্র তারা গরিব বলে। মাঝে মাঝে সে খুব কষ্ট পায় আর ভাবে আর কতদিন এমনটা চলবে। তার মা সবসময় তাকে বলে হাল না ছাড়তে , চেষ্টার তো কোনো বিকল্প নেই , সফল যে তাকে হতেই হবে। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই সৌরভের টেস্টের রেজাল্ট খুব একটা ভালো হয়নি। স্যার - দিদিমণিরা মৃদু তিরস্কারও করেছেন । আদৌ সে বুঝতে পারেনা এমনটা কেন হলো ! বিষণ্ন মন নিয়ে বাড়ি ফেরে সৌরভ। না খেয়ে শুয়ে পরে। মা বাবার ডাকাডাকিতে তার কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা। বিছানায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল দেয়ালে টাঙানো একটা ক্যালেন্ডারের দিকে । স্মিত হাসিমুখে, নির্ভিক , ঋজু দেহী এক বীর সন্ন্যাসীর ছবি ; স্বামী বিবেকানন্দর । ছবির তলায় লেখা '' ARISE , AWAKE & STOP NOT TILL THE GOAL IS REACHED "। আগে অনেক বার সৌরভ লেখাটা পড়েছে , কিন্তু এই পরিস্থিতিতে লেখাটা যেন তার কাছে এক অন্য তাৎপর্য বহন করলো। সব হতাশাকে বিসর্জন দিয়ে নতুন উদ্যমে সে লেগে পড়ল । মৃদু হাসি দেখা গেল মা – বাবার মুখে। মনে জাগলো নতুন করে আশার সঞ্চার। অদম্য পরিশ্রম , মনের জেদে সব ভুল ত্রুটি শুধরে নিতে নিতেই দেখতে দেখতে চলে এলো মাধ্যমিক।

সবার মত দুরু দুরু বুকে সৌরভও গেল পরীক্ষা দিতে । একদিন পরীক্ষাও শেষ হলো , এতদিনের ক্লান্তির পর সবাই এখন বেশ নিশ্চিন্ত । সৌরভের মাথায় তখন অনন্য নেশা। একাদশ শ্রেনীর পুরনো বই সে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে যোগাড় করতে থাকলো , পড়াটা একটু যদি এগিয়ে রাখা যায় এই ভেবে । অনেকে হাসলো, অনেকে নানা তির্যক্ মন্তব্য করলো। সেসবে কান না দিয়ে সৌরভ যোগাড় করা বইগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এমনি করে করেই এসে গেল ২৮শে মে। আজ মাধ্যমিক পরীক্ষারর রেজাল্ট । বাড়িতে সবার মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। সৌরভের মনের মধ্যেও উদ্বেগ ডানা বাধলো ; পারবে তো সে তার মা বাবার মুখে হাসি ফোটাতে ? স্কুলে রেজাল্ট আসতে আসতে সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল । হঠাৎ পাশের বাড়িতে ফোন এলো। সৌরভের স্কুলের হেড মাস্টার মশাইয়ের। সৌরভ রাজ্যে দশম স্থান অর্জন করেছে , তার স্কুলের এরকম ভালো রেজাল্ট আগে কখনো হয়নি। খবরটা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। যদিও আনন্দে মানুষের কান্নার তাৎপর্য বদলে যায়। মা আর বাবার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। সারাটা দিন শুধুই টিভি , সংবাদপত্র আর লোকেদের আনাগোনা লেগে থাকলো সৌরভের বাড়িতে। নিশ্চিন্ত মনে , ক্লান্ত সৌরভ রাতে শুতে গিয়ে একবার স্বামীজির ছবির সামনে দাঁড়ালো, মনে হলো তিনি যেন তার আশীর্বাদের হাত তার মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছেন । না, আবেগে ভেসে গেলে চলবেনা এখন তার , এইতো সবে শুরু , সামনে অনেক বাধা – বিপত্তি তাকে অতিক্রম করতে হবে , এগিয়ে যেতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে । সেই যে স্কুলে শুনেছিল .... " চরৈবেতি ... চরৈবেতি ... "

একজন প্রাগৈতিহাসিকের ডায়েরি

অভিষেক আইচ

সম্পাদনা- আখর বন্দ্যোপাধ্যায়
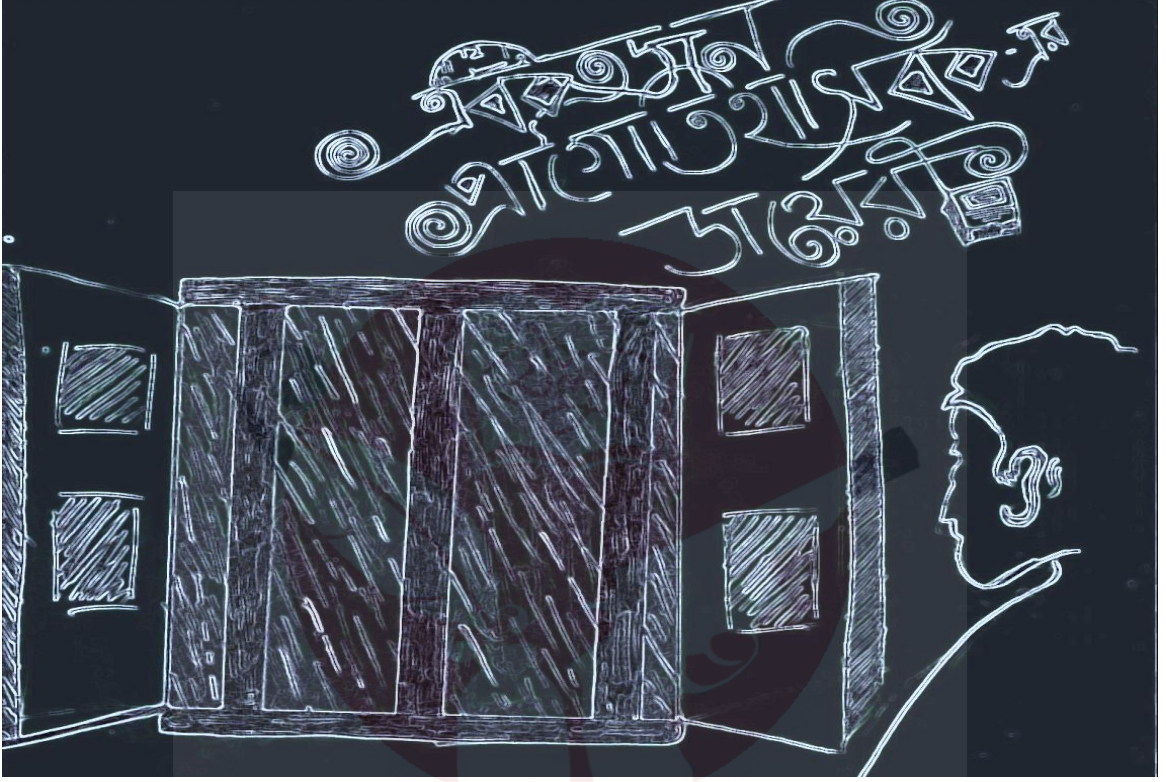
" মেমরি বিলিভস্ বিফোর নোইং রিমেমবারস্ " – টি . এস . এলিওট

রাত দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

কিছুতেই আর ঘুম আসছেনা ! পরছেই না চোখের দুটো পলক। জানলার বাইরে অঝোর ধারে বৃষ্টি পরে চলেছে। মাঝে মধ্যেই শোনা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর বাজের শব্দ।

মনটা কেন জানিনা খুব চঞ্চল হয়ে গেছে। আজকালতো আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই চলে কিছু বাঁধাধরা নিয়ম মেনে , কিছু অদ্ভুত একঘেয়ে রুটিন মেনে। কারণ আমরা আজ হয়ে পড়েছি সময়ের দাস , এবং এই দাসত্বের শৃঙ্খল নিয়েই হয়তোবা চলব চিরটাকাল। কিন্তু তবুও আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই খানিকটা এলোমেলো বাতাসের মতো উড়ে আসে আমাদেরই অতীতের কিছু ফেলে আসা নষ্টালজিয়া , যা কয়েক মুহূর্তের জন্য এই বাঁধাধরা জীবনটা থেকে এনে দেয় মুক্তি। ভাবতে বসায় , লিখতে বসায় আরও একবার। জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াই। তারপর আমার কলেজ জীবনে পাওয়া সেই ডায়েরিটার একটা পাতা খুলি , লিখতে থাকি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবথেকে প্রিয় মুহূর্তগুলি হল আমাদের প্রিয়জনদের সাথে , এবং সেই সব দিনগুলির কথা ভাবতে বসলে আজ নতুন করে মনে করতে হয় আরেকটা জিনিস , সেটি হল সেই হারিয়ে যাওয়া সোনালি বিকেলের " আড্ডা " নামক জিনিসটি। ঝগড়া

, তামাশা অথবা জুক্তি, তক্কো, আর গপ্পো, এবং অবশ্যই নষ্টালজিয়ায় মুড়ে থাকা, স্মৃতি হয়ে যাওয়া সেই সব জায়গাগুলো যেগুলো একদিন হয়ে উথেছিলো আমাদেরই মতো কারুর কাছে পার্লামেন্ট ভবন , বা নিছকই আড্ডা মারার , প্রাণ খুলে বাঁচার একটি আনন্দময় স্থান। সেই সব ক্যান্টিন , কফি হাউস , কিংবা লেকের ধাড় , পার্কের বেঞ্চ।

ক্যান্টিন বা কফি হাউসের ধারণাটা আমাদের দেশ তথা বিদেশেও খুব পুরনো। ভারতবর্ষে বহুকাল আগে থেকেই এই সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে রাজনীতি , খেলা নিয়ে আড্ডা , বিতর্ক আজকে নতুন নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর এক মস্তো " ঘটনা " , যাকে আমরা " ফরাসী বিপ্লব " নামে চিনি , সেই বিপ্লব কিন্তু শুরু হয়েছিলো এই ক্যান্টিন কালচারের মধ্যে দিয়েই।

ফরাসী দার্শনিক মাৎঝিনি , ভলতেইর্ , রুশো এদের মতামত নিয়ে সাধারাণ খেটে খাওয়া মানুষরা আলোচনা করতো চায়ের দোকানে বসে । ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে সেই চায়ের দোকানটি সাক্ষী ছিল এমন একটি বিপ্লবের যা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসকে পালটে দিয়েছিলো। তার উৎস কিন্তু সেই ছোট্ট একটা চায়ের দোকানের একটা দিনের একটি সামান্য আড্ডা।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজের অধীনে থাকা মানুষরাও কিন্তু ঠিক একই ভাবে এই সংস্কৃতির সুব্যাবহার করেছিলেন , আর তাইই হয়তো আজ আমরা স্বাধীন।

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে নতুন করে ভাবতে বসেছি এই ক্যান্টিন কালচার নিয়ে। আমরা কলেজ পড়ুয়া , স্কুল পড়ুয়ারা ক্যান্টিনে যেতাম গল্প করতে , আড্ডা মারতে (প্রেমিক প্রেমিকারাও স্থানাভাবে সেইখানে এসে থাকত) , এবং এই রীতি চলে আসছে বহু বছর ধরে। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে , কেন ? কি আছে এই ক্যান্টিন কালচারে যা হাজার হাজার মানুষকে এত বছর ধরে আকৃষ্ট করেছে ?

অনেকেই হয়ত একটা ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন যে ক্যান্টিন মানে নিছকই আড্ডা , একটু সময় কাটানো , ব্যাস ... কিন্তু এর তলাতেই লুকিয়ে থাকে এক গভীর সত্য যা এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে বোঝা প্রায় অসম্ভব বলা চলতে পারে।

এই যে আমরা বারবার বলছি যে ক্যান্টিন , কফি - হাউসে আমরা যাই আড্ডা মারতে। এই আড্ডাটা কি ? আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীস দেশে আখড়ার প্রচলন ছিল। আখড়া বলতে জিমনাসিয়াম। সেখানে শুধু শরীরেরই চর্চা হত না। এক উক্তিতে বলা যেতে পারে , " মেল – সানা – এল – করপরিসানো " - অনুবাদ করলে দাঁড়ায় " সাউন্ড মাইন্ড ইন আ সাউন্ড বডি "। শরীর এবং মন দুটোরই চর্চা হত , এবং একটা সময় ছিল যখন এই সবটাই হত ওই জিমের মধ্যে। এথেন্সের আখড়ায় সে দেশের যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুনীরা সক্রেটিস , প্লেটো , আলিসবিয়াদেসরা জমায়েত হতেন সেখানে , এবং তারপর আলোচনাচক্র বসত। ফিলোসফি , পলিটিক্স , ম্যাথমেটিক্স , আর্টস , সায়েন্স , লিটারেচার ছিল সেসব আলোচনার বিষয়। এবং " ডায়ালগ "ও ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্যপূর্ণ বিষয় যা আজও আমরা পড়তে পারি ! এটিকেও একরকমের " আড্ডা " বলা চলতে পারে , তবে সেটি হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের আড্ডা। পরনিন্দা - পরচর্চা নয় , কিংবা " মুখেনো - মারিতং জগৎ " নয়। তবে বাঙালির আড্ডাকে কখনই বেকার বলা যাবেনা। প্রোডাকটিভ আড্ডার দরকারও আছে আমাদের জীবনে।

তাই ক্যান্টিন বা কফি-হাউসের আড্ডার আলাদা একটা তাত্পর্য এখানেই যে এক মুহূর্তে এগুলি হয়ে ওঠে এক একটি স্বপ্নের ইমারত , এক একটি আদর্শের হাতিয়ার। এই ক্যান্টিন এই হয় নির্ভিক , নিঃসংকোচ গভীর চিন্তা ভাবনার আদান প্রদান।

বিশ্বাস করুক এই সব চিন্তা ভাবনার সম্প্রসারণ পৃথিবীর কোন রাজমহলেও সম্ভব নয়।

পায়ের উপর পা তুলে কফি বা চা খেতে খেতে , অথবা গরম লুচি বা তরকারির সাথে সদ্য তৈরি করা গরম ল্যাংচা – আর তার সাথে যদি থাকে তর্ক " ফেডারেশান কাপটা ইস্টবেঙ্গলই জিতবে নাকি মোহোনবাগান " , তাহলে বন্ধুরা আর কিছু না হোক একটি বৃষ্টির সন্ধ্যাবেলা দুর্দান্ত ভাবে জমে যায়।

ছাত্রজীবনে ক্যান্টিনে যাননি , এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কম বয়েসিদের কাছে ক্যান্টিন হল একটুকরো মুক্তির হাওয়া।

ক্যান্টিন মানে হাসি , ঠাট্টা , আনন্দ , মজা , লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া , কিংবা বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে কাটলেট ভক্ষণ। ক্যান্টিন তাই যেন একটা আলাদা রাজ্য যা হয়তো শুধু .. শুধুই আমাদের , কলেজ পড়ুয়াদের।

আবার মধ্য বয়েসিদের কাছে ক্যান্টিন মানে রোজ চারটে - পাঁচটার অফিসের থেকে একটু মুক্তি , একটু নষ্টালজিক হওয়া , একটু আড্ডা দেওয়া।

আর যারা প্রবীণ বা বেশ প্রাপ্তবয়স্ক , তাদের কাছে ক্যান্টিন মানে বেশিরভাগটাই গরিমায় ফেলে আসা সেই সব হারানো দিনগুলির স্মৃতি মন্থন। বারবার সেই অতীতে ফিরতে চাওয়া , আরেকবার সেই অতীতকে নতুন করে বাঁচতে চাওয়া।

আজ আমরা এগিয়ে চলেছি। চলেছি আরও উন্নতমানের সভ্যতার দিকে। জানিনা এই সংস্কৃতি আর কতদিন থাকবে ! পরের জেনারেশান কি আড্ডা দেবে ? আজকের ফেসবুক , টুইটার , অর্কুটের যুগে এইসব যুক্তি - তক্কো হয়তো অনেকের কাছেই নেহাতই বেকার , বোগাস , সময় নষ্ট , অথবা " বক্ওয়াস "।

কিন্তু আমরা যারা এখনো পুরোপুরি " আধুনিক " হতে পারিনি , যারা আজও আমাদের সেই শিকড়টা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারিনি (চেষ্টাও করিনি হয়তো) , তাদের কাছে এই অত্যন্ত অমুল্য একটা জিনিসের দাম আজও অমলিন আছে , এবং আশা করি যে থাকবেও।

হায়তো তাই সেই হারানো শৈশবের দিনগুলিকে আরেকবার নতুন করে হারানোর ভয়েতেই আজ আবার এই বৃষ্টিমুখর রাতে ভাবতে বসেছি , নতুন করে আবার লিখতে বসেছি ...

" ভাবো ভাবো ... ভাবা প্র্যাক্টিস করো ! "

....

মাধবী, ললিতা, সুমিত্রা অথবা সরমা কে...

শুক্লা সিংহ

"আপনি এদিকে আগে কখনো আসেননি?
তাহলে সে হয়তো আপনার কোন ভাই অথবা বন্ধু ছিল ;
আমার পরিচয়?
আমার নাম বনলতা সেন কিংবা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নয়
মাধবী, ললিতা, সুমিত্রা অথবা সরমা, আপনি আমায় যা খুশি নামে ডাকতে পারেন
তাতে আমার কিছু আসে যায় না।
কানা গলিটার ভেতরে ওই রংচটা , পলেস্তরা খসা বাড়ীটায় থাকি আমি;
দিন তারিখ সন এর হিসেব দিতে পারব না কিন্তু।
সঙ্গে থাকে একরাশ ধুলোমাখা স্বপ্ন
তারা কোন এক সময় ছিল লাল, হলুদ গোলাপি মোড়া
কিন্তু এখন ধুসর রঙটাই ওদের সবচাইতে প্রিয়।
জানেন, ভোরের সাথে আমার অনেকদিনের আড়ি
দিনের আলো কে আমি এখন ভয় পাই
কিন্তু ভাল লাগে নিশিথের ভয়াবহতা;
নীল আকাশে রামধনুর ছটা ,বসন্তে কোকিলের ডাক
এইসব আমার অসহ্য লাগে
বৃষ্টি ভেজা সোঁদা মাটি এখন কাছে টানে না আমায়
আমি এখন খুঁজে বেড়াই ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ
আর ভালবাসার উগ্র নেশা।
ওদের পছন্দ আমার মেদহীন, তন্বী
ভালবাসায় ভারাক্রান্ত দেহ;
যৌনতার সুড়সুড়ি জাগানো
আমার পেলব কটিদেশ, নিতম্ব কিংবা উরুসন্ধি।
আমার স্তনের ভাঁজে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের
সেই শহর, শরতের কাশফুল আর প্রথম চিঠি
এখন সেখানে কিছু ক্ষত-বিক্ষত ভালবাসা;
ভালবাসি ওদের কিন্তু
পুরুষালী বুকের গন্ধে আমি বমি করি
নেশাতুর ঠোঁট আমার অস্তিত্ব কে যেন চিবিয়ে চিবিয়ে খায়
কামাতুর রসনা যখনই ছুঁয়ে যায় আমার নাভি
তখন এক মানবী অনুভব করে তার জঠরের শূন্যতা!
আমার দু চোখ ভরা কাজলে লুকিয়ে ফেলি
আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি ... অন্তহীন, অবিরাম...
আরে, কি হল? দাঁড়িয়ে রইলেন যে?
চলুন ভেতরে..."

গ ল্প

অন্য মানুষ

- শুক্লা সিংহ

(এক)

রজনীকান্ত সেনগুপ্তকে দেখলে কেউ বলবে না যে ওঁর বয়েস সত্তর বছর। তার প্রধান কারণ ওঁর সুন্দর মজবুত শরীর যা পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তরুণদেরও হার মানায়। ওঁর চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে ঠিকই তবে চেহারায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। মাথায় একঝাঁক কালো চুল , যদিও রঙটা কৃত্রিম অর্থাৎ ডাই করা। দাঁতগুলোও প্রায় জায়গাতেই আছে। এক কথায় বলা যায় , রজনীকান্ত সেনগুপ্ত একজন " perfect , tall , dark , handsome " ওল্ড ম্যান। নাহ , পারফেক্ট বলাটা হয়ত ঠিক হবে না৷ তার কারন ওঁর চেহারার একটা বিশেষ দিক আছে। ওঁর একটা চোখ পাথরের। রজনীকান্ত বাবু যৌবনে ফুটবল খেলতেন , সেই সুবাদে জাতীয় দলে ডাক ও পেয়েছিলেন , কিন্তু বিধি বাম। কিছু সহপাঠী তখন ওঁর এই খ্যাতি সহ্য করতে পারেনি। এর ফল এই হল যে রজনীকান্তকে ওঁর একটি চোখ খোওয়াতে হয়েছিল। আর সেই জায়গায় একটা পাথরের চোখ বসানো হয়েছিল। তারপর থেকেই বলতে গেলে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ওই ছেলেটির ফুটবল কেরিয়ারের ইতি হয়ে গিয়েছিল। এখন ওঁর দুটো চোখই আছে তবে ডান চোখটা পাথরের।

এখন রজনী বাবু একাই থাকেন। স্ত্রী গত হয়েছেন প্রায় বছর দশেক। এক মাত্র মেয়ে বিয়ে করে আমেরিকায় থাকে। চাকর রঘুনাথকে নিয়ে ওঁর সংসার। পেনশন যা পান তাতে দুজনের ভালই চলে যায়। কিছু ফ্রী হ্যান্ড ব্যায়াম , নিরামিষ খাওয়া এবং পুজো - আর্চা তিনি নিয়মিত করেন। আরেকটা জিনিষও অবশ্য নিয়মিত করে আসছেন , মর্নিং - ওয়াক বা প্রাতঃভ্রমন ; সেই ইস্কুল জীবন থেকেই।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে রজনীকান্ত প্রায় এক ঘন্টা প্রাতঃভ্রমন করেন। এই নিয়মটা ছোটবেলা থেকে করে আসছেন। ওঁর প্রাতঃভ্রমনের রুটটাও খুব সোজা। বিমল মুদির দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে " চাইল্ড কেয়ার " নার্সারি স্কুল হয়ে বাজার ঘুরে অমিয়দের বাগানের পাশ দিয়ে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন অর্থাৎ বাড়ী। বহু বছর ধরে এইটাই চলে আসছে। হাঁটতে হাঁটতে কত জনের সঙ্গে রোজ দেখা হয় - জাস্টিস মাধবলাল রায় , কাপড়ের ব্যবসায়ী গিরিজা প্রাসাদ , মাছওয়ালা নবারুণ , রতন ময়রা... যাকে পান , তাকেই কুশল জিগ্যেস করেন তিনি। ওঁর এই মিশুকে স্বভাবের জন্য সবাই ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে।

আজও অভ্যেস মত ভোর পাঁচটায় উঠে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লেন রজনীকান্ত। অবশ্য উনি একা নন। সর্বসময়ের সঙ্গী লাঠীটা আছে ওঁর হাতে। বাচ্চাদের স্কুলটার সামনে এসে দাঁড়ালেন উনি। এই জায়গাটা ওঁর খুব প্রিয়। চারদিকে যেন

সবুজের মেলা। ঐ যে , নীমতলার কাছে বড় লেকের জলটা চিকচিক করছে। কী মনোরম দৃশ্য ! দেখে ওঁর প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আজ বাজারের দিকে না গিয়ে লেকের ধার হয়ে ঘোষদের বাড়ীর পাশের গলিটা দিয়ে বাড়ী ফিরলে কেমন হয় ? যেমন ভাবা তেমন কাজ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে উনি লেকের ধারটায় এসে পড়লেন।

এখানকার মাটি বড় নরম। তার ওপর কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল ; অনেক জায়গায় কাদা জমে আছে। তিনি সাবধানে পা ফেলতে লাগলেন। এদিকটায় আবার একটু জঙ্গল মত , কিছু কাঁটা গাছ , ফণীমনসার ঝোপ আর কিছু বাঁশঝাড়। হঠাৎ নজরে পড়ল ঝোপঝাড় গুলোর মধ্যে একটা সাদা মত জিনিস পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে রজনীকান্ত দেখলেন একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পরনে সাদা ধুতি আর সার্ট , যার অনেকটাই কাদায় লেপ্টে গেছে। পাশে একটা চশমা , বোধহয় ভেঙ্গে গেছে ; ডান পায়ে জুতো আছে , বাঁ পাটিটা একটু দূরে।

রজনীকান্ত ঝুঁকে নিজের ডান হাতটা লোকটির নাকের কাছে মেলে ধরলেন , " না... বেঁচে আছে তাহলে ! " আপনমনেই বললেন তিনি। কিন্তু লোকটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান , মাথার পেছনটা দেখলেন একটু যেন ফুলে আছে। কেউ হামলা করেছে কি ? তাইতো মনে হচ্ছে , এখন কি করা উচিত ? লোকটাকে এভাবে ফেলে যেতেও মন চাইছে না , কিন্তু একা ওঁকে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা... এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখতে পেলেন জাস্টিস রায়ের নাতি অভিককে। সেও লেকের কাছে জগ করতে এসেছে।

" ওহে অভিক , এদিকে একটু দেখে যাওতো বাবা " রজনীকান্ত গলা চড়িয়ে ডাকলেন।

" আরে দাদু , এই ঝোপঝাড়ে কি করছেন ? " ও এসে দাঁড়ালো।

" মাই গড ! উনি কে " ?

" জানিনা , এখানেই পড়ে ছিল... এঁকে আমার বাড়ী নিয়ে চল "।

" কিন্তু , অজানা অচেনা একটা লোককে এই ভাবে..." অভিক ইতস্ততঃ করল।

" সে পরে দেখা যাবে , এখন চলো "।

(দুই)

" আমি ইঞ্জেকশান দিয়ে দিয়েছি , ভয়ের কিছু নেই , তবে একঘন্টার আগে মনে হয়না জ্ঞান ফিরবে " । বললেন ফ্যামিলি ডাক্তার সুমিত দেব।

" ঠিক আছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ , আমি ফোন করে জানাব " রজনীকান্ত বললেন। ডাক্তার চলে গেলেন।

" দাদু , আমিও উঠি। আপনি সাবধানে থাকবেন , প্রয়োজনে ফোন করবেন "। অভিকও চলে গেল।

এখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। চা খেতে খেতে ঘুমন্ত লোকটিকে দেখছিলেন রজনীকান্ত। ওঁর বয়সীই হবে লোকটা। মাথার সব চুল সাদা , চেহারাটা ফরসা , বাঁদিকের ভ্রু একটু কাটা ।। সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে চিবুকের আঁচিলটা। রজনীকান্তর হঠাৎই মনে হল লোকটিকে উনি আগেও দেখেছেন , কিন্তু কোথায় ? কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। নাহহ ... বোধহয় বড্ড বেশি ভাবছি , জেগে উঠলে বরং জিগ্যেস করা যাবে , ভাবলেন উনি। রঘুর কথায় চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওঁর।

" বাবু , কাল দিদিমণি ফোন করেইছিল , বলতে ভুলে গিয়েইছিলাম ... "

" আচ্ছা , আমি করে নেব। তুই কাজ করতে করতে লোকটিকে দেখিস। "

" যে আজ্ঞে "

দিদিমণি , মানে ওঁর মেয়ে মৌসুমি। বেডরুমে গিয়ে ফোনটা তুলে ডায়াল করতে গিয়ে মনে পড়ল সপ্তাহ খানেক হল মেয়ের ফোন নাম্বারটা বদলে গেছে। নতুন নাম্বারটা একটা ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। সারা টেবিল , ড্রয়ার তোলপাড় করেও ডায়েরি টা পাওয়া গেল না।

এই রঘু না ... গজরাতে গজরাতে রজনীকান্ত পুরানো আলমারিটা খুললেন। খুলতেই দেখতে পেলেন ছোট নীল ডায়েরিটা , রংচটা ব্রাউন ফাইলটার উপর রাখা। ফাইলটার ভেতর রজনীকান্তর সব সার্টিফিকেট , খেলার , NCCর এইসব , আর আছে কিছু পুরানো চিঠি ও ছবি। কি মনে করে ডায়েরিটা এক হাতে নিয়ে রজনীকান্ত ফাইলটা খুললেন। কাগজপত্র , ছবিগুলো দেখতে দেখতে পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন , এমন সময় একটি ছবিতে ওঁর চোখ আটকে যায়। কতক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন , রঘুর ডাকে যেন হুঁশ ফিরে পেলেন।

বড়ঘরে গিয়ে দেখলেন লোকটা জেগে গেছে। অবাক চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছে।

" নমস্কার , এখন কেমন আছেন আপনি ? " রজনীকান্ত গলা খাঁকারি দিয়ে জিগ্যেস করলেন।

" এখন অনেক ভাল বোধ করছি , আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব ... "

" আরে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশাই ? যদি ধন্যবাদ দিতেই চান , তবে দু তিন দিন থেকে , সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরবেন। ইয়ে , আপনার নামটা ? "

“ আমার নাম শ্রী তপেন্দ্রনাথ সিকদার। ” নড়ে চড়ে বসলো লোকটা। “ আদি নিবাস ধলাই জেলায়। মেয়ের কাছে যাচ্ছিলাম পলাশনগর। আমাদের বাসটা হঠাৎ মাঝরাস্তায় বিগ্ড়ে গেল। ড্রাইভার বলল অন্ততঃ দশ ঘন্টা লাগবে শহর থেকে লোক এনে সারাই করতে। বাসের প্রায় সব্বাই নেমে গেল অন্য গাড়ীর খোঁজে। অগত্যা আমিও নেমে পড়লাম। কিন্তু তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। বোধহয় দিক্ ভুল করে ফেলেছিলাম। দুজন লোককে দেখে রাস্তার খোঁজ করলাম। ওরা বলল গাড়ি অব্দি পৌঁছে দেবে। কয়েকটা অলি - গলি ঘুরে তারপর আমরা একটা লেকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় চোখে হঠাৎ অন্ধকার দেখলাম , তারপর কিছু মনে নেই। ” এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে লোকটা থামল , “ একটু জল ”।

“ রঘু , এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো ” রজনীকান্ত গলা চড়িয়ে ডাকলেন। “ খুব বেঁচে গেলেন মশাই। শেষে প্রাণ নিয়ে যে ফিরতে পেরেছেন , এটাই বেশি। আপনি এদিকে নতুন তাই হয়ত বুঝতে পারেননি। চিন্তা করবেন না , ওষুধগুলো ঠিক করে নেবেন , তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। যাকগে , সব ভাল যার শেষ ভাল। তাই না ? ”

“ একদম ঠিক কথা বলেছেন মশাই ” লোকটির মুখে হাসি ফুটল।

“ নিজের পরিচয়টা দিয়ে ফেলি এবার। আমার নাম রজনী সেন। আমার স্ত্রী গত হয়েছেন অনেকদিন , এক মাত্র মেয়ে বিদেশে থাকে। আপাতত এখন আমি আর রঘুই আছি। ” একটু থেমে বললেন , “ উঁহু , ভুল বললাম , এই মাত্র এক সঙ্গী কে পেয়ে গেছি ” বলে আপন মনে হাসতে লাগলেন।

তপেন্দ্রবাবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

“ আপনার অনেক কষ্ট হল আমার জন্য ... ”

“ আরে কি বলছেন মশাই , ছাড়ুন তো এইসব কথা। আমি যদি এমন কোন বিপদে পড়তাম , আপনি কি আমায় বাঁচাতেন না ? মানুষই তো মানুষের কাজে আসবে , নাকি ? ” “ আপনি বরং চান করে নিন , রঘু আপনাকে গেস্ট রুম দেখিয়ে দেবে। ওখানেই আপনি আপনার পোশাক পেয়ে যাবেন। ”

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে দুজনে অনেক কথা হল। দুজনই নিরামিষাশী আর শেষ পাতে ডালের পাতলা ঝোলে লেবু কচলে খেতে খুব পছন্দ করেন। দুজনেরই একটি করে মেয়ে আর দুজনই শ্যামাসংগীতের ভক্ত।

বিকেলে বারান্দায় বসে সংসারের নানা সুখ দুঃখের গল্প করার পর ছাত্রজীবনের কথা উঠল। তপেন্দ্র বাবু জানালেন যৌবনে তিনি খুব বেপরোয়া , ডানপিটে টাইপের ছিলেন।

“ মাঠে লোকে আমাকে ভয় পেত মশাই , আর এখন আমাকেই ডান্ডা মেরে চলে যায় ? ” কথাটা বলে খুব হাসতে লাগলেন।

" মাঠে ? আপনি খেলতেন নাকি ? "

" শুধু খেলা নয় , মাঠ দাপিয়ে বেড়াতাম , মোহনবাগানের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু সংসারের চাপে তা আর হয়ে উঠেনি। সেই সব দিনগুলোর কথা ভাবতেও কি যে ভাল লাগে। আপনিও খেলতেন নাকি ? "

" এই একটু আধটু । খুব একটা সাফল্য পাইনি । " বলেই চুপ করলেন অপর জন । জীবনের সেই বেদনাদায়ক সময়টাকে মনে করতে চাননা উনি।

" আচ্ছা , যদি কিছু মনে না করেন , আপনার চোখে ... ? " হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন তপেন্দ্র বাবু।

" ও কিছু নয়।একটা গাড়ী ধাক্কা মেরেছিল , সে অনেক দিন আগের কথা। যাকগে সে সব। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি , এই কাছেই। তাড়াতাড়িই ফিরব। আপনি বরং বিশ্রাম নিন , যা ধকল গেছে ! "

একটু থেমে আবার বললেন , " কিছু লাগলে রঘুকে বলবেন , নিজের মত করে থাকবেন । একটু পরে একটা ওষুধ আছে , খেয়ে নেবেন। আর হ্যাঁ , আপনার মেয়েকে একটা ফোন করে দিলে ভাল হয়। চিন্তায় থাকবে। "

" ঠিক বলছেন , টেলিফোনটা কোথায় ? "

" আমার শোবার ঘরে। আসি। " বলে রজনীকান্ত বেরিয়ে গেলেন।

(তিন)

কে জানত এই সুন্দর বিকেলে হঠাৎ কালবৈশাখী ন্যায় ঝড় উঠবে ? পাক্কা এক ঘন্টা তান্ডব চলার পর কাক ভেজা হয়ে বাড়ী ফিরলেন রজনীকান্ত।

" ইশ খুব ভিজলেন মশাই " তপেন বাবু বলে উঠলেন।

" আর বলবেন না , আপনি খুব বোর হয়েছেন , তাই না ? "

" নাহ , তেমন নয়। রঘুর সাথে গল্প করছিলাম। আপনার বাড়িটাও ঘুরে দেখলাম , ছিমছাম , সুন্দর ! ও , মেয়ের সাথে ফোনে কথা বলেছি। "

" বাঃ কি বলল ? "

" সুস্থ আছি জেনে আশ্বস্ত হল। আপনি কাপড় বদলে নিন নাহলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। "

" তাই যাচ্ছি। আপনি এখন ঠিক আছেন তো ? "

“ হুম ... ” অতিথির গলাটা একটু অন্যরকম শোনাল।

রাত্রে খাওয়ার সময়ও তপেন্দ্র বাবুকে যেন একটু গম্ভীর দেখাল। উনি প্রায় খেলেনই না। রজনীকান্ত অনেক বার অনুরোধ করলেন কিন্তু তপেন্দ্র বাবু শুধু বললেন , “ খেতে ইচ্ছে করছে না , ঘুমিয়ে পড়ব ভাবছি। ”

“ রান্না ভাল হয়নি ? ”

“ না না , খুব ভাল ”

“ তাহলে ? আপনার কি শরীর খারাপ করছে ? ”

“ না , এমনি ... শুতে যাব ভাবছি ”

“ আচ্ছা , ঠিক আছে। কিছু লাগলে বলবেন কিন্তু , গুড নাইট। ”

“ গুড নাইট ” | ওঁর গলায় বিষণ্ণতার আভাস স্পষ্ট।

কি কারনে যেন আজ ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল রজনীকান্তর। পাঁচটার জায়গায় সাড়ে পাঁচটা ... ইন ফ্যাক্ট , রঘুর অনবরত ডাকে ঘুম ভাঙল ওঁর। দরজা খুলেই এক ধমক দিলেন , “ কিরে , এত জোরে দরজা ধাক্কা দিচ্ছিলি কেন ? ”

“ বাবু ” , কাঁচুমাচু হয়ে সে বলল , “ ওই বাবু চলে গেছেন ! ”

“ কে ? তপেন্দ্র বাবু ? কোথায় ? ”

“ জানি না। একটু আগে দেখতে গিয়েইছিলাম উনি উঠেইছেন কিনা। দেখি ওনার দরজা খোলা , উনি কোথাও নেই। ”

“ তুই ছাদে দেখেছিস ? ”

“ হ্যাঁ , দেখেছি। ছাদে , বাগানে , কোথাও নেই ”

“ চল ”

গেস্টরুমে এসে দেখলেন বিছানায় একটা ভাঁজও পড়েনি। তার মানে কি ভদ্রলোক রাতে ঘুমোতে যাননি ? কিন্তু উনি তো না খেয়ে শুতে চলে গিয়েছিলেন !

" বাবু , ভাল করে দেখুন কিছু নিয়ে গেছে কিনা। আজকাল কারুর ওপর ভরসা করা যায় না "।

রজনীকান্ত কিছু বললেন না। কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তবে কি উনি ... নাহ তপেন্দ্রবাবুকে চোর মানতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল বুঝতেই পারলেন না। হঠাৎ টেবিল ল্যাম্পে চোখ পড়ল ওঁর। টেবিল আলোটা জ্বলছে। সামনে পেপার ওয়েট দিয়ে চাপ দেয়া একটা ভাঁজ করা কাগজ। একটানে কাগজটা খুলে ফেললেন। কাগজটা একটা চিঠি।

" ২৭ জুলাই , রাত ৩ টে

প্রিয় রঞ্জু

কি করে শুরু করব কিছু বুঝতে পারছি না। আমার মত একটা গুন্ডাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ , আমার সেবা শুশ্রূষা করেছ , আমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। সেই আমি যে তোমাকে স্কুলে এত ঘেন্না করতাম , তোমার পিছনে লাগতাম , তোমার নামে অপবাদ ছড়াতাম , সেই আমি যে তোমার জীবনের স্বপ্ন , তোমার ফুটবল কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছিলাম , গাড়ী দিয়ে ধাক্কা মেরে তোমার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছিলাম ...

তুমি বিকেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম মেয়েকে ফোন করতে। দেওয়ালে দেখলাম তোমার পুরনো দিনের বাঁধানো ছবিগুলো। কোনটাতে তুমি প্রাইজ হাতে নিয়ে , আবার কোনটাতে বন্ধুদের সাথে। তোমায় চিনতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। আর আমি জানি তুমিও আমায় চিনতে পেরেছিলে। কিন্তু আমায় বুঝতে দাওনি।

তুমি একটুও বদলাওনি রঞ্জু , সেই মানবিকতা বোধটা এখনও তোমার ভেতরে অটুট। আর আমি ...

তোমার চোখে চোখ রাখার সাহস হয়নি আমার আর। রাতে আমার গলা দিয়ে খাবার নামছিল না ... আমি তোমার প্রাণ কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম আর তুমি কিনা আমার এত উপকার করলে ...

তখন থেকে দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। জানিনা কি করলে এই পাপের বোঝা থেকে মুক্তি পাব। আমি রাতের অন্ধকারেই চলে যাচ্ছি , তোমার সামনে মুখ দেখাতে পারছি না যতক্ষণ না তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

আমার ঠিকানা আর মেয়ের ফোন নাম্বার টা লিখে যাচ্ছি। পারলে আমায় ক্ষমা করে দিও। "

ইতি তপু।

টেবিল আলোটা দেখতে পেল একটি ছেলে অঝোরে কাঁদছে। এই কান্নার কারন পরিবর্তন। পরিবর্তনই হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম। এই নিয়মের কোনোদিন হেরফের হয় না। যত বড় রাজাই হোক না কেন , তাঁকে একদিন সিংহাসন ছাড়তেই হয়। পরিবর্তন না থাকলে হয়তো পৃথিবী কবেই মুছে যেত ! পরিবর্তনই আজকে রজনীকান্ত সেনগুপ্তকে রঞ্জু বানিয়ে দিয়েছে , ওঁকে ওঁর অতীতে নিয়ে গেছে। এত দিনের চাপা রাগ , ক্ষোভ , দুঃখ , কান্না সব বেরিয়ে যাচ্ছে এই পরিবর্তনের ফলে। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল যে একদিন , সেই ছেলেটি আজ আবার এক নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে চাইছে। সে এক পরিবর্তিত মানুষ , এক অন্য মানুষ। ছেলেটা এখন চোখের জল মুছে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
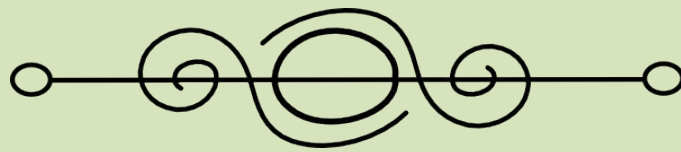
আলোর চিত্র রেখা ৭
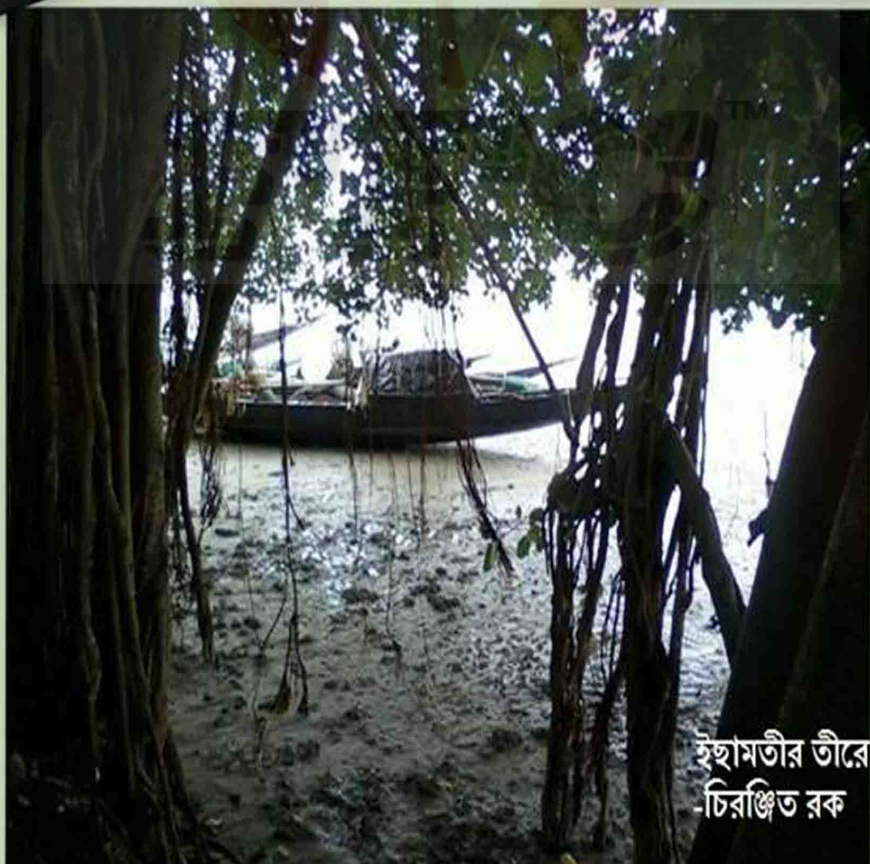
কিরে মালতি ??

শিবাদিত্য দাস শর্মা

কিরে মালতি ?? আরও একটা দিন কলকাতার জাঁকজমক ভরা হাওয়ায়
নিজের দুঃখ বেচার বৃথা চেষ্টা শেষ হল ?? রাত হয়ে
গেছে। শুয়ে পড় তোর সেই পুরনো বিছানা , তোর
ফুটপাথ ...... কতই বা পেলি , নির্লজ্জের মত নিজের বেদনাকে
সাক্ষী রেখে ভিক্ষা করে !!! কত মেয়ে তোকে দেখে
বুঝল , বন্যায় সর্বস্ব হারানোর জ্বালা ......??? তোর ঠিকানা তো
এখনও ফুটপাথ আর তার পাশের নালা। কুকুরকেও দিয়ে গেল
মায়া করে দুটো বিস্কুট। তোকে দিল না ?? ' সময় নেই , মাপ করবে '
- বলে হাঁটা দিল কাজের চিন্তায়...!! তোর তো বড় সুখ , তাই না??
কাজ নেই , চিন্তা নেই , পরিবার নেই ! তবে কাঁদিস কেন ??
প্রাণটা যায় তো যাক না !!! এই ফুটপাথের কুকুর , বট গাছ ,
আর ময়লার গাড়িও তোর অস্তিত্ব কদিন পর ভুলে যাবে !!
মা তুই চলে যা , এটা তোর দুনিয়া না। এটা মন ভোলানো , পার্কস্ট্রীট আর,
নিলামে ওঠা গড়িয়াহাটের শহর !!!!
তুই এসবের পক্ষে শুধুই এক দুর্ভাগ্য !!!।

(ভারতের বন্যায় যারা সর্বস্বান্ত তাদের জন্য)
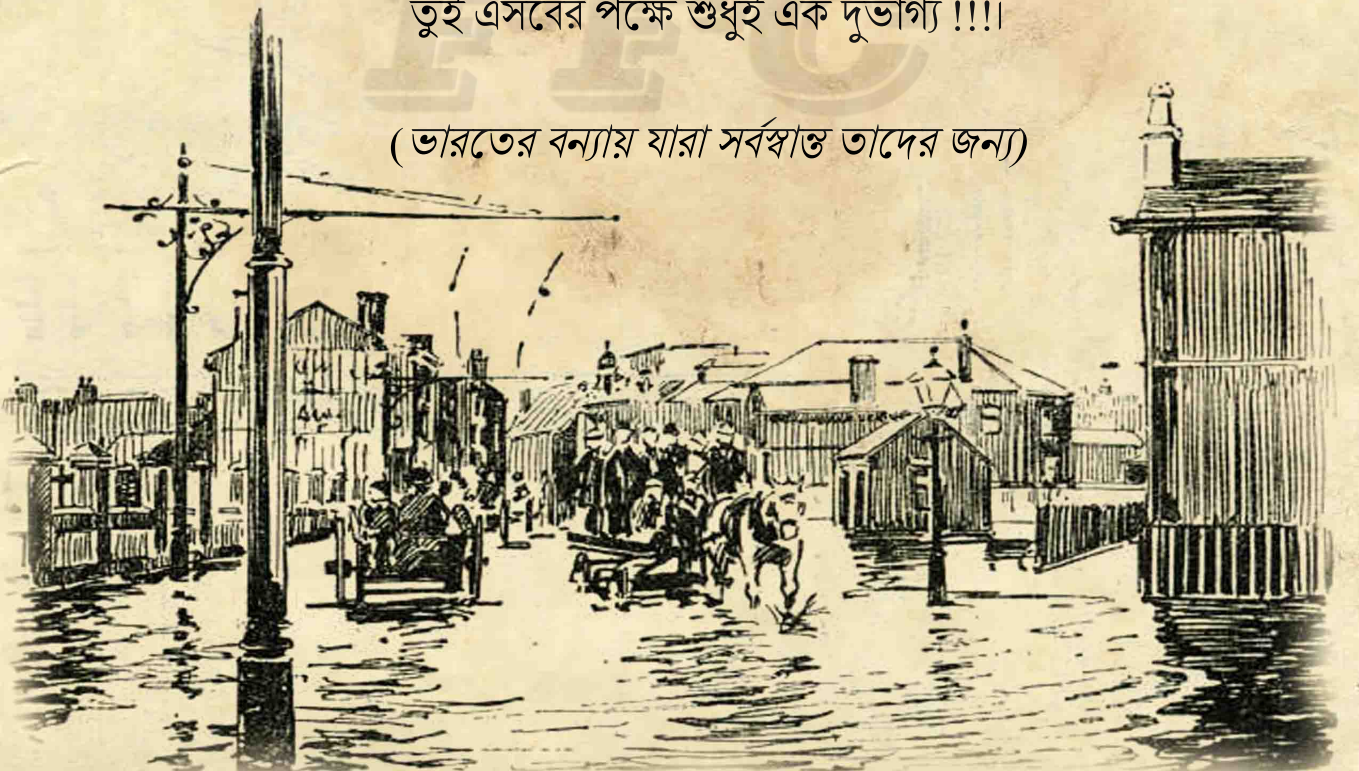
স্বাধীনতা

- অঙ্গনা সেনগুপ্ত

"স্বাধীনতা - হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?"

কাল স্বাধীনতা দিবস। কাল স্কুলে এই কবিতাটা আবৃত্তি করবে আভেরী। কিন্তু খুব বিপদে পড়েছে। কবিতাটা কিছুতেই ওর মুখস্থ হচ্ছে না! এই একটা লাইন ছাড়া। বোঝা তো দুরের কথা। কি যে হয়েছে ওর, কে জানে? ওকেই স্কুলের দিদিমনিরা সিলেক্ট করেছেন, কারণ ও খুব ভালো আবৃত্তি করে আর স্পিচ বলে। সেই ক্লাস 3 থেকে ও আবৃত্তি শিখছে। তাই ও স্পিচ দেবে না, ওর মা বলেছেন ও আবৃত্তি করবে - " দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়? " এখন ও ক্লাস 5। ওর বয়সী কোনো বাচ্চা ওর মতো এত ভালো আবৃত্তি করতেই পারেনা। যেকোনো কবিতা ও এক দু বার পড়লেই আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এটা হচ্ছেই না। ও তিনদিন ধরে সকাল বিকাল চেষ্টা করে চলেছে। মা খুব রেগে গেছেন। কাল কত চেষ্টা করেছেন কবিতাটা ঠিকভাবে শেখাতে, কিন্তু ও পারছেই না। " উফ .. আর ভালো লাগছে না! " বলে উঠে পড়ল

আভেরী, " কি যে একটা কবিতা? মাথা মুন্ডু বোঝা যায়না। এইরকম একটা কবিতা কেউ লেখে? আর এইটা চুস করার মানে টাই বা কি? Daffodils টা এত সোজা। ওটা যে কেন কাল আবৃত্তি করা যাবে না কে জানে? " এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ও এসে দাঁড়ালো ব্যালকনি তে। আজ খুব মেঘ করেছে, বোধহয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি ওর খুব ভালো লাগে। কিন্তু আজ আর কিছুই ভালো লাগছে না। এই কবিতাটা না মুখস্থ করতে পারলে কাল যে ও কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না! মা তো বলেই দিয়েছেন যে যদি এটা ঠিক করে বলতে না পারে কাল তাহলে এবার পুজোয় কোনো নতুন জামা ও পাবে না! মার উপর ওর খুব রাগ হলো। একটা কবিতা নাই বা পারল, তাতে যে মা এত রাগ করছে কেন ও বুঝতেই পারছে না। তবে এটাও ঠিক মা ওর আবৃত্তির এর জন্য কত খাটেন। ওকে প্রতিদিন সকালে ক্লাসে নিয়ে যাওয়া, ওকে সব প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়া। এইসব তো ওর মা-ই করেন। বাবা আর কত সময় দিতে পারেন? অফিসেই দিন কেটে যায়! তাই বোধ হয়ে মায়ের এত্ত প্রত্যাশা। কিন্তু ওই বা কি করে? এই কবিতা টা যে কিছুতেই বুঝতে পারছেনা। একে তো কাল ছুটির দিনে স্কুল যেতে হবে। তার উপর এই কবিতাটা বলতে না পারলে ওর পুজোটাও মাঠে মারা যাবে। এই দিনটাতে হঠাৎ স্কুল কেন যেতে হবে কে জানে? স্বাধীনতা মানেটাই বা কি? ও পড়েছে স্বাধীনতা মানে মুক্তি, ছুটি। কিন্তু ছুটি তো ভালো জিনিস। তবে কেন ওর এইরকম বন্দী বন্দী লাগছে নিজেকে? কিছুই ওর মাথায় ঢোকেনা। আর তার জন্য ওর এত প্রবলেম।

এত সব ভাবতে ভাবতেই ওর খুব কান্না পেয়ে গেল। ওর সব বন্ধুরা এমনকি ওর নিজের ভাইও নতুন জামা পড়বে আর ও পড়বে না? কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এলো। খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। এক দু ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। ওর খুব কান্না পাচ্ছে। খুব জোরে জোরে কাঁদতে থাকলো আভেরী। আর খুব জোরে হাঁটতে থাকলো। কান্নার ফাঁকে কখন যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ও খেয়ালই করেনি। যখন ওর খেয়াল হলো তখন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। ওর খুব ঠান্ডা লাগছে এখন। নাহ, এইবার বাড়ি ফিরতে হবে। মাথায় সাত চিন্তা নিয়ে আভেরী বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

বাড়ির দিকে যেতে যেতেই হঠাৎ চোখ গেল পাশের মাঠের দিকে। এই মাঠে ওর ঢোকা বারণ। ওর খুব যেতে ইচ্ছে। কিন্তু ওর বাবা বারণ করে রেখেছেন। ওখানে নাকি বাজে ছেলে মেয়েরা খেলা করে। ওখানে গেলে ও খারাপ হয়ে যাবে। আভেরী ভালো মেয়ে, তাই ওর ওখানে যাওয়া বারণ। কিন্তু ওখানে যারা খেলে তাদের দেখতে ওর খুব ভালো লাগে। ওরা কি সুন্দর ছুটে বেড়ায়, হাসে খেলে। ও শুধু ওদের বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়ায়। ওখানে একবার যাওয়া তার স্বপ্ন। কিন্তু তাও ওর ওখানে যাওয়া বারণ।

কিন্তু আজ ও সব বারণ যেন ভুলে গেল। মনে হলো আজ একবার ওকে ওখানে যেতেই হবে। দেরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হোক। বাড়ি ফিরে তো আবার সেই কবিতা পড়তে বসতে হবে। ওখানে যত দেরী হবে ওর ততই ভালো, দেরি করে বাড়ি ফেরা যাবে। ও মাঠে ঢুকলো। পায়ের তলায় নরম ঘাস। ও নরম ঘাস এর উপর কখনো দাঁড়ায়নি। অদ্ভুত নরম, আর জলে ভিজে ঠান্ডা হয়ে গেছে। ওর খুব ভালো লাগছে। হঠাৎ ও দেখল একটু দূরেই ৪-৫ টা ওর বয়সী মেয়ে কি

যেন একটা করছে| ওরা খুব ছুটোছুটি করছে আর খুব হাসছে| আভেরীরও খুব ইচ্ছা করলো খেলতে, ওদের সাথে| ও বলবে ওদের? কিন্তু বাবা যে বলেছেন ওরা বাজে? ওদের সাথে খেললে আভেরীও বাজে হয়ে যাবে? কিন্তু ওর যে খুব ইচ্ছা করছে খেলতে! "নাহ, একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখি| একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে কত আর খারাপ হবে? অতটুকু খারাপ হলে কেউ বুঝতে পারবে না"|

এই ভেবেই ও এগিয়ে গেল| আভেরীও ওদের সাথে খেলবেই |ও ওদের কাছে গিয়ে বলতেই ওরা রাজি হয়ে গেল| আভেরী ওদের সাথে খুব খেলা করলো|

এইরকম ও কোনদিন খেলেনি| ওর হাতে পায়ে কাদা লেগে গেল, তবুও ও খেলে চলল| আজ ও সত্যি খেলা খেলছে, আজ ও আরো খেলবে| করুক বাবা মা রাগ| আজ ও খেলবেই| আর কবিতা? সেটা ও বলবে না বলেই ঠিক করলো| ওকে তো স্কুলে স্বাধীনতা নিয়ে বলতে হবে| এখন ও জানে স্বাধীনতা মানে কি| এখন ও জানে মুক্তি মানে কি, ছুটি মানে কি| আজ ও স্বাধীন| ওর কোনো চিন্তা নেই| কবিতার আইডিয়া তো ছিল মায়ের| ও বলবে সত্যি স্বাধীনতা কাকে বলে? ওর একটা গান মানে পড়ল| ওই যে গুপি গায়েন গানটা গেয়েছিল হীরক রাজার দেশে সিনেমাটাতে!

"আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে...

সমাধান

শব্দের জালে ফেলুদা

উত্তরঃ

পাশাপাশি	উপর নীচ
১-বনবিহারী	২-নয়ন রহস্য
৫-সেন	৩-হাজরা
৬-রাজস্থান	৪-মগনলাল মেঘরাজ
৭-হত্যাপুরী	৯-শশাঙ্ক
৮-সোমে	১০-হাত
১০-হাঙর	
১১-শাশ্বত	
১২-চট্টোরাজ	

রিddle মানে ধাঁধা

সমাধান

---

১ . SMS = সর্দার মনমোহন সিং

২ . সত্যজিৎ রায়

৩ . আমি দ্বিতীয় সেলুনেই যাব ... কারণ --- প্রথম জন নিজের চুল – দাড়ি কাটতে যেত দ্বিতীয় জনের কাছে , এবং দ্বিতীয় জন ভালো নাপিত ছিল বলেই প্রথম জন পরিচ্ছন্ন ছিল | কিন্তু সে নিজে পরিচ্ছন্ন ছিল না বলেই তার সেলুনটা অপরিচ্ছন্ন |

৪ . আমি হলাম সানিয়া মির্জা |

ধাঁধার গভীর খাদে আখর-রুদ্র

- আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাধান

সমাধান

LetterName

Αα alpha --- A

Ββ beta --- B

Γγ gamma ---G

Δδ delta --D

Εε epsilon --E

Ζζ zeta ---Z

Ηη eta ---H

Θθ theta [tʰ] [θ] ---Th

Ιι iota [i] [iː] [i] --- I

Κκ kappa[k]---K

Λλ lambda --- L

Μμ mu --M

Οο omicron ---O

Ππ pi --- P

Ρρ rho ---R

Σσς sigma --- S

Ττ tau --T

Υυ upsilon --- Y AND U BOTH TOGETHER

Φφ phi ---PH

Χχ chi ---- Kh

Ψψ psi ----- PS

Ωω omega [ɔː] [o] ---ANOTHER O

------আখর-রুদ্র

" দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে " তে এই ধাঁধা গুলির উত্তর----

" রহস্য ভেদ হয়ে গেলো ! আমি আর রুদ্র এক্কেবারে সফল ! কারুর হেল্প ছাড়াই উদ্ধার করলাম অজানা লিপির রহস্য ! এগুলো আর কিছুই নাহ , ফেলুদা গ্রিক হরফ , যে হরফে উনি ডায়েরি লিখতেন (সুনীতি বাবুও লিখতেন) ...ওটা ফেলুদার ডায়েরি... কোথা থেকে পেয়েছিস জিজ্ঞাসা করাতে রুদ্র বলল , " আমার বাবা অ্যান্টিকের দোকান থেকে এনে দিয়েছেন " ! আমি আশ্চর্য হলাম যে , অ্যান্টিকের দোকানে কি ফেলুদাই ওটা দিয়ে এসেছিল ? নাকি তোপসে নাকি জটায়ু ? যাই হোক , আমি সবকটা ধাঁধার উত্তর নিচে লিখে দিচ্ছি |)

১ নম্বর ধাঁধা ---- (দেখে নাও) এই লেখাটা ফেলুদার বাদশাহী আংটি উপন্যাসের সেই " খুব হুঁশিয়ার " লেখা চিঠিটি , যেটা " গণেশ গুহ " ছুঁড়ে মেরেছিল দুবার |

২ নম্বর ধাঁধা --- (দেখে নাও) এই লেখাটি গ্যাংটকে গন্ডগোল উপন্যাসের সেই চিঠিটা , যেটাতে লেখা ছিল , : " ইউর সন মে বি ইস আ সিক মনস্টার... PRITEX .....:

৩ নম্বর ধাঁধা -- (দেখে নাও) এটি খুব বিখ্যাত ধাঁধা ফেলুদার জীবনে , এটি রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য উপন্যাসে মহীতোষ সিংহ রায়ের কাছ থেকে পাওয়া আদিত্যনারায়ণের ধাঁধা সেই " মুড়ো হয় বুড়ো গাছ ... হাত গোন ভাত পাঁচ .." ধাঁধাটি |

4 নম্বর ধাঁধা--- এটিও রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য উপন্যাশে তড়িৎবাবুর লেখা কয়েকটি মহাভারত চরিত্রের নাম···অর্জুন , কীচক , যুধিষ্ঠির .. ইত্যাদি (উপন্যাস দেখে নিন)

৫ নম্বর ধাঁধা - --- এটি ঘুরঘুটিয়ার ঘটনায় পাওয়া সেই কম্বিনেশন কোডটি | " ত্রিনয়ন , ও ত্রিনয়ন , একটু জিরো .."

৬ নম্বর ধাঁধা-- এই লেখাটি গোরস্থানে সাবধান উপন্যাসে নরেন বিশ্বাসের মানিব্যাগ থেকে পাওয়া সেই লেখাটি, B /S , ভিক্টোরিয়া এন্ড PC .. etc. লেখাটা (উপন্যাস টা দেখে নিন)

৭ নম্বর এবং সর্বশেষ ধাঁধা-- এটি খুবই সহজ ! ছিন্নমস্তার অভিশাপ উপন্যাসে লিখিত সেই অদ্ভুত ইংরিজি শব্দ গুলি ... মনে পড়ে ? সেই জটায়ু বলেছিলেন --" PC (পিসি) SO (এসো) OTKLO (ওটি কে এলো ?) etc. | words and sentence |

তাহলে তো হয়েই গেল সমাধান ! রুদ্র আর আমি শেষ অবধি সফল ! যাক বাবা , শান্তি ! আমাদের ইন্টারনেট বাবাজির জন্য খুব তাড়াতাড়িই সমাধান হত , কিন্তু আমরা ইচ্ছা করেই নেট ইউস করিনি , আমাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে , মাইক্রফট হোমস টুবাইদাদার কিছু সামান্য সাহায্য নিয়ে আমরা পারলাম !
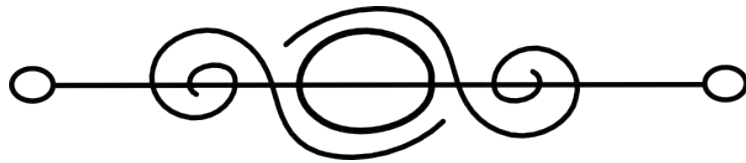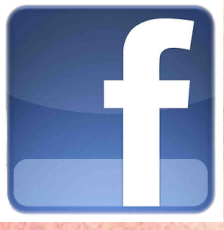
"~FELUDA FAN CLUB~"

ফেলুদা চিরতরুন । এই মর্ডান স্মার্টফোন, ওয়াটিস্‌আপের যুগেও ফেলুদা যতটাই নবীন, ততোটাই মর্ডান । আজও মগজাস্ত্রই আসল ভরসা । আর তাই ২১ নম্বর রজনী সেন রোডের বাসিন্দা ফিরে এসেছে এযুগের সফলতম আবিষ্কার ফেসবুকে । “~FELUDA FAN CLUB~” নামক গ্রুপের তরফ থেকে এই ই-মেগাজিনই তাঁর প্রমাণ । এই গ্রুপ সব ফেলুভক্ত ও সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য উন্মুক্ত । আমাদের এই প্রথম ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাদের কেমন লাগলো, জানাবেন । “~FELUDA FAN CLUB~” কমিউনিটির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

feludafanclub.01@gmail.com

Raktim Acharjee